# ~*MASUD RANA SERIES*~

## Bipodjonok (I & II) By Kazi Anwar Hossain

মাসুদ রানা
বিপদজনক
[দুই খণ্ড একত্রে]
কাজী আনোয়ার হোসেন
পাকিস্তানের কোন একটি দুর্ভেদ্য কারাগারে বন্দী হয়ে আছেন মেজর জেনারেল রাহাত খান—
এই খবর পেয়ে ছুটল রানা শত্রুপুরীতে, ছদ্মবেশে।
অপ্রসন্ন ভাগ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে একটার পর একটা বিপদ ও বাধা অতিক্রম করল সে অসম সাহস আর তীক্ষ্ণবুদ্ধির বলে। সিরিজের পঞ্চম কাহিনীর কিছু কিছু কৌশল ব্যবহার করল এবার রানা।
প্রশ্ন অনেক। পারবে সে মেজর জেনারেলকে ফিরিয়ে আনতে? ব্রিগেডিয়ার জামানকে মুক্ত করতে? লায়লা জামানকে উদ্ধার করতে? সাড়ে তিনশো বন্দি মেয়েকে রক্ষা করতে?
সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী
সেবা প্রকাশনী: ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মাসুদ রানা বিপদজনক দুই খণ্ড একত্রে কাজী আনোয়ার হোসেন
মাসুদ রানা
বিপদজনক
কাজী আনোয়ার হোসেন
দুই খণ্ড একত্রে
TOYOTA
সেবা

সেবা প্রকাশনী

উনত্রিশ টাকা
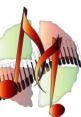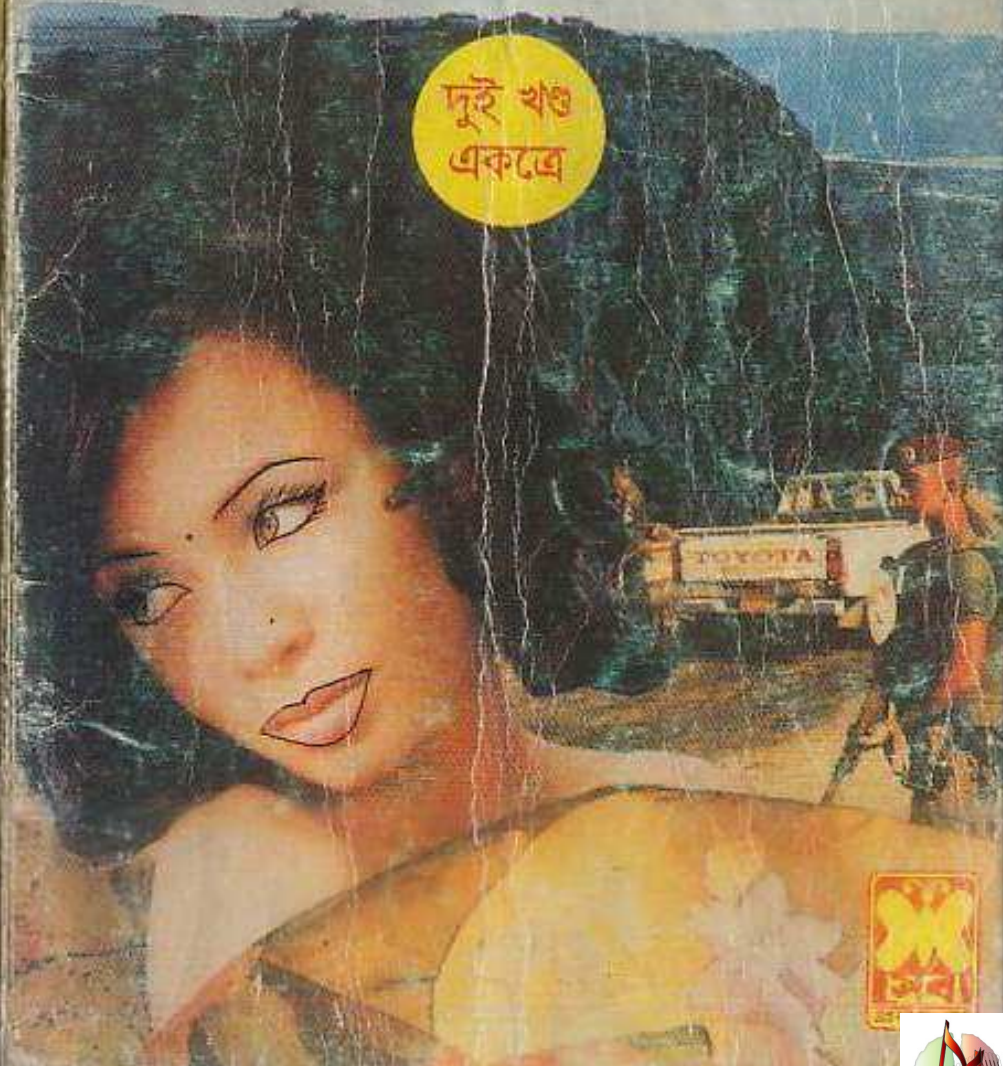
২

ISBN 984-16-7027-5

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
**সেবা প্রকাশনী**
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০



প্রথম প্রকাশ: ১৯৭২
পঞ্চম প্রকাশ: ১৯৯৭

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা: আলীম আজিজ

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
**সেগুনবাগান প্রেস**
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা
**সেবা প্রকাশনী**
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩৪১৮৪
জি. পি. ও. বক্স নং ৮৫০

পরিবেশক
**প্রজাপতি প্রকাশন**
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রূম
**সেবা প্রকাশনী**
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
**প্রজাপতি প্রকাশন**
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

Masud Rana
BIPADJANOK
Part-I&II
A Thriller Novel
By: Qazi Anwar Husain

## এক নজরে মাসুদ রানা সিরিজের সমস্ত বই





# বিপদজনক-১

প্রথম প্রকাশ: অক্টোবর, ১৯৭২

## এক

ঝনঝন শব্দে বেজে উঠল লাল টেলিফোনটা।

চট করে সোহানার চোখের দিকে চাইল সোহেল, তারপর জাহেদের চোখে। একটা গুরুত্বপূর্ণ অ্যাসাইনমেন্টের ব্যাপারে আলোচনা হচ্ছিল। বলতে হলো না কাউকে কিছুই, মুচকি হেসে উঠে দাঁড়াল ওরা দু'জন। তিনবার রিং হয়েই থেমে গেছে। সোহানা জানে, ঠিক এক মিনিট পর আবার বেজে উঠবে ফোনটা। এক মিনিটের মধ্যেই প্রস্তুত হয়ে নিতে হবে বাংলাদেশ কাউন্টার ইনটেলিজেন্সের চীফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর সোহেলকে। লাল টেলিফোন বাজলে এ ঘরে সোহেল ছাড়া আর কারও থাকবার হুকুম নেই। বোধহয় নির্দেশ আসে এই টেলিফোনে সেই অদৃশ্য লোকটির কাছ থেকে, যার নীরব অঙ্গুলি সংকেতে চলছে এই অফিসের প্রতিটি কার্যকলাপ। অনেক চেষ্টা করেও এই লাল টেলিফোনের রহস্য ভেদ করতে পারেনি সোহানা।

এমনিতে হাসি খুশি কৌতুকপ্রিয় মানুষ সোহেল। ক্যাফেটেরিয়াতে ওর হৈ-চৈ, তিড়িং বিড়িং নাচ আর মুখ খিস্তির বহর দেখলে ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত কয়েকজন ছাড়া কেউ কল্পনাও করতে পারবে না কাজের সময় কি পরিমাণ গম্ভীর হয়ে যায় এই লোক। যেন একেবারে অন্য লোক। নিক্তিতে ওজন করা প্রতিটি কথা, পান থেকে চুন খসবার উপায় নেই। ব্যাটা মেজাজটা পেয়েছে মেজর জেনারেল রাহাত খানের। কাজের সময় এই ঘরে তার সামনে দাঁড়িয়ে বুক কেঁপে যায় না এমন এজেন্ট খুব কমই আছে। মনে হয় সামনে বসে আছে জ্যান্ত বাঘ, অথবা স্বয়ং মেজর জেনারেল। কিন্তু এজন্যে রাগ, ঈর্ষা বা বিদ্বেষ নেই কারও ওর উপর। কাজ বোঝে লোকটা, এবং সেটা আদায় করে নিতে জানে। এরকম যোগ্য লোককে পেয়ে বরং সবাই মনে মনে খুশি, কৃতজ্ঞ। নিজেও পরিণত হয়ে গেছে সে এই কয় মাসেই।

গম্ভীর মুখে একটা ফাইল ঠেলে দিল সোহেল সামনের দিকে। প্রকাণ্ড সেক্রেটারিয়েট টেবিলের একেবারে কিনারে চলে এল সিক্রেট ছাপ মারা মোটাসোটা ফাইলটা। এক হাত শূন্যে তুলে আড়মোড়া ভাঙল সে, তারপর বলল, 'এতে একবার চোখ বুলিয়ে নাও তোমরা দু'জন। ওয়ান বাই ওয়ান। দু'ঘণ্টা পর ডাকব তোমাদের আবার। ওকে—সি ইউ।'

ফাইলটা তুলে নিল জাহেদ, এগিয়ে গেল দরজার দিকে, পিছু পিছু এগোল
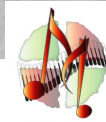
সোহানা। ধীরে ধীরে খুলে গেল দরজাটা, ওরা বেরিয়ে যেতেই বন্ধ হয়ে গেল আবার। ক্লিক করে শব্দ হলো একটা।

সোনালী সিগারেট কেস থেকে একটা ফিলটার টিপড্ স্টেট এক্সপ্রেস বের করে ধরাল সোহেল। পরমুহূর্তেই আবার বেজে উঠল লাল টেলিফোনটা।

'ইয়েস, বস্?' রিসিভারটা কানে তুলে কাঁধের সাথে বাধিয়ে নিয়ে হেলান দিল সে সুইভেল চেয়ারে। এক মিনিট চুপচাপ শুনল। তারপর আঁতকে উঠল। 'বেঁচে আছে! পাকিস্তানে?···পাকিস্তানী পাসপোর্ট!···দুটো? ওরেব্বাপুস্! সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার মনে হচ্ছে, বস্?···না পাবার কি আছে, একঘন্টায় তৈরি হয়ে যাবে সব।···এক সেকেণ্ড, বস্, লিখে নিচ্ছি আমি।' সাদা একটা কাগজ টেনে নিল সে। খশ খশ করে লিখল দুটো নাম, ঠিকানা। 'ইণ্ডিয়ান সাইডটাও ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।···ইয়েস, বস্··· কিন্তু ব্যাপারটা ট্র্যাপও তো হতে পারে? না, বলছিলাম কি, ব্যাপারটায় মস্ত ঝুঁকি আছে, অত্যন্ত বিপজ্জনক, অন্য কাউকে পাঠালে···' থেমে গেল সোহেল। চুপচাপ শুনল আধমিনিট। অপর প্রান্তের কি এক রসিকতায় হো-হো করে হাসল। তারপর বলল, 'দ্যাখ, বস্, তুই পটল তুললে আমি কানা হয়ে যাব··· ঠিক আছে, চলে আয় তুই। অফিসের সবাই খুশি হবে। তোকে না দেখে দেখে শুকিয়ে যাচ্ছে ছুঁড়িটা।···অফিসে? কেন? সবাই তো আছে, চলে আয়। এক্ষুণি প্লেনের সীট বুক করে ফেলছি।' আবার হাসল সোহেল অপর প্রান্তের কথা শুনে। 'খবরদার, বস্, বাজে কথা বলবি না, এক লাথ মেরে পোঁদ ফাটিয়ে দেব।···ওকে, রাখলাম।'

মতিঝিলের একটি প্রকাণ্ড অট্টালিকা। এর ষষ্ঠ ও সপ্তম তলায় মেজর জেনারেল রাহাত খানের অক্লান্ত পরিশ্রমে গড়া বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের হেড কোয়ার্টার। অসংখ্য এজেন্ট ছড়িয়ে আছে সারা পৃথিবী জুড়ে, নিয়মিত কন্ট্যাক্ট রক্ষা করে চলেছে তারা হেড অফিসের সাথে, কেউ প্রতিদিন, কেউ সপ্তাহে একদিন, কেউ বা মাসে একদিন। ঘড়ির কলকব্জার মত নির্ভুলভাবে চলেছে এই দুর্ধর্ষ গোপন সংস্থার কাজ। দেশের স্বার্থ রক্ষা করবে এরা যে-কোন মূল্যে।

খুশি মনে বেরিয়ে এল রানা বি. সি. আই. অফিস থেকে। লম্বা পা ফেলে এগিয়ে চলল ওর ডাটসান সিক্সটিন হানড্রেডের দিকে। কেমন একটা সংকোচে বাধো বাধো ঠেকছিল রানার অফিসে ঢুকতে গিয়ে। এত কালের পরিচিত অফিসটা কেমন যেন অচেনা লাগছিল আজ রানার কাছে। দেড় বছর পর আজ এই প্রথম ঢুকল সে অফিসে। দে···ড় বছর! আ···ঠা···রো মাস! খুব সম্ভব শেষ এসেছিল এখানে একাত্তরের পঁচিশে মার্চ। যেন কত যুগ পেরিয়ে গেছে এর মধ্যে। বহু দিনের বহু স্মৃতি ভিড় করে আসতে চাইছিল মনের মণিকোঠায়। মাথা ঝাড়া দিয়েও তাড়ানো যাচ্ছিল না।

কেমন যেন ভয়-ভয় লাগছিল ওর। কি দেখবে সে অফিসে ঢুকে? অনেক



অপরিচিত মুখ, অনেক পরিবর্তন, অনেক ব্যস্ততা? চেনাজানা সবাইকে পাওয়া যাবে না, অনেকগুলো পরিচিত মুখ হারিয়ে গেছে চিরতরে। কেঁদে টেঁদে ফেলবে না তো সে!

রানাকে দেখেই চমকে উঠেছিল বহুদিনের পুরানো কর্মচারী বৃদ্ধ লিফটম্যান হাসান, হাঁ হয়ে গিয়েছিল মুখটা, তারপর হাসি ফুটে উঠেছিল পুরু দুই ঠোঁটে, তারপরেই কেমন যেন মলিন হয়ে গেল হাসিটা, বলল, 'বহুদিন পর দেখলাম, স্যার, আপনাকে।' ওর কাঁধের উপর একটা হাত রাখল রানা। কেউ কোন কথা বলল না আর। সোজা ছয় তলায় এসে থামল লিফট।

ব্যস, এই একটি অভিজ্ঞতাই সাহসী হয়ে ওঠার পক্ষে যথেষ্ট। বুঝতে পেরেছে রানা, কোন রকম সীন ক্রিয়েট করবে না সে। অতীত নিয়ে ফেলবে না দীর্ঘশ্বাস। এসেই যখন পড়েছে, সব ভয় ভেঙে নিয়ে যাবে সে আজ। কোন রকম দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দেবে না কিছুতেই। দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেল রানা নিজের কামরার দিকে। অনেকটা অভ্যাস বশে।

কামরাটা খোলা। ঢুকেই ছ্যাঁৎ করে উঠল ওর বুকের ভিতরটা। রেহানার টেবিল, টেবিলের উপর সেই টাইপ রাইটারটা, কার্বনের বাক্স, কাগজ, রাবার। যেমন ছিল তেমনি রয়েছে। ঠিক মনে হচ্ছে রানার অনুপস্থিতির সুযোগে জাহেদের ঘরে গল্প করতে গেছে রেহানা, এক্ষুণি এসে পড়বে। অথচ···

রেহানার কামরা পেরিয়ে নিজের ঘরে গেল রানা। চেয়ার, টেবিল, টেলিফোন, ইন্টারকম, অ্যাশট্রে, এমন কি জানালার ভারি কার্টেনগুলো পর্যন্ত, যেটি যেখানে যেমন ছিল ঠিক তেমনি আছে। বুক চিরে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। এই আছে, এই নেই—কি অদ্ভুত মানুষের জীবন, অথচ জড় পদার্থগুলো তেমনি রয়েছে, থাকবেও।

নাহ, এ নিয়ে দুঃখ করার কিছুই নেই, এটাই নিয়ম। অতীত নিয়ে আবেগ-প্রবণ হবে না সে। যা হবার হয়ে গেছে, শেষ। আগামীর দিকে চোখ রাখতে হবে। স্মৃতির পিছুটান ক্ষতিকর দুর্বল করে দেয় মানুষকে। সহজভাবে গ্রহণ করবে সে সবকিছুকে। যতদিন বেঁচে আছে, সহজ ভাবে বাঁচবে। যখন থাকবে না, তখন নাই।

ধীর পায়ে বেরিয়ে গেল রানা ঘর থেকে। মিছেই ভয় পেয়েছিল সে, মনটা যতখানি ভারাক্রান্ত হবে বলে মনে করেছিল তা হলো না। বরং অতি সহজে মিশিয়ে দিল সে নিজেকে বন্ধু-বান্ধবের হাসি কৌতুক আর আন্তরিক ভালবাসার মধ্যে।

সলীল সেনের ঘরেই ঢুকল রানা প্রথম। রানাকে দেখেই ছাগলের বাচ্চার মত তড়াক তড়াক গোটাচারেক লাফ দিল সে। তারপর ঘুসি পাকিয়ে রানাকে এক পোজ নিয়ে রানার চারপাশে ঘুরতে লাগল সে বক্সিং-এর ভঙ্গিতে লাফিয়ে লাফিয়ে। যেন বক্সিং করছে সে রানার সাথে রিং-এর ভিতর। মাঝে মাঝে ফটাফট শূন্যে ঘুসি মারছে চোখমুখ পাকিয়ে, আর পয়েন্ট গুনছে।
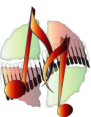
রানা ওর কানটা চেপে ধরতেই ভ্যাঁ করে কেঁদে দিল সলীল। হাঁউমাউ করে ডাকাডাকি শুরু করল জাহেদ, জাফর, ইকরাম আর মঈনের নাম ধরে। 'সব শালা গেলি কই! মেরে ফেলল রে, বাঁচাও! বিখ্যাত শখের গোয়েন্দা কান চেপে ধরেছে রে, এরপর হয়তো অপমানই করে বসবে! ওরে শালারা, কোথায় কে আছিস···'

হৈ-চৈ শুনে ছুটে এল সবাই। কানটা ছেড়ে দিয়ে সলীলের চেয়ারটা দখল করল রানা, পা তুলে দিল টেবিলের উপর। ব্যস জমে গেল আড্ডা।

ঝাড়া দুটি ঘন্টা এর ওর ঘরে, কাফেটেরিয়ায় আড্ডা মেরে সোহেলের কামরায় আধঘন্টা কাটিয়ে বেরিয়ে এল সে। দুপুর দুটো। সবার সাথে দেখা করে, সবার সব রকম প্রশ্নের সত্যমিথ্যা উত্তর দিয়ে, সবার পকেট থেকে কিছু না কিছু খসিয়ে খুশি মনে নেমে এসে যেই গাড়িটা স্টার্ট দিয়েছে, ওমনি পড়ল লম্বা চুলওয়ালা তরুণ হাইজ্যাকারের পাল্লায়। চারজন। আঁটো প্যান্ট, কাঁধ পর্যন্ত চুল, চিবুক পর্যন্ত জুলফি। রাতবিরেতে দেখলে ভূতেও ভয় পাবে। সব ক'টার বয়স আঠারো থেকে বিশ বছর। দেখেই বোঝা যায়, ছাত্র।

'খবরদার! চুপচাপ নেমে যান গাড়ি থেকে। গোলমাল করলেই গুলি করব।'

হাসল রানা। রোমহর্ষক কাজ করছে, সেই উত্তেজনায় কাঁপছে ছেলেগুলো। দু'জনের হাতে পিস্তল। কিন্তু অ্যামেচার-বেচারারা জানেও না কিভাবে ব্যবহার করতে হয় এগুলো। হয়তো রাইফেল-স্টেনগান নিয়ে যুদ্ধ করেছে এরা, কিন্তু কাছাকাছি থেকে পিস্তল দেখিয়ে কাউকে বাধ্য করতে হলে নিজের নিরাপত্তার জন্যে যে সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়, সেটা জানা নেই ওদের। যেন ধরেই নিয়েছে পিস্তল দেখানোই যথেষ্ট, জিনিসটা দেখালেই ভয়ে অন্তরাত্মা শুকিয়ে যাবে দর্শকের, সুড়সুড় করে আদেশ পালন করবে বিনা বাক্য ব্যয়ে।

'কোথায় যাবে, খোকা? চলো তোমাদের নামিয়ে দিই,' বলল রানা।

একটু বিস্মিত হলো আদেশকারী। পরমুহূর্তে রেগে উঠল আত্মাভিমানে চোট খেয়ে।

'বেশি প্যাট-প্যাট করবেন না। নেমে পড়েন। বাহাদুরি দেখাতে গেলে মারা পড়বেন। উই মিন বিজনেস। আউট!'

রানার মধ্যে নড়বার লক্ষণ না দেখে ঝটাং করে খুলে ফেলল দরজাটা দ্বিতীয় পিস্তলধারী। 'শুধু শুধুই কথা বলছিস, ঝন্টু, লোক জমে যাচ্ছে, ঘাড় ধরে বের করে দিই ব্যাটাকে। মতিন, এদিকে আয়।'

কলার ধরতে যাচ্ছিল ছেলেটা, হাত সরিয়ে দিয়ে রানা বলল, 'ঠিক আছে, এমনিতেই নামছি।'

রানা একবার ভাবল ঝামেলা এড়িয়ে যাবে কিনা, কিন্তু পরমুহূর্তে বুঝতে পারল, এদেরকে এভাবে ছেড়ে দিলে আরেকখানে গিয়ে একই কাজ করবে।

অত্যন্ত বিরক্ত হয়েছে রানা। এদের গায়ে হাত তোলার ইচ্ছে ছিল না, কিন্তু···



কি ভেবেছে এরা নিজেদেরকে? যা খুশি করার স্বাধীনতা তো এরা নিজেরাও চায়নি মুক্তিযুদ্ধের সময়। বেঙ্গল রেজিমেন্টের কঠোর শৃঙ্খলার মধ্যে প্রতিটা নিয়ম মেনে কাজ করতে হয়েছে এদের যুদ্ধের সময়, এই ক'দিনেই সব ট্রেনিং গুলিয়ে খেয়ে ফেলে দিল? যে স্বাধীনতার জন্যে বুকের রক্ত দিতে দ্বিধা করেনি একদিন, আজ সেই স্বাধীনতার বুকে ছুরি বসাচ্ছে নিজেরাই? অদূরদর্শিতা, নাকি ফ্রাসট্রেশন? এরা শুধু 'কিক'-এর জন্যে যুদ্ধ করেছে, দেশপ্রেমের জন্যে নয়, একথা বিশ্বাস করে না রানা। আশ্চর্য সংযমের পরিচয় দিয়েছে এরা যুদ্ধের সময়। তাহলে? ফ্রাসট্রেশন? নাকি মহৎ কোন লক্ষ্য খুঁজে পাচ্ছে না? ওরা কি ভেবেছে দেশ স্বাধীন করলেই সব সমস্যা চুকে গেল, এতগুলো ভিন্ন মত, ভিন্ন পথ, ভিন্ন নীতির মানুষ সবাই পৌঁছে গেল মোক্ষ ধামে? এতই সহজ সব কিছু?

এরা দেশের ক্ষতি করছে, নিজেদের অপচয় করছে। বাংলাদেশের মানুষের জন্যে যুদ্ধ করেছিল এরা, অত্যাচারীর করাল গ্রাস থেকে দেশকে মুক্ত করে হাসি ফুটাতে চেয়েছিল মায়ের মুখে, শিশুর মুখে; সাধারণ মানুষের সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য ও শান্তির জন্যে অস্ত্র ধরেছিল হাতে, হাসি মুখে দিতে চেয়েছিল প্রাণ। কোথায় গেল সেই আদর্শ? কাজ কি শেষ হয়ে গেছে? সবাই খেতে পাচ্ছে? কাপড়, বাসস্থান, চিকিৎসা ও শিক্ষার নিশ্চয়তা তো দূরে থাক, একবেলা ভাতই কি জুটছে মানুষের? সংগ্রামের কি দেখেছে এরা? সংগ্রাম তো আসছে সামনে। নিজেদের স্বার্থ, লোভ, কলুষিত চরিত্র আর হীন মনোবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম। ব্যাঙ্ক ডাকাতি আর গাড়ি হাইজ্যাক করতে পারাটাই বীরত্বের নিদর্শন মনে করছে কেন এরা? অথচ সংঘবদ্ধ হলে কী প্রচণ্ড শক্তি এরা, অস্বীকার করতে পারবে কেউ? এদের এক ফুঁয়ে উড়ে যেতে পারত সমস্ত দুর্নীতিবাজ, মওজুতদার, কালোবাজারী— যা খুশি তাই করতে পারত না দুশ্চরিত্র আমলা এবং দায়িত্বজ্ঞানহীন রাজনীতিকেরা।

অবশ্য এদের বয়সটা ক্ষমার চোখে দেখতে হবে। তাছাড়া এদের মধ্যে সত্যিকার মুক্তিযোদ্ধার পরিমাণ আসলে খুবই কম। বেশির ভাগই সিক্সটিনথ ডিভিশনের (ষোলোই ডিসেম্বর যারা অস্ত্র ধারণ করেছে) মুক্তিযোদ্ধা। তা বাবা যে ডিভিশনই হও, আজকে কিন্তু পিট্টি আছে কপালে।

ধীরে সুস্থে বেরিয়ে এল রানা বাইরে। পরমুহূর্তে বিদ্যুৎ খেলে গেল ওর শরীরে। সামান্য একটা জুডো হোল্ডের চাপ খেয়ে অস্ত্র ছেড়ে দিল দ্বিতীয় পিস্তলধারী। পা দিয়ে ঠেলে দিল ওটা রানা গাড়ির নিচে। প্রথম জন ড্রাইভিং সীটে উঠতে যাচ্ছিল, কুঁকড়ে গেল তলপেটে প্রচণ্ড এক লাথি খেয়ে, মুখ থুবড়ে পড়ল সীটের উপর। ওর হাত থেকে ছিটকে পড়া পিস্তলটা তুলে নিল তৃতীয়জন, মতিন। কিন্তু সাপটা সোজা করেই দেখতে পেল কোটের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল রানার হাত, সে হাতে চকচক করছে ভয়ঙ্কর দর্শন একটা নাইন এম. এম. লুগার। ওর হাতে ধরা বেরেটার মত খেলনা নয়। দ্বিতীয় পিস্তল ধারীকে ধরে রেখেছে রানা সামনে, গুলি করলে মারা
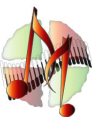
যাবে নিজেদের লোক। পরাজয় টের পেল মতিন, রক্ত-শূন্য ফ্যাকাসে হয়ে গেল ওর মুখ। প্রথম জন, অর্থাৎ ঝন্টু, আছড়ে পাছড়ে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে, মাথাটা ঝাড়া দিচ্ছে এদিক ওদিক। ওর কাছ থেকে সাহায্য পাওয়া যাবে না এখন।

'ফেলে দাও পিস্তল,' কঠোর কণ্ঠে বলল রানা।

মুঠি আলগা করল ছেলেটি। পরমুহূর্তে এক ধাক্কা খেয়ে রানার সামনের জন হুমড়ি খেয়ে পড়ল ওর উপর। আলগোছে পা দিয়ে ঠেলে দ্বিতীয় পিস্তলটাকেও গাড়ির নিচে পাঠিয়ে দিল রানা। নিজের পিস্তলটা হোলস্টারে ভরে খুঁজল চতুর্থ ছেলেটিকে। সে তখন দৌড়াচ্ছে। কিন্তু ধরা পড়ে গেল। প্রচুর লোক জমে গেছে এই এক মিনিটের মধ্যেই। মারতে মারতে নিয়ে আসা হচ্ছে ওকে গাড়ির কাছে। চারপাশ থেকে অসংখ্য লোক ছুটে আসছে, কেউ লাঠি, কেউ ইট পাটকেল নিয়ে।

মরিয়া হয়ে শেষ চেষ্টা করল বাকি তিনজন। পিছন থেকে আক্রমণ করল ঝন্টু সামনে থেকে আর দু'জন। সোলার প্লেক্সাসের উপর কনুইয়ের বেমকা গুঁতো খেয়ে শুয়ে পড়ল ঝন্টু মাটিতে। কাটা মুরগীর মত দাপাদাপি করছে। সামনের একজন ঘুসি খেয়ে ছিটকে পড়ল গাড়ির উপর। তৃতীয় জন অর্থাৎ মতিন, দিশেহারার মত একবার এদিক ওদিক চেয়ে কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়ল মাটিতে। চোখের সামনে ফুটে উঠল জকি, আলাউদ্দিন আর বাবুর মৃত মুখ। পিটিয়ে মেরেছিল ওদের ক্ষিপ্ত জনতা।

শিলা বৃষ্টির মত কিল-চড় লাথি-ঘুসি-কনুই পড়তে শুরু করল। এর ওর পায়ে পড়ছে ছেলেগুলো এখন, ছড়ে গেছে, কেটে গেছে শরীরের বিভিন্ন জায়গা, ছিঁড়ে গেছে শার্ট, টাইট প্যান্ট;—কিন্তু নির্মম ভাবে পিটিয়ে চলেছে লোকগুলো। ঝর ঝর করে রক্ত ঝরছে। রানা ভাবল, অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে মানুষ সশস্ত্র দুষ্কৃতকারীর অত্যাচারে। জন্মের শোধ তুলে নিতে চাইছে এখন সুযোগ পেয়ে। মেরেই ফেলে দেবে পিটিয়ে। মানুষকে দোষ দিয়ে লাভ নেই, সহ্যের সীমা অতিক্রম করে গেছে ওরা। একে বিপর্যস্ত অর্থনীতির চাপেই বাঁকা হয়ে গেছে পিঠ, তার উপর এইসব বেপরোয়া, সন্ত্রাসী যুবকের অত্যাচার ধৈর্যচ্যুতি ঘটিয়েছে জনসাধারণের।

কিন্তু তাই বলে মরতে দেয়া যায় না ছেলেগুলোকে। আর তিনটে মিনিট নিষ্ক্রিয় থাকলেই মারা পড়বে সব ক'টা। উপযুক্ত শাস্তি হয়ে গেছে। প্রাণে বাঁচলে খুব সম্ভব জীবনে আর কোনদিন একাজ করবে না ওরা।

হঠাৎ ধাক্কা দিয়ে কয়েকজনকে সরিয়ে দিল রানা পিছনে। কান ধরে টেনে তুলল একজনকে। ঠাস্ করে একটা চড় দিয়ে চিৎকার করে বলল, 'হতচ্ছাড়া, বদমাইশ, পাজী কোথাকার! ওঠ গাড়িতে!' ঠেলে দিল সে ওকে গাড়ির দিকে। মারমুখী জনতা একটু থমকে গেল। আরেক পর্দা চড়িয়ে দিল রানা গলার স্বর। 'কোথায় গেল ঝন্টু?' চুল ধরে টেনে তুলে ঠেলে দিল ওকেও গাড়ির দিকে। জনতার উদ্দেশ্যে বলল, 'আরে, শালা, তোর বোন যদি আমার সাথে পালিয়ে যায়, সেটা কি একা আমার দোষ? কলমা পড়ে বিয়ে করে ঘরে তুলে নিয়েছি, অন্যায়টা কি



করলাম? বদমাইশি করে তো ছেড়ে পালিয়ে যাইনি যে তিন তিনটা হিপ্পি নিয়ে আক্রমণ করে বসবি? চল্ শালা, তোকে তোর বোনের হাতে জুতো খাওয়াব।' তৃতীয়জনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল রানা এবার।

জনতা নিজেদের ভুল বুঝতে পারল, ব্যাপারটা যে অন্য ধরনের কিছু, অর্থাৎ ব্যক্তিগত পারিবারিক ব্যাপার, টের পেয়ে যারা বেশি সক্রিয় ছিল তারা ভিড়ের ভিতর মিশে যাওয়ার চেষ্টা করছে। ড্রাইভিং সীটে উঠে বসল রানা। চতুর্থ জনকে জনতাই তুলে দিল পাশের সীটে। ভিড় ঠেলে বেরিয়ে গেল গাড়িটা। গাড়ির নিচের পিস্তল দুটো পেয়ে ওদের মনোভাব কি রকম গোলমেলে হয়ে যাবে ভাবতে গিয়ে মুচকি হাসল রানা।

তীব্র বেগে ছুটে চলেছে গাড়ি। আড় চোখে দেখল রানা প্রচণ্ড মার খেয়ে ধুঁকছে এখন বীর-পুরুষেরা, কাঁপা কাঁপা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ছে জানে বেঁচে গিয়ে। ছেঁড়া শার্টের হাতায় রক্ত মুছছে মুখের।

'কোন সেক্টারে ছিলে?' জিজ্ঞেস করল রানা ঝন্টুকে।

'মেঘালয়।' মাথা নিচু করে জবাব দিল ঝন্টু।

চুপচাপ মিনিট সাতেক এক মনে গাড়ি চালাল রানা। হঠাৎ পার্ক ও রেসকোর্সের পাশের নির্জন রাস্তায় গাড়ি থামাল সে সাইড করে।

'ভাগো!'

পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে নীরবে নেমে গেল ওরা চারজন। উষ্কখুষ্ক লম্বা-চুলো ভূত চারটে। নাকে মুখে-কপালে-ঘাড়ে-পিঠে-হাতে নীল দাগগুলো কালচে হয়ে আসছে। মায়া লাগল রানার। লঘু পাপে গুরু দণ্ড হয়ে গেছে বেচারাদের।

ফার্স্ট গিয়ারে দিল রানা। দু'পা এগিয়ে এসে কি যেন বলতে যাচ্ছিল ঝন্টু, মুখ দেখে মনে হলো মাফ চাইবে, কিংবা ধন্যবাদ জানাবে। ধমকে উঠল রানা, 'শাট আপ! কোন কথা শুনতে চাই না তোমাদের। কুলাঙ্গার যত্তো সব! মুক্তিযোদ্ধা না ছাই তোমরা! ঘেন্না হয় তোমাদের অধঃপতন দেখলে।'

'তাহলে বাঁচালেন কেন?' ভারি গলায় জানতে চাইল ঝন্টু।

'বাঁচালাম অপমান থেকে বাঁচার জন্যে। গাড়ি হাইজ্যাক করতে গিয়ে চারজন মুক্তিযোদ্ধার মৃত্যু সংবাদ প্রকাশ পেলে সারা দেশের সমস্ত মুক্তিযোদ্ধার মাথা হেঁট হয়ে যেত অপমানে। মানুষের চোখে ছোট হয়ে যাচ্ছে তারা। তোমাদের মত কয়েকটা শয়তানের জন্য নিজেদের মুক্তিযোদ্ধা বলে পরিচয় দিতে তারা আজ লজ্জা বোধ করে। তোমাদের এই কলঙ্ক আমার গায়েও লাগত। তাই বাঁচাতে হলো।'

হুশ করে বেরিয়ে গেল রানার ডাটসান সিক্সটিন হাণ্ড্রেড।
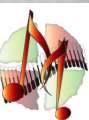
# দুই

ধীরে ধীরে মাথাটা উঁচু করল রানা।

ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় সব পরিষ্কার। সাবধানে ঘোরাল মাথাটা এপাশ ওপাশ। নাহ্, কেউ নেই। ওকে গর্তে পড়ে যেতে দেখে কি এরা তাড়া করা ছেড়ে দিল? নাকি তাড়া করেইনি? পিছন থেকে যে গুলি করেনি তাই রক্ষে!

রাস্তা ধরে বেশ কিছুদূর দৌড়ে এসে একটা প্রকাণ্ড মাঠে নেমে পড়েছিল সে। দূরে, ঘন ঝোপ-ঝাড়ের আভাস পেয়ে সেইদিকেই ছুটেছিল আত্মরক্ষার স্বাভাবিক তাগিদে—লক্ষ্য নিবদ্ধ ছিল দূরে, তাই দেখতে পায়নি গর্তটা, হুড়মুড় করে পড়ে গেছে গর্তের ভিতর। আধমিনিটের জন্যে জ্ঞান হারিয়েছিল। জ্ঞান ফিরে পেয়ে হাত, পা, ঘাড়, মাজা, কোথাও কিছু ভাঙেনি বা মচকায়নি দেখে বিস্মিত হলো রানা। কিন্তু বিস্মিত হবারও সময় নেই এখন। চট্ করে ফিরে এল সে বাস্তবে।

পালাতে হবে। ধরা পড়বার আগেই পালাতে হবে এখান থেকে। ধরা পড়লে আর রক্ষা নেই।

কিন্তু ব্যাটাদের মতলবটা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। আর একবার খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল সে চারিটা পাশ। কিছুই নড়ছে না কোথাও। জনশূন্য রাস্তা। চারদিক নিস্তব্ধ। চাঁদের আলোয় অদ্ভুত সুন্দর লাগছে ভারি ট্রাকের অত্যাচারে নিপীড়িত এবড়ো-খেবড়ো পীচ ঢালা রাস্তাটাকে। তাড়া করা ছেড়ে দিল কেন? ট্রাক ড্রাইভারের কাছে ঘুষ আদায় করতে গিয়ে এদিকে খেয়াল দেয়ার সময় পাচ্ছে না? কোনদিকে যাবে রানা এখন? মেইন রোডে গিয়ে উঠবে এই সাইড রোড ধরে? কিন্তু সেদিকেও তো চেকপোস্ট। এতক্ষণে খবর পৌঁছে গেছে নিশ্চয়ই। লাহোর এখনও বিশ মাইল। হেঁটে যাওয়া প্রায় অসম্ভব। তাছাড়া বিপজ্জনক। যত রাগ গিয়ে পড়ল ওর ট্রাক ড্রাইভারটার উপর। ব্যাটা পুলিস চেক-পোস্ট এড়াতে গিয়ে মেইন রোড ছেড়ে ঢুকেছে এই রাস্তায়, ঢুকেই পড়েছে আর্মির খপ্পরে। দুটো টাকা বাঁচাতে গিয়ে এখন জান নিয়ে টানাটানি।

বেশ আসছিল কাসুর থেকে পিণ্ডিগামী ট্রাকের পিছনে লুকিয়ে চাঁদের আলোয় ভিজতে ভিজতে। পরিষ্কার নীল আকাশ, অসংখ্য জ্বলজ্বলে তারা, ট্রাকের একটানা গোঁ-গোঁ শব্দ, আর পাকা গমের গন্ধ মাখা হু-হু হাওয়া। হাই এসে যাচ্ছিল রানার ঘুমের আমেজে। হঠাৎ এই আর্মি ব্লক। গাড়ি থামিয়ে দু'জন সেন্ট্রি ট্রাকটা সার্চ করতে চাইল। তড়াক করে লাফিয়ে উঠে অসতর্ক সেন্ট্রি দুটোর নাক বরাবর দুটো প্রচণ্ড ঘুসি লাগিয়ে দিয়ে আধমাইল দৌড়ে চলে এসেছে সে। মোড়ের কাছে পিছন



ফিরে দেখেছে রানা, মাটি ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে সিপাই দু'জন। অনেকখানি সোজা দৌড়ে এসে বাঁ দিকে মাঠের ওপারে ঝোপ-ঝাড় ও জঙ্গলের আভাস পেয়ে ওখানে গিয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেবে মনে করে যেই মাঠে নেমেছে, ওমনি হুড়মুড় করে পড়েছে এই গর্তে।

কিন্তু সিপাইগুলো থেমে গেল কেন? ওদের হাত থেকে পালাবার কোন উপায় নেই মনে করে? এত নিশ্চিত হচ্ছে কি করে ওরা? কেমন একটা অনিশ্চয়তা বোধ করছে রানা, আশঙ্কায় ঢিব ঢিব করছে বুকের ভিতরটা। কোনদিকে যাবে সে এখন?

গোপন একটা মিশন নিয়ে চলেছে সে লাহোর। অবশ্য ভারতীয় জার্নালিস্ট হিসেবে প্লেনে যেতে পারত সে, কিন্তু তাহলে আই. বি.র নজর এড়িয়ে কাজ হাসিল করা অসম্ভব হয়ে পড়ত। তাছাড়া এই বিদঘুটে ছদ্মবেশ ভেদ করে রানার আসল পরিচয় বের করে নেয়া খুব একটা কঠিন কিছুই নয় পি.সি. আইয়ের পক্ষে। কাজেই গোপনে সীমান্ত পেরিয়ে মাল বোঝাই ট্রাকের পিছনে উঠে লাহোর পৌঁছনোই স্থির করেছিল সে। কিন্তু পথের মধ্যে এই বিপদ হবে কে জানত! যাক, যা হবার হয়ে গেছে, এখন এর মধ্যে থেকে কৌশলে উদ্ধার পেতে হবে।

অল্পক্ষণেই দম ফিরে পেল সে। ভেবে দেখল, জনা ছয়েকের বেশি লোক নিশ্চয়ই থাকবে না এই পোস্টে। খুব সম্ভব এরা চোরাই মাল ধরার জন্যে সার্চ করতে চেয়েছিল ট্রাকটা, ভাবতেও পারেনি পিছনে কোন মানুষ লুকিয়ে থাকতে পারে।

কিন্তু আসবে ওরা। পরিষ্কার বুঝতে পারল রানা, নিশ্চয়ই আসবে। অন্তত যে দু'জনের নাক থেকে পোয়াটেক রক্ত ঝরিয়ে দিয়েছে ও, তারা তো ব্যক্তিগত উৎসাহে আসবে। এখানে বসে থাকার আর কোন মানে হয় না। মাঠের উপর দিয়ে উত্তর-পুব দিকে সোজা হাঁটলে নিশ্চয়ই বড় রাস্তায় পৌঁছতে পারবে সে। ওখান থেকে কাহনায় পৌঁছে যাবে মাইল তিনেক হাঁটলেই। সেখানেই আবার চেষ্টা করা যাবে চুরি করে কোন ট্রাকের পিছনে ওঠা যায় কিনা। আকাশের দিকে চাইল রানা। পুব দিক থেকে একটা ঘন কালো মেঘ দ্রুত উঠে আসছে, এগোচ্ছে চাঁদের দিকে। ঝড়-বৃষ্টি হবে নাকি আবার?

উঠে দাঁড়িয়ে জামা কাপড় থেকে ধুলো বালি ঝেড়ে ফেলল রানা। পর মুহূর্তেই বসে পড়ল আবার। ডান হাতটা দ্রুত চলে গেল কোটের নিচে শোল্ডার হোলস্টারের কাছে। আসছে ওরা।

এতক্ষণে বুঝতে পারল রানা কেন ওরা এত দেরি করছিল পিছু নিতে। ইচ্ছে করলে আরও দেরি করতে পারত। কিছু এসে যেত না। ও ভেবেছিল, কোন শব্দ বা নড়াচড়া হলেই ধরা পড়বার ভয় আছে—ভুলেই গিয়েছিল গন্ধ বলে একটা জিনিস আছে পৃথিবীতে। এবং কোন কোন জানোয়ারকে চোখ বেঁধে ছেড়ে দিলেও দিব্যি পৌঁছে যেতে পারে গন্তব্যস্থলে গন্ধ শুঁকে শুঁকে। কুকুর! ভয়ার্ত দৃষ্টি মেলে দেখল

রানা মাটির কাছে নাক নিয়ে গন্ধ শুঁকে এগিয়ে আসছে দুটো ভয়াল কুকুর। মিশমিশে কালো গায়ের রঙ। এক নজরেই চিনতে পারল রানা—ডোবারম্যান পিনশার। পৃথিবীর ভয়ংকরতম কুকুর। ইদানীং ব্যবহার করছে পাকিস্তান, খবর পেয়েছে সে। পিছনে শেকল হাতে খোশ-গল্প করতে করতে আসছে চারজন সেন্ট্রি।

লুকিয়ে থেকে লাভ নেই। তিন লাফে গর্ত থেকে বেরিয়ে একটা টিবির আড়ালে গিয়ে দাঁড়াল রানা। হাতে ল্যুগার। পঞ্চাশ ফুট দূর থেকে একটা কমলা লেবুকে দশবারের মধ্যে দশবারই ফুটো করতে পারে সে এই যন্ত্রটা দিয়ে। কিন্তু সে হচ্ছে ধীর স্থির মস্তিষ্কে শান্ত পরিবেশে প্র্যাকটিসের সময়। আজকের কথা আলাদা। ভয় পেয়েছে রানা, শুকিয়ে গেছে কণ্ঠতালু, হতাশায় ছেয়ে গেছে মন। নাহ্, বাঁচবার কোন রাস্তা নেই।

সেফটি ক্যাচ নামিয়ে প্রস্তুত হলো রানা। তিরিশ গজের মধ্যে এসে গেছে সিপাইগুলো শেকল বাঁধা কুকুরের টানে। অস্থির হয়ে উঠেছে কুকুর দুটো, আরও দ্রুত এগোবার জন্যে টেনে ছিঁড়ে ফেলতে চাইছে শিকল। স্পষ্ট টের পাচ্ছে ওরা রানার উপস্থিতি। নিস্তব্ধ রাত্রিকে কাঁপিয়ে দিয়ে হুঙ্কার ছাড়ল একটা কুকুর।

আর সময় নেই। জুতোর শব্দ পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছে রানা। একটা পাথরের টুকরোতে লাথি মারল একজন বুট দিয়ে, খট খট শব্দ তুলে রাস্তার উপর লাফাতে লাফাতে বেশ কিছুদূর চলে গেল সেটা। কোমরের কাছে বাঁধা লুকানো খাপ থেকে থ্রোয়িং নাইফটা বের করে বাম হাতে রাখল রানা—কাজে লাগতে পারে। একটা বোতাম টিপতেই সড়াৎ করে বেরিয়ে এল ছুরিটার চার ইঞ্চি ব্লেড। চায়নিজ স্টেন হাতে সেন্ট্রি চারজন এবার এগোচ্ছে সতর্ক পায়ে। কুকুরের ব্যবহারে টের পেয়েছে ওরা রানার মোটামুটি অবস্থান। হঠাৎ কুকুরগুলো ছেড়ে দিয়ে শুয়ে পড়তে পারে। একটা আধমনী পাথরের উপর ডান হাতের কব্জি রেখে পিস্তলটা তাক করল রানা বাম ধারের সেন্ট্রির বুক বরাবর। এক সেকেণ্ডে চারটে গুলি করে প্রথমে চারজন সেপাইকে খতম করতে হবে, তারপর শেষ করতে হবে কুকুর দুটোকে। একটা গুলিও নষ্ট করলে চলবে না। কারণ স্পেয়ার ম্যাগাজিন রয়ে গেছে ট্রাকের উপর ফেলে আসা সুটকেসের মধ্যে।

হঠাৎ চোখ পড়ল রানার, আরও চারজন সেন্ট্রি বাঁকটা ঘুরে মার্চ করে এগিয়ে আসছে এদিকে। হাতে চায়নিজ স্টেনগান। বুকের ভিতর হাতুড়ির ঘা থেমে গেল এক সেকেণ্ডের জন্যে। মুহূর্তে মিলিয়ে গেল আশার শেষ রশ্মিটুকু। ঢোক গেলার চেষ্টা করল রানা। শুকনো খটখটে জিভ। আটজন সিপাই, আর দুটো কুকুর—উঁহুঁ, অসম্ভব। এখন গুলি করা আর আত্মহত্যা করা এক কথা। বন্দী হলে হয়তো মুক্তির সুযোগ আসতেও পারে, কিন্তু অনর্থক খুন হয়ে গেলে কারও কোন লাভ হবে না। তার চেয়ে আশাবাদী হওয়াই ভাল।

ট্রিগার খুলে চাঁদির উপর রাখল রানা ছুরিটা, আবার বসাল টুপি যথাস্থানে,



তারপর সেফটি ক্যাচ তুলে দিয়ে ছুঁড়ে ফেলল পিস্তলটা সেন্ট্রিদের পায়ের কাছে। টিবির আড়াল থেকে বেরিয়ে রাস্তায় উঠে এল সে দুই হাত মাথার উপর তুলে।

মেঘে ঢাকা পড়ল চাঁদ। পশ্চিম আকাশের তারাগুলো উজ্জ্বলতর দেখাচ্ছে।

## তিন

আর্মি চেক পোস্টের ছোট্ট ঘরটা পর্যন্ত চুপচাপ এসে দাঁড়াল ওরা। মাঝে কোন ঘটনা নেই। রানা ভেবেছিল রাইফেলের কুঁদোর গুঁতো আর আর্মি বুটের অকৃপণ লাথিতে শুয়ে পড়তে হবে ওকে পথের উপর। নিদেন পক্ষে কিছু কিল, চড় আর কনুইয়ের ব্যবহার হবে প্রথমেই। কিন্তু তা হলো না। যেন রীতিমত ভদ্রতা করছে, এমনি ভাবে নিয়ে চলল ওরা রানাকে অফিসারের কাছে। যেন রানার উপর কারও কোন রাগ নেই, এমন কি রানার প্রচণ্ড ঘুসির ফলে যে লোকটা রুমাল দিয়ে নাক চেপে ধরে আছে এখনও, তারও না। অন্য কোন অস্ত্র আছে কিনা সংক্ষিপ্ত ভাবে পরীক্ষা করে দেখেছে একজন। কেউ একটা প্রশ্নও করেনি। কাগজ-পত্র কিছু দেখতে চায়নি। অস্বস্তি বোধ করতে আরম্ভ করল রানা ভয়ানক ভাবে। তবে কি এরা আশা করছিল ওকে? ফাঁদ পাতা ছিল আগে থেকেই? মিথ্যে খবর দিয়ে ডেকে আনা হয়েছে ওকে?

যে ট্রাকটার পিছনে উঠে এতদূর এসেছিল রানা, সেটা ঠায় দাঁড়িয়ে আছে এখনও। ড্রাইভারটা দুই হাত নেড়ে প্রবল যুক্তি তর্কের অবতারণা করে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করবার চেষ্টা করছে একজন সেন্ট্রির কাছে। নিশ্চয়ই রানার গোপন উপস্থিতি সম্পর্কে ওর কোন হাত আছে বলে ধরে নিয়েছে এরা। থেমে দাঁড়িয়ে ড্রাইভারের হয়ে কিছু বলতে যাচ্ছিল রানা, সুযোগ হলো না। সামনে একটা ভিড়ানো দরজা। দু'জন সিপাই দু'পাশ থেকে ধরল ওর দুই হাত, পিছনের ধাক্কায় ঢুকে পড়ল সে দরজা দিয়ে ঘরের ভিতর।

ছোট্ট ঘরটা। চারকোনা। আসবাবের বিশেষ বালাই নেই। এক কোণে একটা ছোট নড়বড়ে ডেস্কের উপর টেলিফোন, ডেস্কের এপাশে দুটো কাঠের খালি চেয়ার, ওপাশে অল্পবয়সী একজন সেকেণ্ড লেফটেন্যান্ট বসে আছে। ইউনিফরমের হাতায় লেখা M.P.—চেহারায় বিশেষ কোন বৈশিষ্ট্য নেই। ঠোঁটের উপর নতুন গজানো পাতলা গোঁফ। পাঞ্জাবী। ছোট ছোট চোখ জোড়ায় নীচতার আভাস। এটা পশ্চিম-পাঞ্জাবীদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য, দোষ ওর নয়। খুব সম্ভব গত বছর বাঙালী দমন করার জন্যে তাড়াহুড়ো করে রিক্রুট করা। সদ্য লব্ধ অফিসারী ভাঁট প্রকাশ পাচ্ছে হাবে-ভাবে। দুর্বল চরিত্রের ছোকরা, দুর্বলতা ঢাকবার জন্যেই কর্তৃত্বের খোলস পরে

হম্বিতম্বি করে তটস্থ করে রাখে অধঃস্তন কর্মচারীদের।

এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে নিল রানা সিপাইদের কাছ থেকে। লম্বা দুই-তিন পা ফেলে পৌঁছল ডেস্কের কাছে। ধাঁই করে কিল বসাল ডেস্কের উপর। ঋড়বড়ে টেবিলের উপর লাফিয়ে উঠল টেলিফোনটা। টিং করে শব্দ হলো একটা।

'অফিসার-ইন-চার্জ কে?..আপনি?' জিজ্ঞেস করল রানা কর্কশ কণ্ঠে, বিশুদ্ধ পাঞ্জাবীতে।

চমকে উঠেছিল ছোকরা ভয় পেয়ে। চট্‌ করে পিছনে সরে একটা হাত তুলে ফেলেছিল আত্মরক্ষার জন্যে—সামলে নিল। মাঝখানে হাতটা থামিয়ে দিয়ে কপাল চুলকাল। কিন্তু ওর অধীনস্থ কর্মচারীরা যে ওর এই আঁতকে ওঠা দেখে ফেলেছে, সেটা বুঝতে পেরে কান দুটো লাল হয়ে উঠল ওর। রেগে গেল সে নিজেরই উপর।

'নিশ্চয়ই। আপনার কোন সন্দেহ আছে?' উত্তর দিল সে।

'এইসব গুণ্ডামির কি অর্থ আমি জানতে চাই। চট্‌ করে পকেট থেকে পাসপোর্ট আর আইডেন্টিটি কার্ড বের করল রানা। ছুঁড়ে দিল টেবিলের উপর। 'এগুলো পরীক্ষা করে দেখুন। ফটো আর ফিঙ্গার প্রিন্ট মিলিয়ে দেখুন। তারপর যেতে দিন আমাকে।' অবাক হয়ে ছোকরাকে ওর মুখের দিকে চেয়ে থাকতে দেখে অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলল, 'নিন জলদি করুন। এমনিতেই দেরি হয়ে গেছে। আজকে কপালটাই খারাপ, পদে পদে খালি বাধা।' ঘড়ি দেখল। 'কই নিন, তাড়াতাড়ি দেখুন।'

রানার এই আত্মবিশ্বাস আর তেজ দেখে একটু যেন দমে গেল ছোকরা। ধীরে ধীরে কাগজগুলো তুলে নিল টেবিলের উপর থেকে।

'আলতাফ ঘোরি, বর্ন লাহোর, ওয়্যাস্ট পাকিস্তান, জার্নালিস্ট, স্পেশাল করেসপণ্ডেন্ট অফ দ্য হুরিয়াত,' বিড় বিড় করে পড়ল সেকেণ্ড লেফটেন্যান্ট।

'এবং এখন ফিরছি নয়াদিল্লী থেকে। আগামী পরশুর জরুরী প্রেস কনফারেন্সটা কাভার করেই আবার যাব ব্যাক টু নয়াদিল্লী।' ছোকরাটাকে চিন্তার সুযোগ না দিয়েই এবার একটা চিঠি ফেলল রানা টেবিলের উপর। ভারত ও পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে পাকিস্তানের তরফ থেকে বিশিষ্ট সাংবাদিক আলতাফ ঘোরির যোগদানের জন্য বিশেষ অনুমতি পত্র। ডিফেন্স মিনিস্ট্রির অফিশিয়াল সীলমোহর জ্বলজ্বল করছে।

পা বাধিয়ে ডেস্কের কাছে টেনে আনল রানা একটা চেয়ার। তাতে বসে প্লেয়ার্স নাম্বার থ্রী ধরাল একটা। ছোকরাটাকে সাধল, কিন্তু নিল না সে। নাক মুখ দিয়ে প্রচুর ধোঁয়া ছেড়ে প্রায় আপন মনে বলল রানা, 'আজকের এই ঘটনা আপনার সুপিরিয়র অফিসারের উপর কিরকম প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করবে, আঁচ করতে পারছেন নিশ্চয়ই? ব্যাপারটা পত্রিকায় বেরোলে খুব খুশি হবে না আপনাদের কমাণ্ডিং অফিসার, কি বলেন?'

চট্‌ করে চাইল সে একবার রানার দিকে। আবার মনোনিবেশ করল চিঠিতে।



আগাগোড়া বার দুয়েক পড়ে খামের মধ্যে ভরল চিঠিটা। রানা লক্ষ্য করল, মুখের চেহারাটা স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা কিছুটা সফল হলেও হাতের মৃদু কম্পন ঠেকাতে পারছে না ছেলেটা। নার্ভাস হয়ে পড়েছে। নিজের হাতের দিকে চেয়ে থাকল ছোকরা অল্পক্ষণ, তারপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাইল রানার দিকে।

'পালিয়ে গিয়েছিলেন কেন?' সহজ, সরাসরি প্রশ্ন।

'হায় আল্লা!' এ প্রশ্নের উত্তর তৈরি হয়ে গেছে এতক্ষণে রানার মনে মনে। 'রাতের অন্ধকারে আচমকা সশস্ত্র ডাকাত পড়ল গাড়িতে—এই অবস্থায় পালাব না? আপনি হলে কি করতেন? বসে বসে খুন হতেন ওদের হাতে?'

'ওরা আর্মির—'

'নিশ্চয়ই ওরা আর্মির লোক,' বাধা দিয়ে বলল রানা তিক্ত কণ্ঠে। 'সেটা পরে দেখতে পেয়েছি। দেখতে পেয়েই পিস্তল ফেলে দিয়ে রাস্তায় উঠে এসেছি মাথার উপর হাত তুলে। কিন্তু অন্ধকারে প্রথমে আমি বুঝতেই পারিনি—পারার কথাও নয়। হকচকিয়ে গিয়ে দু'জনকে দুটো কিল মেরে দৌড় দিয়েছিলাম।'

সামনের দিকে পা ছড়িয়ে দিয়ে শান্ত স্বাভাবিক ভঙ্গিতে সাংবাদিক সুলভ একটা ডোন্ট-কেয়ার ভাব নিয়ে বসেছে রানা। কিন্তু মাথার মধ্যে চলছে ওর দ্রুত চিন্তা। তাড়াতাড়ি শেষ করতে হবে এইসব কথোপকথন। ছোকরার বয়স যাই হোক, ট্রেনিং পাওয়া সেকেণ্ড লেফটেন্যান্ট। ওকে বেকুব মনে করার কোন কারণ নেই। যে-কোন মুহূর্তে যে-কোন একটা বেয়াড়া প্রশ্ন করে ফাঁসিয়ে দিতে পারে। রানা ভাবল, এখন আক্রমণাত্মক ভঙ্গিটা ছেড়ে দয়া-কৃপা-ক্ষমা ইত্যাদি বর্ষণ করলে হয়তো কাজ হতে পারে। গলা থেকে তিক্ত ভাবটা চলে গেল ওর, তার জায়গায় এল বন্ধুত্বের আভাস।

'দেখুন, লেফটেন্যান্ট, যা হবার হয়ে গেছে। ভুলে যান। আমার মনে হয় না দোষটা আপনার। আপনারা আপনাদের ডিউটি পালন করেছেন মাত্র। তাছাড়া আমার ওপর কোন রকম শারীরিক অত্যাচারও করা হয়নি। ভুলবশত হতে পারত। আমি ভেবে দেখলাম, আপনারা যথেষ্ট ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়েছেন। আসুন এক কাজ করা যাক, আপনি আমাকে লাহোর পর্যন্ত পৌঁছবার ব্যবস্থা করে দিন, আমি তার বদলে আজকের অপ্রীতিকর ঘটনাটা বেমালুম ভুলে যাব। এসব কথা আমার পেপারেও যাবে না, মিনিস্ট্রিতেও যাবে না, আপনার কমাণ্ডিং অফিসারের উপরও কোন চাপ আসবে না। কি, রাজি?'

'অনেক ধন্যবাদ! খুবই মহৎ লোক আপনি।' রানা যে উৎসাহ আশা করেছিল তার কিছুমাত্রও প্রকাশ পেল না অফিসারের কণ্ঠে। বরং যেন তীব্র একটা টিটকারির আভাস পাওয়া গেল। ওর ক্ষুদ্র দুই চোখের দিকে চেয়েই রানা নিজের ভুল বুঝতে পারল। এ লোক সহজ পাত্র নয়। রানার একটি কথাও বিশ্বাস করেনি ছোকরা। 'কিন্তু একটা কথা বলুন দেখি, মি. ঘোরি, ট্রাকের পিছনে আপনি কেন? আপনার মত

একজন স্বনামধন্য প্রথম শ্রেণীর সাংবাদিকের পক্ষে ড্রাইভারকে না জানিয়ে চুপি চুপি ট্রাকের পিছনে উঠে লাহোরের পথে পাড়ি দেয়াটা কি একটু অস্বাভাবিক নয়?'

'ওকে বললে ও আমাকে না-ও নিতে পারত। প্যাসেঞ্জার নেয়া ওদের নিষেধ আছে। কিন্তু আজই আমার পৌঁছতে হবে লাহোর।' রানা বুঝল ফাঁদে পা দিচ্ছে সে। খুব সাবধানে কথা বলতে হবে। একটা কথা এদিক ওদিক হলেই সব খতম হয়ে যাবে। কিন্তু একটু মেজাজ না দেখালে অসংখ্য প্রশ্ন করবে এই ছোকরা। বলল, 'দেখুন লেফটেন্যান্ট, আমি বলেছি, আমার তাড়া আছে। গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে লাহোরে ফিরছি আমি। আমার কাগজ-পত্র আপনি দেখেছেন। সারারাত আপনার সাথে গ্যাজর-গ্যাজর করার সময় আমার নেই। দেরি করালে নিজ দায়িত্বে করবেন।'

'কিন্তু কেন?'

'কি কেন?' প্রায় ধমকে উঠল রানা।

'মানে, আপনার এই গুরুত্বপূর্ণ প্রেস কনফারেন্স অ্যাটেণ্ড করার জন্যে মালবাহী পাঁচ টনের একটা...'

'ও, ট্রাকে কেন?' কথাটা শেষ করতে দিল না রানা। 'রাস্তাটার অবস্থা তো জানেনই। তার ওপর কয়েক পশলা বৃষ্টি হয়েছে বিকেলে। তাড়াহুড়ার জন্যে একটু বোধহয় অতিরিক্ত জোরেই চালাচ্ছিলাম, স্কিড করে পড়লাম গাড়িসুদ্ধ রাস্তার পাশের গর্তে। মিরাকুলাসলি বেঁচে গেছি আমি, একটা আঁচড়ও লাগেনি গায়ে, কিন্তু আমার ভক্সল ভিভার ফ্রন্ট অ্যাক্সেল দু'টুকরো হয়ে গেছে। এখান থেকে পঁচিশ মাইল দক্ষিণ-পুবে হুসায়নিওয়ালা আর কাসুরের মাঝামাঝি জায়গায় পড়ে আছে ওটা ডিচের মধ্যে। কাসুরের একটা ওয়ার্কশপ থেকে ওখানে মিস্ত্রি পাঠিয়ে দিয়েছি। ট্যাক্সির ব্যবস্থা করতে না পেরে আমি ট্রাকে চেপেছিলাম।'

চুপ করে থাকল সেকেণ্ড লেফটেন্যান্ট আধ মিনিট। তারপর বলল, 'নয়াদিল্লী থেকে আপনি গাড়ি করে আসছিলেন?'

'কেন, গাড়ি করে রাওয়ালপিণ্ডি থেকে সিমলা কাভার করে সুচেতগড় যেতে পারলাম, আর ওখান থেকে লাহোর আসতে পারব না?' রাগের ভান করে সিগারেটটা মাটিতে ফেলে জুতো দিয়ে মাড়িয়ে নিভাল রানা। অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলল, 'কিন্তু এইসব প্রশ্ন অপমানজনক। আমার কাগজপত্র আপনি দেখেছেন। বারবার বলছি, আমার তাড়াহুড়ো আছে। অযথা দেরি না করিয়ে আমার যাবার ব্যবস্থাটা করে দিন দয়া করে।'

'আর মাত্র দুটো প্রশ্ন। তারপরেই আপনার লাহোর পৌঁছানোর ব্যবস্থা করছি।' চেয়ারের পিঠে হেলান দিয়ে বসল অফিসার-ইন-চার্জ। কোন রকম তাড়াহুড়োর লক্ষণ দেখা গেল না তার মধ্যে। দুশ্চিন্তায় ছেয়ে গেল রানার মন। 'নয়াদিল্লী থেকে সোজা আসছেন আপনি?'

'সোজা কাকে বলছেন আপনি? লুধিয়ানা, জাগ্রাওন, মোগা, ফিরোজপুর,



হুসেইনিওয়ালা হয়ে আসছি।'

'কখন রওনা হয়েছেন, বিকেলে?'

'বিকেলে রওনা হলে এই সাড়ে তিনশো মাইল আসা সম্ভব হত না এইটুকু সময়ে। আমি রওনা হয়েছি সকালে।'

'কয়টা? দশ, এগারো?'

'না। ভোর ছয়টার সময়।'

'তাহলে বর্ডারে পৌঁছেছেন সন্ধের পর?'

মাথা নাড়ল রানা।

'সুতলেজ নদী পার হলেন কি করে?'

'ফেরীতে।' অম্লান বদনে বলল রানা।

'ফেরীতে গাড়ি পার করতে অসুবিধে হয়নি তো কোন?'

এইবার ঘাবড়ে গেল রানা। আসলে সে ওই রাস্তায় আসেইনি। এসেছে অমৃতসর থেকে খেমকারাণ হয়ে। কিন্তু ওর পাসপোর্টে এই বর্ডারের সীল রয়েছে বলে এই রুটের কথা বলতেই হবে ওকে। কথা উল্টানোর উপায় নেই।

'কই না তো!'

'ফেরী পারাপার চলছে তাহলে?'

'নিশ্চয়ই। নইলে এলাম কি করে?' ফ্যাকাসে হয়ে গেল রানার মুখ।

'কসম খেয়ে বলতে পারেন?'

'নিশ্চয়ই। কিন্তু কেন কসম খেতে যাব—'

সামান্য একটু সামনে ঝুঁকল লেফটেন্যান্টের মাথা, চোখ দুটো দ্রুত একবার নড়ল এদিক ওদিক। একটু বিস্মিত হলো রানা। কিন্তু বিন্দুমাত্র নড়াচড়ার সুযোগ পেল না। তার আগেই দু'জোড়া হাত খপ্ করে ধরে ফেলল রানার দুই হাত। টেনে দাঁড় করিয়ে হাত দুটো জোড়া করে একটা স্টীলের হ্যাণ্ডকাফ পরিয়ে দেয়া হলো ওর হাতে। চোখের সামনে দুলে উঠল অফিস ঘরটা। বাঁকা এক টুকরো হাসি ঝুলে আছে অফিসারের ঠোঁটে।

'এ সবের কি অর্থ?' তিক্ত, আহত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল রানা।

'অর্থ হচ্ছে, একমাত্র মিথ্যেবাদীই এত তেজ দেখাতে পারে আর্মি চেকপোস্টে,' স্বাভাবিক কণ্ঠে কথা বলবার চেষ্টা করছে ছোকরা, কিন্তু অন্তরের পুলক ঢাকতে পারছে না। 'তোমার জন্যে একটা সুখবর আছে আলতাফ ঘোরি—অবশ্য তোমার নাম যদি তাই হয়—গত পরশু থেকে হুসেইনিওয়ালা সেক্টরের ফেরী বন্ধ। ডুবে গেছে। আগামী সপ্তাহের শেষের দিকে আবার এই ফেরী চালু হওয়ার আশা আছে। অথচ আজ তুমি সেই ফেরী পার হয়ে সোজা চলে এসেছ, তাই না?' পুলকিত কণ্ঠে হেসে উঠল ছোকরা। একহাতে টেলিফোনের রিসিভার তুলে নিল। মুখে আত্মপ্রসাদের হাসি। উত্তেজনায় টগবগ করে ফুটছে ওর গায়ের রক্ত। ডায়াল করার
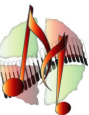
আগে রানার দিকে ফিরে বলল, 'লাহোরে পৌছবার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি, বাছাধন। আর্মি ভ্যানে চড়ে নিরাপদে পৌছে যাবে সোজা লাহোর ক্যান্টনমেন্টে। বেশ কিছুদিন হিন্দুস্থানী স্পাই ধরা পড়েনি। খবর পেলেই মহানন্দে ছুটে আসবে আমার কমান্ডিং অফিসার মেজর সুলতান নিজেই।'

রিসিভারটা কানে লাগিয়ে ভুরু কুঁচকে গেল ছোকরার। নামিয়ে রেখে আবার তুলল। কয়েকবার টোকা দিল ক্রেডলের উপর। তারপর বিরক্ত হয়ে রেখে দিল ওটা যথাস্থানে।

'আবার গেছে নষ্ট হয়ে, যখন তখন আউট অফ অর্ডার!' নিজের মুখে খবরটা ঘোষণা করার আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়ে একটু হতাশ দেখাল ওকে। ইশারায় একজন সেপাইকে ডাকল। ভ্রূ কুঁচকে আপাদমস্তক জরীপ করল ওকে।

'কাছাকাছি কোথায় টেলিফোন আছে?'

'পোস্ট অফিসে, স্যার। এখান থেকে দেড় মাইল।'

'সাইকেল আছে?'

'না, স্যার।'

'ঠিক আছে, হেঁটেই যেতে হবে। যত তাড়াতাড়ি পারো চলে যাও পোস্ট অফিসে।' একটা কাগজে কিছু লিখল সে খসখস করে। 'এই যে নম্বর। আর এই মেসেজ।' আবার লিখল আধ মিনিট। 'খবরটা যে আমি পাঠাচ্ছি সেটা পরিষ্কার করে আগে বলবে, তারপর মেসেজ দেবে। যাও, জলদি।'

খবরটা পাওয়া মাত্র মেজর সুলতানের মুখের চেহারা কি রকম হবে ভেবে মৃদু হাসল সেকেণ্ড লেফটেন্যান্ট। রীতিমত হুলুস্থুল পড়ে যাবে হেড কোয়ার্টারে। চাকরিতে ঢুকে এই প্রথম সুযোগ পেল সে যোগ্যতা প্রমাণের। কপাল ভাল, একেবারে রাঘব বোয়াল পেয়েছে সে জালে। উফ্‌! চিৎকার করে সবাইকে জানিয়ে দিতে ইচ্ছে করছে।

কাগজটা ভাঁজ করে পকেটে ফেলল সেপাইটা। এই কাজের ভার পেয়ে খুব খুশি হয়েছে বলে মনে হলো না ওকে দেখে। ওর হাতে একটা রেন কোট দেখে চট করে জানালা দিয়ে বাইরে চাইল রানা। একটু বেশি অন্ধকার লাগছে বাইরে। সেপাইটা বেরিয়ে যাবার সময় খোলা দরজা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে টের পেল রানা, এইটুকু সময়ের মধ্যেই মেঘে ছেয়ে গেছে আকাশটা, বৃষ্টি পড়ছে ঝুপঝুপিয়ে। এদেশে বর্ষা আসে জুলাই মাসে—বোধহয় শেষ বর্ষণ হচ্ছে এখন। এই বৃষ্টিতে লোকটার পোস্ট অফিসে পৌছতে বড় জোর এক ঘণ্টা লাগবে, হেড কোয়ার্টার থেকে গাড়ি আসতে বড় জোর আর এক ঘণ্টা। তারপরেই সব শেষ। ফিরে চাইল সে ছোকরা অফিসারের দিকে।

'আপনি বুঝতে পারছেন না কি ভুল করছেন। আপনার কপাল মন্দ, আমার আর কিছুই করার নেই,' বলল রানা। এপাশ ওপাশ মাথা নেড়ে জিভ দিয়ে চুক চুক শব্দ



করল।

'এখনও ভণ্ডামি হচ্ছে! তুমি ভেবেছ তোমার একটি কথাও বিশ্বাস করেছি আমি?' ঘড়ির দিকে চাইল সে। 'ঘণ্টা দেড়েক-দুয়েক লাগবে তোমার জন্যে গাড়ি পৌছতে। এই সময়টুকু আমরা সৎকাজে ব্যয় করতে পারি। নাও আরম্ভ করো। তোমার নাম?'

'তুমি অতিরিক্ত গোয়েন্দা ছবি দেখছ আজকাল, ছোকরা। পৃথিবীটা...'

'কি নাম তোমার?' ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল আবার অফিসার।

'আমার নাম আমি বলেছি। আমার কাগজ পত্রও দেখেছ তুমি। এর প্রতিটা অক্ষর সত্য। তোমাকে খুশি করার জন্যে মিছে কথা বলতে পারব না।'

কারও অনুমতি ছাড়াই আবার বসে পড়ল রানা চেয়ারে। হ্যাণ্ডকাফের উপর একবার চোখ বুলাল—না, অসম্ভব, এদিকে কোন সুবিধা হবে না। হাতকড়া পরা অবস্থায়ও ইচ্ছে করলেই সে ছোকরাটাকে খুন করে ফেলতে পারে এক মিনিটের মধ্যে। মাথার উপর ছুরি রয়েছে ওর। কিন্তু পিছনের তিনজন সেপাই? ওদের সামলানো যাবে না। কাজেই সে-চেষ্টা করেও লাভ নেই। অন্তত এখন নয়।

'মিছে কথা বলতে কে বলছে তোমাকে? স্মরণ শক্তিটা একটু ঝালাই করে নাও, তাহলেই হবে। তারজন্যে খানিকটা ওষুধ লাগবে, তাই না?' উঠে দাঁড়াল অফিসার। ডেস্কটা ঘুরে রানার সামনে এসে দাঁড়াল সে। 'কই, বলো? তোমার নাম?'

'আমি তো বলেইছি—' চমকে উঠে থেমে গেল রানা। খুব দ্রুত দুটো থাবড়া লাগাল অফিসার রানার গালে। একবার সোজা, একবার উল্টো। হাতের আংটি দিয়ে কেটে গেল রানার ঠোঁটের কোনা। হ্যাণ্ডকাফ লাগানো হাত দুটো তুলে হাতের পোঁছায় রক্ত মুছল সে। মুখের ভাবে কোন পরিবর্তন হলো না ওর।

'আবার একবার ভেবে দেখো ভাল করে। অনর্থক বোকামি না করে বলে ফেলো। ভাষার ওপর দখল দেখে বোঝা যাচ্ছে তুমি পূর্ব পাঞ্জাবের লোক। কিন্তু এ ছাড়াও অনেক কথা জানার আছে—এক কথা নিয়ে আর কতক্ষণ ধস্তাধস্তি করবে?'

একটা জঘন্য অশ্লীল পাঞ্জাবী গালি বেরিয়ে এল রানার মুখ দিয়ে। গালিটা অফিসারের বাপ-দাদা-চোদ্দপুরুষ সম্পর্কিত। টকটকে লাল হয়ে গেছে ছোকরার ফর্সা মুখ। এক পা এগিয়ে এল সে ঘুসি পাকিয়ে, পরমুহূর্তে চিৎ হয়ে পড়ল নড়বড়ে ডেস্কের উপর, তারপর মড়াৎ করে সেটার পায়া মচকে পড়ল মাটিতে। দড়াম করে কেকায়দা মত এক লাথি লাগিয়ে দিয়েছে রানা ওর দুই উরুর সংযোগ স্থলের দুর্বলতম জায়গায়। গোঁ-গোঁ আওয়াজ বেরোচ্ছে ওর মুখ দিয়ে। ব্যথার চোটে গড়াগড়ি খেল কয়েক সেকেণ্ড। হামাগুড়ি দিয়ে উঠে হাঁ করে শ্বাস নিচ্ছে এখন দাম্ভিক ছোকরা, বিকৃত হয়ে গেছে ওর মুখ। কয়েক সেকেণ্ড পড়ে রইল ওইভাবে, তারপর মচকানো টেবিলের পায়া আঁকড়ে ধরে উঠবার চেষ্টা করল। এই আকস্মিক

ঘটনায় হ্যাবাচ্যাকা খেয়ে দাঁড়িয়ে রইল কিংকর্তব্যবিমূঢ় সেপাইগুলো। কি করা উচিত বুঝে উঠতে না পেরে অর্ডারের অপেক্ষা করছে ওরা।

ঠিক এমনি সময়ে ঝটাং করে খুলে গেল দরজাটা। এক ঝলক ঠাণ্ডা ভেজা হাওয়া এসে ঢুকল ঘরের মধ্যে। ভেজা মাটির সোঁদা গন্ধ সে হাওয়ায়।

বাইরে বৃষ্টি পড়ছে এখনও।

## চার

পিছন ফিরে চাইল রানা। দেখল, দরজার চৌকাঠে দাঁড়িয়ে রয়েছে দীর্ঘ এক লোক। লোকটার অস্বাভাবিক উজ্জ্বল দুই কালো চোখ সারাটা ঘর একবার ঘুরে স্থির হলো এসে রানার চোখে। চমৎকার সুপুরুষ চেহারা, চওড়া কাঁধ, হাঁটুর নিচ পর্যন্ত লম্বা একটা আধ-ভেজা আর্মি রেনকোট, কোমরে বেল্ট বাঁধা, পায়ে গাম বুট। খাড়া নাক, ঘন কালো ভুরু, জুলফিগুলো কাঁচা পাকা। বয়স পঁয়তাল্লিশ কি পঞ্চাশ। চাউনি দেখেই বোঝা গেল, এ-লোক আদেশ করতেই অভ্যস্ত, আদেশ পালন করতে নয়। হোমড়া চোমড়া কেউকেটা হবে।

এক সেকেণ্ডে সম্পূর্ণ অবস্থাটা বুঝে নিল লোকটা। রানা টের পেল, এক সেকেণ্ডই এই লোকের পক্ষে যথেষ্ট। একেবারে শান দেয়া ছুরি। ঘরের অবস্থা দেখে একবিন্দুও অবাক হলো না লোকটা। দৃঢ়পায়ে এগিয়ে এসে টেনে তুলে খাড়া করে দিল সে সেকেণ্ড লেফটেন্যান্টকে।

'গর্দভ কোথাকার!' আগন্তুকের গলার স্বরে তীক্ষ্ণ তিরস্কার। পাঞ্জাবীতে কথা বলছে লোকটা। 'ভবিষ্যতে কাউকে কিছু প্রশ্ন করতে হলে তার পা থেকে সাবধান থাকবে।' রানার দিকে ইঙ্গিত করে বলল, 'কে এই লোকটা? কি জিজ্ঞেস করছিলে তুমি একে, এবং কেন?'

রানার দিকে বিষ নজরে চাইল একবার ছোকরা। উন্মত্ত জিঘাংসা ফুটে উঠল ওর চোখে। যেন চিবিয়ে খেয়ে ফেলবে এখনি। তারপর হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'ওর নাম আলতাফ খোরি, সাংবাদিক—আমি বিশ্বাস করি না সে কথা। ও একটা হিন্দুস্থানী স্পাই। হিন্দুস্থানী কুকুর একটা।'

'তা ঠিক। সব স্পাই-ই কুকুর। কিন্তু আমি তোমার মতামত শুনতে চাই না। আমি চাই তথ্য। প্রথম কথা, ওর নাম জানলে কি করে?'

'ও-ই বলেছে।' গাল কুঁচকাল ছোকরা কথা বলতে গিয়ে খচ করে ব্যথার খোঁচা খেয়ে। সেটা সামলে নিয়ে ঘাম মুছল কপালের। তারপর বলল, 'ওর কাগজ-পত্রেও তাই, লেখাগুলো সব জাল।'



'দেখি?' বাম হাতটা সামনে বাড়াল আগন্তুক।

ছোকরা এখন বেশ খানিকটা সামলে নিয়েছে। সোজা দাঁড়িয়ে মচকানো টেবিলের দিকে দেখাল। 'ওই তো ওখানে।'

'দেখি?' ঠিক একই সুরে দ্বিতীয়বার উচ্চারণ করল সে কথাটা। হাতটা তেমনি সামনে বাড়ানো।

একটু যেন হকচকিয়ে গিয়ে তাড়াতাড়ি টেবিলের উপর থেকে কাগজপত্র নিয়ে আগন্তুকের হাতে দিল অফিসার। নড়াচড়ায় আবার ব্যথা পেয়ে মুখ বিকৃত করল।

'চমৎকার!' পাসপোর্ট, আইডেন্টিটি কার্ড, আর খামে পোরা চিঠিটা উল্টেপাল্টে দেখল আগন্তুক। 'একেবারে খাঁটি দেখাচ্ছে। কিন্তু ঠিকই ধরেছ তুমি, এ সবকিছু নকল। যাক, পেয়ে গেছি, এ লোক আমাদের।'

রানা বুঝল অত্যন্ত ধূর্ত এবং ভয়ঙ্কর এই লোকটা। এক-শোটা সেকেণ্ড লেফটেন্যান্টের চেয়েও ভয়ঙ্কর। একে ধোঁকা দেবার মত যোগ্য লোক জন্মায়নি আজও।

'আপনাদের লোক? কি বলতে চান আপনি?' কথাটা বেরিয়ে গেল ছোকরা অফিসারের মুখ থেকে।

কটমট করে চাইল আগন্তুক। 'আমার প্রশ্নের উত্তর দাও। তুমি বলছ, লোকটা স্পাই। কেন? কেন তোমার এই ধারণা হলো?'

'ও বলছে ফিরোজপুর, হুসেইনিওয়ালা রুটে গাড়ি নিয়ে আজ ফেরী পার হয়েছে...'

'অথচ ফেরী বোট ডুবে গেছে গত পরশু, এই তো?' কথার মধ্যে বাধা দিয়ে বলল আগন্তুক। দেয়ালে হেলান দিয়ে সিগারেট ধরাল সে একটা। চিন্তিত মুখে চেয়ে রইল রানার দিকে। আনমনে টানতে থাকল সিগারেটটা চুপচাপ। আধ মিনিট পার হয়ে গেল একই ভাবে। পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে প্রহরী তিনজন।

হঠাৎ ঘোর কেটে গেল ছোকরা অফিসারের। রানার উপর চরম নির্যাতন করবার অদম্য বাসনা, আর এই অদ্ভুত আগন্তুকের উদ্ভট ব্যবহারে যৎপরোনাস্তি বিস্ময় তালগোল পাকিয়ে গিয়ে নিষ্ক্রিয় করে রেখেছিল ওর চিন্তা-শক্তিকে। নীরবতার সুযোগে মানসিক ভারসাম্য ফিরে পেল সে আবার, সেই সাথে ফিরে পেয়েছে আত্মবিশ্বাস। নীরবতা ভঙ্গ করল সে।

'আপনি আমাকে হুকুম করবার কে?' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল সে। 'আমি এখানকার অফিসার-ইন-চার্জ। আপনাকে চিনি না, জানি না, আপনি কোত্থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসছেন?'

আরও অন্তত পনেরো সেকেণ্ড নিঃশব্দে রানার চেহারা আর কাপড়-চোপড় লক্ষ করল আগন্তুক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে। তারপর নিতান্ত আলস্য ভরে ঘুরে দাঁড়িয়ে স্থির দৃষ্টিতে চাইল সে ছোকরার দিকে। মুখে নিরাসক্ত ভাব। ভিতর ভিতর ক্ষেপে উঠল
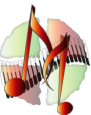
অফিসার, নিজের অজান্তেই পিছিয়ে গেল এক পা।

'তুমি যে কথাটা বললে, এবং যেভাবে বললে তার জন্যে আপাতত তোমাকে আমি ক্ষমা করলাম।' বুড়ো আঙুল ঘুরিয়ে রানার দিকে ইঙ্গিত করল আগন্তুক। 'লোকটার ঠোঁট কেটে গেছে দেখছি। গ্রেপ্তার করবার সময় বাধা দিয়েছিল?'

'আমার প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিল না তাই…'

'কোন্ অধিকারে তুমি জখম করেছ ওকে? প্রশ্ন করবারই বা অধিকার কে দিয়েছে তোমাকে?' ধমক তো নয়, যেন চাবুক পড়ল লেফটেন্যান্টের পিঠে। 'হতচ্ছাড়া, পাজি, গর্দভ কোথাকার! জানো তুমি কতখানি ক্ষতি হয়ে যেতে পারত? ভবিষ্যতে নিজের ক্ষমতার সীমা যদি আবার লঙ্ঘন করো, আমি নিজে তোমার উপযুক্ত ব্যবস্থা করব। গেঁয়ো ভূত, মূর্খ কোথাকার।'

দুই চোখে আতঙ্কের ছায়া পড়ল ছোকরা অফিসারের। শুকনো ঠোঁট দুটো চেটে নিল একবার। ঢোক গিলে বলল, 'আমি…আমি চিন্তা করেছিলাম…'

'চিন্তা!' যেন আকাশ থেকে পড়ল আগন্তুক। 'চিন্তা ভাবনার ব্যাপারটা যোগ্য ব্যক্তির জন্যে তুলে রেখো। ওটা তোমার মত গর্দভের কর্ম নয়।' আরেকবার বুড়ো আঙুল দিয়ে রানার দিকে ইঙ্গিত করল আগন্তুক। 'এই লোকটাকে এখান থেকে বের করে আমার গাড়িতে তুলে দাও। ওকে সার্চ করা হয়েছে ঠিক মত?'

'হয়েছে, স্যার।' ভয়ের চোটে "স্যার" বেরিয়ে গেল লেফটেন্যান্টের মুখ থেকে। ইশ্‌শ…মস্ত বোকামি হয়ে গেছে! আর্মি রেইনকোট দেখেই বোঝা উচিত ছিল ওর, আধভেজা রেইনকোট দেখে বোঝা উচিত ছিল লোকটা গাড়ি করে এসেছে, নিশ্চয়ই বিরাট কোন আর্মি অফিসার। কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, 'ভালভাবে সার্চ করা হয়েছে—আগাগোড়া।'

'তোমার এই কথা কতখানি নির্ভরযোগ্য তাতে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে।' রানার দিকে ফিরে ডান ভুরুটা আধ ইঞ্চি উপরে উঠাল আগন্তুক। বলল, 'আমার কি নিজের হাতে একবার সার্চ করতে হবে, না কোন অস্ত্র থাকলে নিজেই বের করে দিয়ে আমাকে এই গ্লানিকর কাজ থেকে রেহাই দেবেন?'

'আমার টুপির নিচে ছুরি আছে একটা।'

'অসংখ্য ধন্যবাদ।' পিছন থেকে আলগোছে টুপি উঠিয়ে ছুরিটা তুলে নিল আগন্তুক, তারপর যথেষ্ট ভদ্রতার সাথে আবার টুপিটা রাখল রানার মাথার উপর। বোতাম টিপতেই সড়াৎ করে বেরিয়ে এল চার ইঞ্চি ব্লেড। ক্ষুরধার দুই-ফলা ব্লেডটা পরীক্ষা করে দেখল সে একবার, ছুরিটা ভাঁজ করে রাখল পকেটে, তারপর ফিরে চাইল সেকেণ্ড লেফটেন্যান্টের রক্তশূন্য মুখের দিকে।

'এমন অকর্মা লোক তুমি—প্রমোশন তোমার ঠেকায় কে!' ঘড়ির দিকে চাইল সে একবার। 'যাক, রওনা হতে হবে এখন। আচ্ছা! তোমার এখানে টেলিফোনও আছে দেখছি! আমাকে আর্মি ইন্টেলিজেন্সের লাইন দাও। জলদি।'



চমকে উঠল রানা। যদিও ক্রমেই পরিষ্কার হয়ে আসছিল রানার কাছে লোকটার পরিচয়, তবু নিশ্চিত জ্ঞান লাভ করে সত্যিই রীতিমত চমকে উঠল সে। পাকিস্তান আর্মি ইন্টেলিজেন্সকে আর যাই হোক আণ্ডারএস্টিমেট করবার ধৃষ্টতা অন্তত রানার নেই। সে নিজেও ছিল এক সময় আর্মি ইন্টেলিজেন্সের মেজর। আর্মি, নেভি আর এয়ারফোর্সের বাছাই করা চৌকস লোকদের স্পেশাল কমাণ্ডো ট্রেনিং দিয়ে দুর্ধর্ষ করে নেয়া হয় প্রথমে, তারপর চলে আড়াই বছরের বিভিন্ন বিষয়ক কঠোর এসপিয়োনাজ ট্রেনিং কোর্স। বাছাই করা দুইশোর মধ্যে শেষ পর্যন্ত প্রতি বছর টেকে বড়জোর বিশ কি পঁচিশ জন। এরা যেমন ভয়ঙ্কর, তেমনি ক্ষমতাশালী। বাংলাদেশে এদের নৃশংস অত্যাচারের তুলনা হয় না। কত অসংখ্য মুক্তিকামী বাঙালী যুবক যে প্রাণ দিয়েছে এদের চাবুকের মুখে তা কোনদিন জানতে পারবে না জনসাধারণ। এদেরই হেড কোয়ার্টারে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ওকে!

'বাহ্! দেখছি আমাদের পরিচয় জানা আছে আপনার!' হাসল আগন্তুক। 'ভারত থেকে যথেষ্ট জ্ঞান সঞ্চয় করে এসেছেন দেখছি!' হঠাৎ ঘুরল সে ছোকরা লেফটেন্যান্টের দিকে। 'কি, তোমার কি হলো আবার?'

'টেলিফোনটা খারাপ হয়ে গেছে, স্যার,' অপরাধী কণ্ঠে বলল সে।

'তা তো হবেই। কোনও দিক থেকেই তোমার কোন তুলনা হয় না। একেবারে লা জওয়াব!' পকেট থেকে একটা সবুজ আইডেন্টিটি কার্ড বের করে সেকেণ্ড লেফটেন্যান্টের চোখের সামনে মেলে ধরল সে কয়েক সেকেণ্ড। 'তোমার বন্দীকে নিয়ে যাওয়ার পক্ষে এই পরিচয় নিশ্চয়ই যথেষ্ট, তাই না?'

'নিশ্চয়ই, কর্নেল, নিশ্চয়ই। আপনি যা বলবেন তাই হবে।' কার্ডের উপর একনজর চোখ বুলিয়েই অ্যাটেনশন হয়ে দাঁড়িয়েছে সে।

'বেশ।' কার্ডটা ভাঁজ করে পকেটে রেখে রানার দিকে ফিরল আগন্তুক। বলল, 'কর্নেল এহসান অভ আর্মি ইন্টেলিজেন্স অ্যাট ইয়োর সার্ভিস, স্যার। বাইরে গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে আপনার জন্যে। এক্ষুণি লাহোরে ফিরে যাচ্ছি আমরা। আমি এবং আমার সহকর্মীবৃন্দ কয়েক সপ্তাহ ধরেই অধীর ভাবে অপেক্ষা করছিলাম আপনার জন্যে। এসে পড়েছেন, ভালই হয়েছে। চলুন, কিছু আলাপ-সালাপ করা যাবে।'

## পাঁচ

নিস্তুটি সেডেন মডেলের কালো একটা শোভোলে দাঁড়িয়ে আছে। রানার সুটকেসটা ট্রাকের পিছন থেকে নিয়ে আসা হলো কর্নেল এহসানের নির্দেশে, রাখা হলো গাড়ির পিছনের সীটে। পিস্তলটা পকেটে পুরল কর্নেল। উঠে বসল ড্রাইভিং সীটে।

ওয়াইপারটা চালু করে দিয়ে পরিষ্কার করে নিল সামনের কাচ।

রানাকে পাশের সীটে বসানো হলো। তারপর হাত-পা বুক-পেট আচ্ছা করে বেঁধে ফেলা হলো গাড়ির বডির সাথে ফিট করা লোহার চেন দিয়ে নিপুণ হাতে। একবিন্দু বাড়তি নড়াচড়ার ক্ষমতা রইল না আর।

'গাড়িতে আমরা একটু বিশেষ ব্যবস্থা রাখি। অবশ্য সেটা যাত্রীদের নিরাপত্তার কথা ভেবেই।' বিনয় করে বলল কর্নেল। 'আমার গাড়ির যাত্রীদের মধ্যে অনেকের আবার আত্মহত্যার নেশায় পেয়ে বসে—কিছুতেই হেড কোয়ার্টারে যেতে চায় না। বাঙালী কাউকে চড়ালে তো কথাই নেই, সীট খারাপ করে ফেলে।' বাঁধা শেষ করে বলল, 'আরাম করে বসে যেতে পারবেন, সীট বেল্টের কাজ দেবে শিকলগুলো, একটু আধটু নড়াচড়াও করতে পারবেন, কিন্তু আমার নাগাল পাবেন না হাজার চেষ্টা করলেও। দরজা খুলে বাইরে লাফিয়ে পড়তে পারবেন না, কারণ লক্ষ করলেই দেখতে পাবেন, আপনার দিকে দরজা খোলার হাতলটা নেই। আর শিকল ছেঁড়ার ব্যর্থ চেষ্টা করতে আমি মানাই করব, কারণ, একবার এক বন্দী···আরে, তুমি আবার কি চাও?' ভ্রূকুটি করে চাইল কর্নেল সেকেণ্ড লেফটেন্যান্টের দিকে।

'আপনাকে বলতে ভুলে গিয়েছিলাম স্যার, লাহোরে আমাদের সি. ও.-র কাছে এই লোকটার জন্যে গাড়ি পাঠাতে বলে একটা মেসেজ দিয়েছিলাম,' ভয়ে ভয়ে বলল অফিসার ইন-চার্জ।

'তাই নাকি? কখন?' একটু যেন তীক্ষ্ণ শোনাল কর্নেলের কণ্ঠস্বর।

'আধঘণ্টা খানেক আগে।'

'বুদ্ধু কাঁহিকে! আমাকে আগেই বলা উচিত ছিল সেকথা। যাক্, ক্ষতি নেই কোন। তোমার নিজের বোকামির জন্যে সি. ও.-র কিছু গালাগালিও উপরি পাওনা হিসেবে উপার্জন করে রাখলে আর কি?'

দড়াম করে দরজাটা বন্ধ করে কার্টসি লাইটটা জ্বেলে দিল কর্নেল, যাতে রানার প্রতিটা নড়াচড়া ও কার্যকলাপ পরিষ্কার দেখা যায়। গাড়ি স্টার্ট দিয়ে জানালা দিয়ে মুখ বের করে সেকেণ্ড লেফটেন্যান্টের উদ্দেশে বলল, 'দুঃখ কোরো'না ছোকরা, তোমার শোধ আমরাই তুলে নেব এর উপর। এর কপালে কী নির্যাতন অপেক্ষা করছে তুমি কল্পনাও করতে পারবে না। আর হ্যাঁ, ওই ট্রাক ড্রাইভারকে দরকার নেই আমাদের—ছেড়ে দাও ওকে দু'চার ঘা দিয়ে। যাও।'

ছুটল গাড়ি লাহোরের পথে। দক্ষ হাতে স্টিয়ারিং ধরে বসে আছে এহসান, ওর উজ্জ্বল চোখের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মাঝে মাঝে রাস্তা ছেড়ে চট্ করে ঘুরে যাচ্ছে রানার উপর দিয়ে। অত্যন্ত সাবধান লোকটা।

স্থির দৃষ্টিতে সামনের দিকে চেয়ে বসে আছে রানা। কর্নেলের বারণ সত্ত্বেও শিকলগুলো পরীক্ষা করে দেখেছে সে ইতিমধ্যেই। অসম্ভব। এবার মাথা ঠাণ্ডা রেখে ভবিষ্যতের কথা ভাবতে চেষ্টা করল সে। মানুষের জীবনে কত ঘটনা ঘটে। রানার



নিজের জীবনেই ঘটেছে কতবার। কিন্তু সে অন্য ধরনের। ওর জানা আছে, পাকিস্তান আর্মি ইন্টেলিজেন্সের টর্চার চেম্বারে মরে বেঁচেছে অনেকে, কিন্তু আজ পর্যন্ত কেউ কখনও জীবিত রক্ষা পায়নি। রানা জানে, সে-ও পাবে না। একবার ঢুকলে আশা ভরসা সব শেষ। যদি পালাতে হয়, তাহলে এই গাড়ি থেকেই পালাতে হবে। এবং এক ঘণ্টার মধ্যেই। কিন্তু কিভাবে?

জানালার কাচ নামানোর হ্যাণ্ডেলটা নেই। থাকলেই বা কি হত—জানালা খোলা থাকলেও তো সে দরজা খোলার বাইরের দিকের নব পর্যন্ত হাত বাড়াতে পারত না। স্টিয়ারিং-এও পৌঁছবে না ওর হাত—মনে মনে হিসেব করে দেখেছে সে, অন্তত দু'ইঞ্চি ফাঁক থাকবে চেষ্টা করতে গেলে। পা দুটো কিছুদূর নড়ানো যাচ্ছে ঠিকই, কিন্তু লাথি দিয়ে সামনের উইণ্ডস্ক্রীন ভেঙে দিয়ে অ্যাক্সিডেন্ট ঘটানোর কোন বন্দোবস্ত নেই। অত উঁচুতে ওঠানো যাবে না পা। মাথার মধ্যে একটার পর একটা চিন্তা আসছে রানার, ঠিক রাস্তার পাশের ল্যাম্প-পোস্টগুলোর মতন, তারপর সরে যাচ্ছে পিছনে। পথ খুঁজে পাচ্ছে না রানা। যে করে হোক একটা কিছু বুদ্ধি বের করতেই হবে। বোকার মত কিছু করে বসা মোটেই ঠিক হবে না। তাহলে কানের পিছনে পিস্তলের বাঁটের একটা টোকা মেরে ঘুম পাড়িয়ে দেবে চতুর কর্নেল। ঘুমিয়েই পৌঁছে যাবে হেড কোয়ার্টার। এমন অসহায় অবস্থায় পড়ে ক্ষোভে দুঃখে মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করল রানার—কিন্তু চুল পর্যন্ত হাত পৌঁছবে কি না বোঝা যাচ্ছে না।

আচ্ছা পকেটে কি কি আছে? এমন কিছু কি নেই যা ব্যবহার করা যায়? শক্ত কিছু, যেটা মাথায় ছুঁড়ে মেরে ব্যাটাকে বেহুঁশ করে গাড়িটা ধাক্কা খাওয়ানো যায়? অ্যাক্সিডেন্ট হলে অবশ্য সে নিজেও মারাত্মক ভাবে জখম হতে পারে, কিন্তু আগে থেকে সাবধান থাকলে না-ও হতে পারে। হ্যাণ্ডকাফের চাবিটা কোথায় রাখা হয়েছে ও জানে। কাজেই···

কিন্তু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে চিন্তা করে দেখল রানা, ওর পকেটে কয়েকটা পয়সা ছাড়া শক্ত কিছুই নেই। জুতো? একটা জুতো খুলে চেষ্টা করে দেখবে নাকি? নাহ্, হাতটা পৌঁছবে না পা পর্যন্ত। হঠাৎ একটা কথা চট করে মাথায় এল রানার—এতে বাঁচবার কিছু সম্ভাবনা থাকতে পারে। ঠিক এমনি সময় কথা বলে উঠল কর্নেল।

'আপনি দেখছি ভয়ঙ্কর লোক! অতিরিক্ত চিন্তা করেন আপনি, মিস্টার খোরি।'

রানা কোন জবাব দিল না।

'এত ভয়ঙ্কর আর এত আত্মপ্রত্যয়ী মানুষ চাপেনি ওই সীটে আগে। কোথায় চলেছেন, কাদের পাল্লায় পড়েছেন, সব জানেন, অথচ যেন পরোয়া নেই কোন। ক্রমাগত ভেবে চলেছেন একটার পর একটা মুক্তির উপায়।'

এবারও কোন জবাব দিল না রানা। মাথার মধ্যে একটু আগের সেই প্ল্যানটা ঘুরছে ওর। বিপদ আছে, কিন্তু সাফল্যের সম্ভাবনাও আছে। ঝুঁকিটা নিতেই হবে।
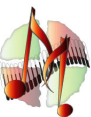
'চুপ করে রইলেন যে? কোন অসুবিধে হচ্ছে না তো আপনার?' জিজ্ঞেস করল কর্নেল। একটা সিগারেট ধরিয়ে কাঠিটা ছুঁড়ে ফেলল জানালা দিয়ে বাইরে। রানা বুঝল, এই সুযোগ।

'না, তেমন কিছু নয়' বলল রানা। 'তবে একটা সিগারেট হলে মন্দ হত না।'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই,' ব্যস্ত-সমস্ত ভাবে বলল কর্নেল এহসান। 'আপনার সামনে গ্লাভ-কম্পার্টমেন্টে সিগারেট আছে। অতিথিদের জন্যেই ওগুলো রাখা। বিনা দ্বিধায় ব্যবহার করুন।'

'ধন্যবাদ।' গ্লাভ কম্পার্টমেন্ট থেকে একটা ফেল্টারফিল্ড বের করে ঠোঁটে লাগাল রানা। ড্যাশবোর্ডের উপর উঁচু একটা নিকেলের চাকতির দিকে ইঙ্গিত করে জিজ্ঞেস করল, 'লাইটার না ওটা?'

'হ্যাঁ, ব্যবহার করুন।'

দুই হাত সামনে বাড়িয়ে টিপে দিল রানা ওটা। কয়েক সেকেন্ড পরই 'টিক' শব্দ করে বেরিয়ে এল ওটা আগের জায়গায়। বের করে আনল রানা লাইটারটা, লাল হয়ে আছে ওটার মাথা। সিগারেটটা ধরাতে যাবে এমনি সময় হাত থেকে ফস্কে পড়ে গেল সেটা মেঝেতে। নিচু হয়ে ধরতে চেষ্টা করল রানা, কিন্তু পারল না, কিছুদূর গিয়ে থেমে গেল হাতটা, আর নিচু হওয়া যাচ্ছে না।

হেসে উঠল এহসান। সোজা হয়ে ফিরে চাইল রানা ওর মুখের দিকে। কর্নেলের হাসিতে বিদ্রূপ নেই। বরং প্রশংসার দৃষ্টিতে চাইল সে রানার চোখে।

'বাহ্! চমৎকার! আপনি অত্যন্ত বুদ্ধিমান লোক মিস্টার আলতাফ। এবং ভয়ঙ্কর। এ ব্যাপারে আরও স্থির নিশ্চিত হলাম আমি। বিশ্বাস করুন, আপনার সাথে এক গাড়িতে চলতে ভয় লাগছে এখন আমার।' সিগারেটে লম্বা করে একটা টান দিল কর্নেল, তারপর বলল, 'আমার জন্যে তিনটে পথ এখন খোলা আছে, তাই না? আমি দুঃখিত, (কণ্ঠস্বরটা মোটেই দুঃখিত শোনাচ্ছে না) তিনটে পথের একটাতেও যাব না আমি। চতুর্থ আরেকটা পথ বের করে নিয়েছি।'

'কি বলছেন কিছুই বুঝতে পারছি না আমি,' বলল রানা বিস্মিত কণ্ঠে।

আবার হেসে উঠল এহসান। 'বিস্মিত হবার অভিনয়টাও চমৎকার হয়েছে। যা বলছিলাম, তিনটে পথ খোলা ছিল আমার। প্রথম—ভদ্রতা করে আমি নিচু হয়ে লাইটারটা তুলে দিতে পারতাম। আর নিচু হওয়া মাত্রই মাথার পিছনে স্টিলের হ্যাণ্ডকাফ দিয়ে প্রাণপণ শক্তিতে আঘাত করে আপনি আমাকে অজ্ঞান করে ফেলতেন। আর হ্যাণ্ডকাফের চাবিটা কোথায় আছে তা-ও আপনার জানা আছে—না দেখার ভান করে খুব মনোযোগ দিয়ে লক্ষ করেছেন আপনি সেটা। কাজেই দশ সেকেন্ডে মুক্ত করে ফেলতেন নিজেকে।'

যেন কিছুই বুঝতে পারছে না, এমনি ভাবে চাইল রানা ওর দিকে। কিন্তু ভিতর ভিতর পরিষ্কার বুঝল, হেরে গেছে সে। ধরা পড়ে গেছে।



'দ্বিতীয়—আমি ম্যাচ বাক্সটা ছুঁড়ে দিতে পারতাম আপনার দিকে। একটা কাঠি জ্বেলে বাকি সবগুলোর মাথার বারুদে আগুন ধরিয়ে ছুঁড়ে মারতেন তাহলে সেটা আমার মুখের উপর, ব্যালান্স হারিয়ে পড়ে যেত গাড়ি ডিচের মধ্যে। তারপর কি হত কে জানে? অ্যাক্সিডেন্ট হলেও তো অনেকে বেঁচে যায়, আপনি নিজেই তো বলছেন আজই আশ্চর্য ভাবে বেঁচে গেছেন একটা মোটর দুর্ঘটনা থেকে। খোদা চাহে তো যদি আমি মারা যেতাম, তাহলেও ঠিক দশ সেকেন্ড লাগত আপনার মুক্ত হতে। আর তৃতীয়—আমি হয়তো একটা কাঠি জ্বেলে আপনার সিগারেটটা ধরিয়ে দিতে যেতাম। ওমনি ফিঙ্গার জুডো, মড়মড় করে আমার আঙুলগুলো ভেঙে ফেলা, তারপর এগিয়ে এসে রিস্ট-লক, ব্যস চাবিটা এসে যেত হাতের কাছে।' আবার লম্বা টান দিল সে সিগারেটে। 'অত্যন্ত দুর্ধর্ষ লোক আপনি মিস্টার আলতাফ ঘোরি।'

'খামোকা বাজে বকছেন,' বলল রানা গম্ভীর ভাবে।

'হতে পারে। আমার সন্দেহপ্রবণ মন। কিন্তু সন্দেহের জোরেই টিকে আছি আজ পর্যন্ত। এই নিন, দেখুন আমার চতুর্থ পথটা আপনার পছন্দ হয় কিনা।' একটা ম্যাচের কাঠি ফেলল কর্নেল রানার কোলের উপর। 'ওই লোহাটার ওপর ঘষলেই জ্বলে উঠবে কাঠি। ওটা দিয়ে সিগারেট ধরিয়ে নিন।'

চুপচাপ সিগারেট ফুঁকে চলল রানা। রাত পোনে দুটো। ফাঁকা রাস্তা দিয়ে ষাট মাইল বেগে ছুটে চলল শেভ্রোলে। চার চারটে হেড লাইটের আলোতে আলোকিত অফুরন্ত রাস্তা। মডেল টাউন আর ইছরার মাঝামাঝি এসে হঠাৎ জোরে ব্রেক করে বড় রাস্তা ছেড়ে বাঁয়ের একটা সরু গলিতে চলে এল কর্নেল। কিছুদূর গিয়ে বড় রাস্তার সাথে সমান্তরাল ভাবে গজ বিশেক দূরে দাঁড়িয়ে পড়ল গাড়ি কয়েকটা ঘন ঝোপের আড়ালে। এঞ্জিন বন্ধ করে হেড লাইট অফ করে দিল সে। ডান ধারের জানালাটা সম্পূর্ণ খুলে দিয়ে ফিরল রানার দিকে। কার্টসি লাইটটা কেবল জ্বলছে গাড়ির মধ্যে। চারদিকে ফাঁকা মাঠ, জনপ্রাণীর চিহ্ন নেই।

রানার পকেট থেকে চাবি বের করে নিয়ে সুটকেসটা খুলে ফেলল কর্নেল এহসান। নিপুণ হাতে একটা ক্যানভাস লাইনিং ছিঁড়ে বের করল কয়েকটা কাগজ—যেন জানাই ছিল ওর কোথায় কি আছে।

'বাহ্! এক মুহূর্তে আপনার সমস্ত পরিচয় পাল্টে গেল মিস্টার আলতাফ ঘোরি। নাম, জন্মস্থান, পেশা— সবকিছু। চমৎকার! দুই পরিচয়ের কোনটা বিশ্বাস করতে বলেন?'

'আগেরটা জাল,' এইবার পাঞ্জাবী ছেড়ে খাস সিন্ধী ভাষায় কথা বলে উঠল রানা। 'লক্ষ্ণৌ-এ আমার মা মৃত্যু শয্যায়, তাই জাল পরিচয় পত্র নিয়ে দেখতে গিয়েছিলাম। এছাড়া আমার আর কোন উপায় ছিল না, কর্নেল।'

'আচ্ছা! তা আপনার মা…'

'মারা গেছেন,' শোকার্ত কণ্ঠে বলল রানা।

'ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন!' সশব্দে হেসে উঠল কর্নেল।

'কারও মায়ের মৃত্যু নিয়ে এভাবে ইয়ার্কি মারা আপনাদেরই সাজে,' আহত গলায় বলল রানা। দুই চোখে ওর অভিমান আর অভিযোগ।

'সেজন্যে আমি দুঃখিত, জনাব শরাফ আলী। আমি আসলে হাসছিলাম আপনার নির্ভুল সিন্ধী শুনে। তাহলে হায়দ্রাবাদেই জন্ম আপনার?'

'জ্বি। আমাদের জমিদারী আছে ওখানে। কিন্তু আব্বা কিছুতেই ভারত ছাড়লেন না। আমার নাম, ঠিকানা, জন্ম তারিখ, সবকিছু ঠিক ঠিক পাবেন হায়দ্রাবাদের মিউনিসিপ্যালিটি ,অফিসে। বেশ বড় সড় ওয়াডেরা (জমিদার) আমাদের ফ্যামিলি—সব জানতে পারবেন। এমন কি...'

'বুঝেছি, বুঝেছি,' একটা হাত তুলে বাধা দিল কর্নেল এহসান। 'এ ব্যাপারে আমার আর কোন সন্দেহ নেই। এমন কি যে স্কুল ডেস্কের ওপর ক্লাস ফাইভে পড়ার সময় ব্লেড দিয়ে নিজের নাম খোদাই করেছিলেন সেটাও আপনি দেখাতে পারবেন, তাতে আমার আর কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু আপনার এবং আপনার উপরওয়ালাদের প্রশংসা না করে পারছি না। ভারত যে এত এগিয়ে গেছে কল্পনাতেও ছিল না আমার। নাকি পূর্ব পাকিস্তান থেকে এসেছেন? সে যাই হোক, সত্যি বলছি, রীতিমত হিংসে হচ্ছে আমার।'

'আপনি মিথ্যে আমাকে সন্দেহ করছেন, কর্নেল। আমি একজন সাধারণ সিন্ধী ওয়াডেরা! রাজনীতির ধারও ধারি না। জিয়ে সিন্ধ আন্দোলনের সাথেও আমার কোন সম্পর্ক নেই। জোরের সাথে আমি একথা প্রমাণ করতে পারি। আত্ম-পরিচয় জাল করে অন্যায় করেছি আমি, স্বীকার করি, এদিকে আমার মা মারা যাচ্ছেন—সেজন্যে একটু দয়া আশা করতে পারি না আমি আপনাদের কাছে? আমার নিজের দেশের কোন ক্ষতি তো করিনি আমি। মাকে দেখেই ফিরে এসেছি দেশে।'

'কি বললেন? দেশে ফিরে এসেছেন? আমি একুণি প্রমাণ করে দিতে পারি, আপনি পশ্চিম পাকিস্তানী নন।' রানার চোখে চোখ রেখে কথা বলছিল কর্নেল, হঠাৎ মুখের ভাব বদলে গেল, দৃষ্টিটা সামান্য একটু বাঁ পাশে সরল, বলল, 'পিছনে কে?'

ঝট করে ঘুরে পিছনে চাইল রানা। ঘুরেই বুঝল বোকামি হয়ে গেছে। কথাটা কর্নেল এহসান বলেছে পরিষ্কার বাংলায়। মুখে ওর মুচকি হাসি। রানা ফিরে চাইতেই ভুরু নাচাল—কেমন জব্দ!

'এসব অত্যন্ত ছেলেমানুষী কৌশল, কর্নেল। আমি বাংলা জানি,' ভাঙা ভাঙা বাংলায় বলল রানা। প্রায় দু'বছর ছিলাম আমি ঈস্ট পাকিস্তানে। একটা ক্যাটগাট ইন্ডাস্ট্রী দাঁড় করাবার চেষ্টায় ছিলাম। বাংলা জানাটা আমার জন্যে অপরাধ নয়।'

রানার ভাঙা ভাঙা বাংলা শুনে এবার হো-হো করে উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠল এহসান।

'স্পাই জগতে আপনি একজন উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক, মিস্টার শরাফ আলী। অত্যন্ত



মূল্যবান রত্ন। আপনাকে সবকিছু শিখিয়ে পাঠানো হয়েছে এখানে। কি উদ্দেশ্যে তা একমাত্র আল্লাই জানেন, কিন্তু আপনাকে সিন্ধী মানসিকতা শেখাতে পারেনি। পাঞ্জাবী অফিসারের হাতে ধরা পড়ে আর্মি ইন্টেলিজেন্সের হেড কোয়ার্টারে চলেছেন, তবু আপনার মধ্যে কোন বিকার নেই, এটা কতখানি অস্বাভাবিক তা আপনার জানা নেই। বহু লোককে ধরে নিয়ে গিয়েছি আমি এই গাড়িতে। তাদের ভয়, কান্না আর কাকুতি মিনতি দেখে আমারই কেঁদে ফেলতে ইচ্ছে হয়েছে অনেক সময়। আপনি যদি...'

হঠাৎ কথা বন্ধ করে কার্টসি লাইটটা নিভিয়ে দিল এহসান। জানালার কাঁচ তুলে দিল উপরে। বেশ কিছু দূরে একটা এঞ্জিনের গর্জন কানে এল রানার। হাতের সিগারেটটা নিচু করে ধরে রাখল কর্নেল। একটা আর্মি পিকাপ পিচের উপর চড়্ চড়্ শব্দ তুলে চলে গেল বড় রাস্তা দিয়ে দক্ষিণ দিকে। মিনিট দুয়েক চুপচাপ সিগারেট টানল কর্নেল, তারপর চালু করল এঞ্জিন। গাড়ি ঘুরাবার জায়গা নেই, তাই পিছিয়ে এসে উঠে পড়ল বড় রাস্তায় আবার। উইণ্ডস্ক্রীন ওয়াইপারটা চালু করল, তারপর ছুটল লাহোরের পথে।

টিপ টিপ বৃষ্টি পড়ছে এখনও কিন্তু অনেকটা হালকা হয়ে গেছে মেঘ। মাঝে মাঝে চাঁদের আভাস পাওয়া যাচ্ছে, আবার অপেক্ষাকৃত ঘন মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়ছে সেটা। প্রচণ্ড শব্দ তুলে একটা বোয়িং চলে গেল করাচির পথে।

মাইল তিনেক থাকতেই আবার মেইন রোড থেকে সরে গেল কর্নেল। অনেকগুলো সরু আঁকাবাঁকা গলি ঘুরে এগিয়ে চলল গাড়ি। রাস্তাটা ভাল নয়, খুব সতর্ক হয়ে চালাতে হচ্ছে গাড়ি, কিন্তু তারই মধ্যে প্রতি তিনচার সেকেণ্ড অন্তর অন্তর একবার করে দৃষ্টি ফেলছে সে রানার উপর। রানা হিসেব করে দেখল, আর বড় জোর দশ মিনিট আছে হাতে। শহরের মধ্যে চলে এসেছে ওরা।

জনশূন্য বৃষ্টি ভেজা রাস্তা। লাহোর। দুপাশে বাড়িঘর, দোকানপাট, হোটেল-রেস্তোরাঁ। চারদিকে মৃত্যু-শীতল স্তব্ধতা। জীবনে কতবার এসেছে রানা লাহোরে। তখন এটা ছিল নিজের দেশ। সম্রাট আওরঙ্গজেবের শাহী মসজিদ, সম্রাট শাজাহানের শালিমার গার্ডেন, সম্রাট আকবরের কেল্লা, শিশ মহল ঘুরে দেখেছে, পোলো গ্রাউণ্ডে পোলো খেলেছে, ধু-ধু দুপুরে অবসর বিনোদন করেছে জিন্না গার্ডেনে। আর আজ? এটা শত্রুদেশ। গুপ্তচরবৃত্তির দায়ে ধরে আনা হয়েছে ওকে সেই চেনা লাহোরে। কেমন যেন অদ্ভুত এক অনুভূতি হলো রানার মধ্যে।

মল রোডে পড়তেই ধক করে উঠল রানার বুকের ভিতরটা। সামনের ওই মোড়টা ঘুরলেই আর্মি ইন্টেলিজেন্সের গোপন হেড কোয়ার্টার। রানা বুঝল, ভয় পেয়েছে সে। চরম সত্যের সম্মুখীন হয়েছে সে। রানা জানে, এ নির্যাতনের তুলনা নেই। গতি কমে এল গাড়ির। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে রানার মুখের দিকে চাইল কর্নেল।

'কোথায় এসেছেন, চিনতে পারছেন আশা করি?' থেমে দাঁড়াল গাড়িটা।
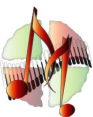
'আপনাদের হেড কোয়ার্টার।'

'ঠিক বলেছেন। এখানটায় এসেই আপনার উচিত ছিল জ্ঞান হারিয়ে ঢলে পড়া, বিকারগ্রস্তের মত প্রলাপ বকা, অথবা ভয়ে ককিয়ে কেঁদে ওঠা। সবাই তাই করে। কিন্তু আপনি করছেন না।' তীক্ষ্ণ চকচকে চোখে রানার চোখের দিকে চাইল কর্নেল। তারপর বলল, 'আপনাকে আপাতত একটা ছোট্ট সাউণ্ড প্রুফ অ্যাপার্টমেন্টে নিয়ে যাচ্ছি। আপনার জন্যে বিশেষ ব্যবস্থা হবে সেখানে।'

আরও কয়েক সেকেণ্ড এক অদ্ভুত দৃষ্টিতে রানার চোখের দিকে চেয়ে রইল কর্নেল। রানার মধ্যে কোন বিকার নেই দেখে ওর চোখের উপর একটা রুমাল বেঁধে নিয়ে গাড়ি ছেড়ে দিল। দশ মিনিট ধরে এঁকে বেঁকে ডাইনে বাঁয়ে চলল গাড়িটা। দিক হারিয়ে ফেলল রানা, চেষ্টা করেও বুঝতে পারল না কোন্ দিকে যাচ্ছে। কয়েকটা বড় বড় ঝাঁকি খেল, একটা সরু গলি দিয়ে কিছুদূর গিয়েই থেমে দাঁড়াল গাড়ি জোরে ব্রেক কষে। এঞ্জিনের শব্দে শুনে বুঝতে পারল কোনও বন্ধ জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে গাড়িটা। এঞ্জিন থেমে যেতেই খটাং করে পিছনে একটা লোহার গেট বন্ধ হয়ে যাবার শব্দ শোনা গেল।

টের পাওয়া গেল, ড্রাইভিং সীট থেকে নেমে গেল কর্নেল এহসান। কয়েক সেকেণ্ড পর রানার পাশের দরজাটা খুলে গেল। শিকলগুলো খুলে দিল কেউ। তারপর আশ্চর্য শক্তিশালী দুটো হাত ধরল রানার দুই বাহু। বগলের কাছে ধরে প্রায় শূন্যে তুলে নামানো হলো রানাকে গাড়ি থেকে। কর্নেল এহসানের গায়ে এত শক্তি! অবাক হয়ে গেল রানা। ওকে দাঁড় করিয়ে দিয়ে চোখের বাঁধন খুলে দেয়া হলো।

উজ্জ্বল আলোয় বার কয়েক চোখ মিটমিট করল রানা। আলোটা সহ্য হয়ে এলে দেখতে পেল একটা বড়সড় গ্যারেজের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে সে। চারদিক বন্ধ। বাম দিকে দেয়ালের গায়ে একটা ছোট দরজা, সেখান দিয়েই বাড়ির ভিতরে ঢুকবার ব্যবস্থা। রানার সামনে হাত তিনেক দূরে দাঁড়িয়ে আছে একজন। এই লোকটাই শিকল খুলে নামিয়েছে ওকে গাড়ি থেকে। চমকে উঠে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে দেখল রানা লোকটাকে। লোক না বলে দৈত্য বলাই ভাল। এই লোক থাকতে পাকিস্তান আর্মি ইন্টেলিজেন্সের আর নির্যাতনের অন্য কোন যন্ত্র নিশ্চয়ই প্রয়োজন হওয়া উচিত না। শুধু হাতে লোকটা যে কোন মানুষকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলতে পারে। রানার সমানই হবে লম্বায়, কিন্তু প্রকাণ্ড কাঁধ, মস্ত উঁচু বুক। বাইসেপ দুটো রানার উরুর চেয়েও মোটা। কেবল তাই নয়, একটু নড়াচড়া করলেই আঁকাবাঁকা ঢেউ খেলে যাচ্ছে লৌহ-কঠিন পেশীতে। গোটা ছয়েক রানাকে একসাথে শক্ত করে বাঁধলে লম্বা ও চওড়ায় এই লোকটার সমান হবে। বীভৎস মুখের চেহারা। নাকটা ভাঙা, ডান গালে গভীর একটা ক্ষত চিহ্ন, চুলগুলো ছোট করে ছাঁটা। ভয়ঙ্কর দর্শন এক গরিলা বিশেষ। কোন্ দেশী গরিলা বোঝা যাচ্ছে না চেহারা দেখে। কিন্তু রানা লক্ষ করল এই বীভৎস কুৎসিত মুখের সাথে সম্পূর্ণ বেমানান এক জোড়া শান্ত সজল



চোখ চেয়ে আছে ওর দিকে।

গাড়ির দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দে ঘাড় ফিরাল রানা। হাসিমুখে নেমে এল কর্নেল এহসান। এঞ্জিনের ওপাশ দিয়ে ঘুরে এসে দাঁড়াল রানার সামনে।

'একটু স্টান্ট দিলাম,' বলল কর্নেল। 'ভাব দেখিয়েছিলাম যেন আমিই নামাচ্ছি আপনাকে শিকল খুলে। আপনি নিশ্চয়ই বিস্মিত হয়েছিলেন আমার গায়ে অসুরের শক্তি আছে মনে করে?'

রানা জবাব দিল না। প্রকাণ্ড লোকটার দিকে এগিয়ে গেল কর্নেল। দৈত্যটার পাশে ওকে সরু একটা ঝাঁটার কাঠির মত লাগছে। রানার দিকে ইশারা করল কর্নেল।

'আজকের আসরের বিশিষ্ট শিল্পী। চমৎকার কাওয়ালী গাইবে আজ রাতে। চীফ কি ঘুমিয়ে পড়েছে, কায়েস?' উর্দুতে জিজ্ঞেস করল কর্নেল।

মাথা নাড়ল দৈত্যটা। আঙুল দিয়ে উপর দিকে দেখাল।

'উপরে।' যেন প্রকাণ্ড একটা জালার মধ্যে থেকে শব্দটা বেরোল। গমগম করে উঠল গ্যারেজটা।

'চমৎকার। তিন মিনিটে কয়েকটা কথা সেরে আসছি আমি। তুমি এই ভদ্রলোককে একটু পাহারা দাও। খুব সতর্ক থাকবে, অত্যন্ত ধূর্ত আর ভয়ঙ্কর এই লোক।'

'ঠিক আছে। আমি লক্ষ রাখব,' বলল কায়েস।

পাঞ্জাবী, পাঠান, সিন্ধী, না বালুচ বোঝা গেল না এই কথা ক'টা শুনে। শরীরটা প্রকাণ্ড হলে ঘিলু কিছু কম থাকে, এ-ও কি তাই?—ভাবল রানা। যাই হোক শেষ চেষ্টা করে দেখতে হবে ওকে।

রানার সুটকেসটা হাতে নিয়ে চলে গেল কর্নেল বাড়ির ভিতর। দেয়ালের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়াল কায়েস। ভীম দুই বাহু বুকের উপর ভাঁজ করা। আধ মিনিট চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে হঠাৎ সোজা হয়ে গেল কায়েস, এক পা এগিয়ে এল রানার দিকে। উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলল, 'শরীর খারাপ করছে আপনার?'

'না, না। ঠিক আছি আমি।' রানার গলাটা ফ্যাসফ্যাসে শোনাল। দ্রুত শ্বাস নিচ্ছে সে। অল্প অল্প দুলছে ওর শরীরটা সামনে পিছনে। হ্যাণ্ডকাফ পরানো হাত দুটো তুলে ঘাড়ের পিছনটা চেপে ধরল। গাল দুটো কুঁচকে গেল একটু। 'মাথার পিছনটা...আমার মাথার পিছনটা কেমন যেন...'

আরেক পা এগিয়ে এল কায়েস। তারপর দ্রুতপায়ে ছুটে এল সামনে। চোখ উল্টে পড়ে যাচ্ছে রানা। এভাবে পড়ে গেলে মাথাটা ফেটে যেতে পারে মেঝেতে চোট খেয়ে, মারাও যেতে পারে—তাই লাফিয়ে ছুটে এল কায়েস দুই হাত বাড়িয়ে।

দেহের সর্বশক্তি দিয়ে মারল রানা। দুই হাত জড়ো করে মারল কারাতের কোপ। ঘাড়ের পাশে। কানের ঠিক এক ইঞ্চি নিচে।
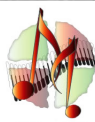
# ছয়

জীবনে এত প্রচণ্ড আঘাত করেনি রানা আর কাউকে। মনে হলো হাত দুটো যেন পড়ল কোন কাঠের গুঁড়ির উপর। ব্যথায় নিজেই ককিয়ে উঠল সে।

ভয়ঙ্কর এই কারাতের মারণাঘাত। যে কোন স্বাস্থ্যবান লোককে খুন করার, নিদেন পক্ষে মারাত্মক ভাবে জখম করার জন্যে এই আঘাতই যথেষ্ট। মারা না গেলেও, কয়েক ঘণ্টার জন্যে যে জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে পড়ে থাকবে তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু দৈত্যটা এত বড় আঘাতে শুধু চমকে উঠল একটু। মাথাটা ঝাড়া দিয়ে নিল একবার। গতি কমাল না একটুও। রানা যাতে পা চালাতে না পারে, সেজন্যে একটু সরে গেল বাম পাশে।

রানার দুই বাহু ধরে সমস্ত দেহের ওজন দিয়ে ওকে চেপে ধরল কায়েস গাড়ির সাথে। অসহায় রানা অবাক হয়ে চেয়ে রইল ওর মুখের দিকে। অবিশ্বাস্য। এই সাংঘাতিক মারকেও যে কোন মানুষ অবজ্ঞা করতে পারে, সে ধারণা ছিল না রানার। তাজ্জব হয়ে সে কেবল চোখে চোখে চেয়ে রইল। গাড়ির গায়ে ঠেসে ধরায় একটুও নড়াচড়া করার উপায় নেই ওর। এবার এক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটতে শুরু করল। কায়েসের হাত দুটো সাঁড়াশীর মত চেপে বসতে শুরু করল রানার দুই বাহুতে। শান্ত সরল দু'চোখ মেলে চেয়ে আছে সে রানার চোখের দিকে, আর ক্রমেই মাংসের ভিতর বসে যাচ্ছে ওর হাত। রাগ, বিদ্বেষ বা প্রতিহিংসার লেশমাত্র নেই কায়েসের চোখে।

সহ্য করার চেষ্টা করল রানা। দাঁতে দাঁত চেপে চোয়াল ব্যথা হয়ে গেল ওর। চিকন ঘাম দেখা দিল কপালে। মনে হলো, হাড় পর্যন্ত পৌঁছে গেছে কায়েসের আঙুল—এবার হাড়দুটোও গুঁড়ো হয়ে যাবে। ঝাপসা হয়ে গেল চোখের সামনে সবকিছু, দুলতে থাকল পৃথিবীটা, টক লালা এসে গেছে মুখে, মনে হচ্ছে এক্ষুণি বমি হয়ে যাবে। ঠিক এমনি সময়ে ছেড়ে দিল ওকে কায়েস। কয়েক পা পিছিয়ে গিয়ে আবার দাঁড়াল দেয়ালে হেলান দিয়ে। আস্তে আস্তে ডলছে সে এখন নিজের ঘাড়টা।

'দেখুন তো, এই অনর্থক বোকামির কোন মানে হয়? শুধু শুধু দু'জনেই ব্যথা পেলাম,' শান্ত গলায় বলল কায়েস ভাঙা-ভাঙা উর্দুতে।

ধীরে ধীরে তীব্র ব্যথাটা কমে এল। বমি-বমি ভাবটা চলে গেল। আবার পরিষ্কার হয়ে গেল চোখের ঝাঁপসা দৃষ্টি। কায়েসের চোখ সতর্ক রয়েছে রানার পরবর্তী কৌশল প্রতিরোধ করবার জন্যে। পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইল রানা।

ঠিক পাঁচ মিনিট পর খুলে গেল দরজাটা। আঠারো-উনিশ বছর বয়সের এক



ছোকরা এসে দাঁড়িয়েছে দরজায়। পাতলা ছিপছিপে। আরও পাতলা লাগছে অতিরিক্ত টাইট প্যান্ট পরায়। জাতে সিন্ধি। চোখে গো গো গ্লাস। পায়ে উদ্ভট এক বিধ্বস্ত চেহারার জুতো। চুল-দাড়ি-গোঁফ ছেড়ে দিয়েছে আল্লার ওয়াস্তে, যেখানে গিয়ে ঠেকে ঠেকবে। দুই চোখ দেখলে মনে হয় সর্বজ্ঞ ঋষি। বয়স কম, কিন্তু চালচলন বড় মানুষের মত। আপাদ-মস্তক রানার উপর একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে বুড়ো আঙুল দিয়ে পিছন দিকে ইঙ্গিত করল সে।

'ওকে অফিস কামরায় নিয়ে যেতে বলেছে চীফ।'

রানাকে নিয়ে এগোল কায়েস। দুটো ঘর পেরিয়ে একটা বারান্দায় এল ওরা। কিছুদূর সোজা গিয়ে বাঁয়ে মোড় নিল। তারপর ঢুকে পড়ল ডানদিকের প্রথম দরজা দিয়ে।

বেশ বড় সড় একটা অফিস ঘরে উজ্জ্বল বাতি জ্বলছে। কার্পেটের উপর পড়ে আছে রানার জামা কাপড়ের পাশে কুচি-কুচি করে কাটা সুটকেসটা। হ্যান্ডেলটা পর্যন্ত ভেঙে দেখা হয়েছে। তন্ন তন্ন করে তল্লাশী চালানো হয়েছে সুদক্ষ হাতে। একটা সেক্রেটারিয়েট টেবিল, তার এপাশে তিনটে চেয়ারের একটাতে বসে আছে কর্নেল এহসান, ওপাশে একটা আগাগোড়া কালো চামড়ায় মোড়া রিভলভিং চেয়ার শূন্য। কর্নেলের পায়ের কাছে বসে জিভ বের করে হাঁপাচ্ছে একটা কুচকুচে কালো বাচ্চা ব্লাড হাউণ্ড। নানান টুকিটাকি জিনিস দিয়ে ঘরটা সুন্দর ভাবে সাজানো, কিন্তু আসবাব বিশেষ নেই। টেবিলের পাশে একটা স্টীল ক্যাবিনেট, পিছনে একটা স্টীলের আলমারি। ঘরের প্রত্যেকটি জানালা বন্ধ, তার উপর পুরু কালো পর্দায় ঢাকা। প্রতিটা জানালার পাশে একটা করে ফ্লাওয়ার ভাস, তাতে তাজা ফুলের তোড়া।

কর্নেলের এক হাতে রানার কাগজপত্র ধরা। একটা টেবল্ ল্যাম্পের নিচে ধরে ম্যাগনিফায়িং গ্লাস দিয়ে পরীক্ষা করছিল সে ওগুলো, রানাকে দেখে নামিয়ে রাখল টেবিলের উপর। পায়ের উপর পা তুলে সিগারেট ধরাল একটা, ভুরু কুঁচকে আধ মিনিট চিন্তিত মুখে চেয়ে রইল রানার দিকে।

'দুই সেট পরিচয়-পত্রের দুটোই জাল। কাজেই আপনাকে কোনও নামে সম্বোধন করতে পারছি না। কিন্তু কথা বলতে হলে একটা নামের দরকার। আসল নামটা বলবেন দয়া করে?' অত্যন্ত ভদ্রভাবে প্রশ্ন করল কর্নেল। হঠাৎ চোখ পড়ল কায়েসের দিকে। 'তোমার কি হয়েছে কায়েস, ঘাড় ঘষছ কেন?'

'ও মেরেছে,' লজ্জিত কণ্ঠে বলল দৈত্যটা। 'কিভাবে কোথায় মারতে হয় জানে লোকটা। আর খুব জোরে মারে।'

'ভয়ানক লোক!' বলল কর্নেল। 'আমি তোমাকে সাবধান করেছিলাম, কায়েস।'

'হ্যাঁ। কিন্তু ভারি ধূর্ত লোক। অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাবার ভান করেছিল। আমি

ছুটে গিয়েছিলাম ধরতে।' হাসল কায়েস। সুন্দর একপাটি ঝকঝকে দাঁত।

'তোমাকে মারা-ধরানেই বোঝা যাচ্ছে কি পরিমাণ মরিয়া হয়ে উঠেছে লোকটা। সাহস আছে বলতে হবে। যাক, কি নাম বললেন না?' রানার দিকে ফিরল কর্নেল।

'আপনাকে আগেই বলেছি কর্নেল, আমার নাম শরাফ আলী। আমি এক কুড়ি নাম বানিয়ে বলতে পারি, কিন্তু প্রমাণ করতে পারব না। আমার এই পরিচয় আমি প্রমাণ করতে পারি। এই আমার নাম। আমি শরাফ আলী।'

'আপনি সাহসী লোক। কিন্তু এখানে আপনার সাহসকে বাহবা দেবার লোক পাবেন না, ধূলির সাথে মিশে যাবে আপনার সাহস ও শক্তি। কেবল সত্য টিকবে, আর কিছু নয়। আমরা ভয়ঙ্কর লোক, ঠিকই, কিন্তু অযথা সময় বা শক্তি অপব্যয় করতে চাই না। বসুন এই চেয়ারে, জেনে, রাখুন পনেরো মিনিটের মধ্যে আপনার আসল পরিচয় জেনে যাব আমরা। কাজেই শুধু শুধু বাঁকা পথে না গিয়ে সোজাসুজি বলে ফেলুন নাম-ধাম-উদ্দেশ্য।'

বসল রানা। ধীরে ধীরে কেন জানি ভয়টা কেটে যাচ্ছে রানার। আর্মি ইন্টেলিজেন্স সম্বন্ধে ও প্রথা জানে, কোথায় যেন তার সঙ্গে ঠিক মিল পড়ছে না। কয়েকটা সূক্ষ্ম ব্যাপার লক্ষ করেছে রানার অবচেতন মন, কিন্তু ঠিক কি ব্যাপার পরিষ্কার হচ্ছে না ওর কাছে। কি সেটা? এদের ব্যবহার? এই সৌজন্য আসন্ন আঘাতের ব্যাপারে ওকে সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত করে নেবার জন্যও তো হতে পারে। তাহলে কি সেটা? কায়েসের উর্দু বলার ভঙ্গি? কিংবা কর্নেল এহসানের বাংলা বলার...

'আমরা অপেক্ষা করছি।' একটু যেন অসহিষ্ণু কর্নেলের কণ্ঠস্বর।

'এককথা কতবার বলব আপনাদের?' রেগে ওঠার ভান করল রানা। আরেকটু সময় চায় সে মাথাটা পরিষ্কার করে নিতে।

'বেশ। গায়ের সমস্ত জামা-কাপড় খুলে ফেলুন।'

'কেন?' বিস্মিত রানা দেখল কর্নেলের হাতে ওর লুগারটা।

'লক্ষ্মী ছেলের মত আদেশ পালন করুন। নইলে আপনার জামা-কাপড় ছিঁড়ে নামিয়ে দেবে কায়েস। পিস্তলটাও প্রস্তুত রইল।'

হ্যাণ্ডকাফ খুলে দেয়া হলো। উঠে দাঁড়াল রানা। কোটটা খুলতে যাবে এমনি সময় দেখল সন্ত্রস্ত ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়াল কর্নেল এহসান, চট করে লুকিয়ে ফেলল হাতের সিগারেটটা। কর্নেলের দৃষ্টি রানার পিছনে। পিছনের দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকছে কেউ। সটান সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে দৈত্যটাও। সবার দেখাদেখি উঠে দাঁড়িয়েছে বাচ্চা ব্লাড হাউণ্ডটাও, চোলজ নাড়ছে সে।

ধীরে ধীরে ঘাড় ফিরাল রানা।

ঋজু ভঙ্গিতে দরজার চৌকাঠে দাঁড়িয়ে আছে শীর্ণকায় এক বৃদ্ধ। পরনে বাদামী



রঙের সার্জের স্যুট, সাদা ইজিপশিয়ান কটনের শার্ট, ব্রিটিশ কায়দায় বাঁধা লালের উপর সাদা কাজ করা টাই, পায়ে অক্সফোর্ড শ্যু। ছিমছাম হাতে প্রকাণ্ড চুরুট। গালে কপালে দুই-একটা বয়সের ভাঁজ, কিন্তু ছুরির ফলার মত চকচকে তীক্ষ্ণ দুই চোখ সদা জাগ্রত। ক্ষুরধার বুদ্ধির জ্যোতি ঠিকরে বেরুচ্ছে দুচোখ থেকে। চোখ দুটোর উপর একজোড়া কাঁচা-পাকা ভুরু।

ঘরে ঢুকলেন মেজর জেনারেল রাহাত খান।

## সাত

বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত থমকে দাঁড়িয়ে রইল রানা।
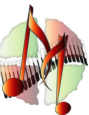
রানার জুতো থেকে টুপি পর্যন্ত একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বুলালেন মেজর জেনারেল। তারপর হালকা পায়ে টেবিলটা ঘুরে গিয়ে কালো চামড়া মোড়া চেয়ারে বসে আবছা ইঙ্গিত করলেন কর্নেল এহসানকে বসবার জন্যে। এসব ইঙ্গিত রানার মুখস্থ। বেশি কথা পছন্দ করেন না মেজর জেনারেল, যতটা পারেন আকার ইঙ্গিতে সারেন কাজ।

'কতদূর?' কর্নেলের দিকে চেয়ে কাঁচাপাকা ভুরু নাচালেন বৃদ্ধ।

'দুটোই জাল, স্যার। খানিক মারধোর না করলে কিছুই বেরোবে না, মনে হচ্ছে।'

'উঁহু, লাভ হবে না তাতে। লোকটা ভয়ঙ্কর।' মৃদু টান দিলেন বৃদ্ধ চুরুটে। 'টরচার করে কিছুই বের করা যাবে না ওর কাছ থেকে। তুমি বুঝতে পারছ কিনা জানি না, কিন্তু আমি এক নজর দেখেই টের পাচ্ছি, যেমন ভয়ঙ্কর তেমনি দুর্ধর্ষ এই যুবক। দেখছ না কেমন ডাকাতের মত চেহারা? ওর চোখের দিকে চেয়ে দেখো—ডেডিকেশন দেখা যাচ্ছে। তোমার সন্দেহ যদি সত্য হয়, একে শেষ করে দেয়া ছাড়া আর কোন উপায় নেই।'

'তাই বলে চেষ্টাও করব না?'

'না। এমনি ভদ্র ভাবে জিজ্ঞেস করো, যদি উত্তর দেয়, এবং যদি আমরা বুঝি যে একে ছেড়ে দিলে আমাদের কোন ক্ষতি হবে না, তাহলে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করা যাবে। জিজ্ঞেস করে দেখো কোয়াপরেট করবে কিনা। না করলে নিয়ে যাও এখান থেকে, ঝামেলা শেষ করে ফেলো। আর হ্যাঁ, মেরে ফেলার আগে আমাদের সত্যিকার পরিচয় জানিয়ো ওকে, হয়তো তখন মুখ খুলতে পারে।' নিভে যাওয়া চুরুটটা ধরিয়ে নিলেন বৃদ্ধ। জ্বলন্ত কাঠিটা এপাশ ওপাশ নেড়ে নিভিয়ে ফেলে দিলেন অ্যাশট্রেতে। তার মানে কথাবার্তা শেষ, এবার তোমরা সবাই আসতে পারো, আমার কাজ আছে।

'নিজের কানে সবই শুনলেন,' বলল কর্নেল এহসান, 'আশাকরি বুঝতে অসুবিধে হয়নি কিছুই। পরিচয় দিতে আপত্তি আছে?'

মাথা নাড়ল রানা মৃদু হেসে। নেই। সব পরিষ্কার হয়ে গেছে রানার কাছে।

'বেশ! বসুন।' বসল রানা। একটা সাদা প্যাড টেনে নিল কর্নেল। 'একে একে বলে যান নাম, ধাম, কোথা থেকে এসেছেন, কি উদ্দেশ্য, সব। প্রথম প্রশ্ন—নাম?'

এতক্ষণ বিশুদ্ধ পাঞ্জাবীতে কথা হচ্ছিল। এবার পরিষ্কার বাংলায় বলল রানা, 'আমার নাম মাসুদ রানা।'

ভয়ানক ভাবে চমকে গিয়ে ঝট করে চাইলেন বৃদ্ধ রানার মুখের দিকে। মুখটা চেনা যাচ্ছে না, কিন্তু গলার স্বর তো ভুল হবার নয়!

পরিষ্কার বাংলা শুনে একটু বিস্মিত হলো কর্নেল, কিন্তু লেখায় ব্যস্ত ছিল বলে বৃদ্ধের ভাব পরিবর্তন লক্ষ করল না। বাংলায় প্রশ্ন করল, 'কোথা থেকে এসেছেন? কি উদ্দেশ্যে?

'বাংলাদেশ থেকে এসেছি। উদ্দেশ্য—' বৃদ্ধের দিকে ইঙ্গিত করল রানা, 'মেজর জেনারেল রাহাত খানের সাথে দেখা করা।'

'আপনি ওঁকে চেনেন!' বিস্মিত দৃষ্টিতে চাইল কর্নেল প্রথমে রানার, পরে রাহাত খানের মুখের দিকে। 'ইনিই যে মেজর জেনারেল—'

পরিষ্কার চিনতে পেরেছেন এবার বৃদ্ধ। চুরুট ধরা হাতটা ডানপাশে নেড়ে চুপ করিয়ে দিলেন এহসানকে। কাঁচা পাকা ভুরু জোড়া কুঁচকে কটমট করে চাইলেন রানার দিকে। পাঁচ সেকেন্ড অগ্নিদৃষ্টি বর্ষণ করে—ওরে সর্বনাশ!— নরম হয়ে এল চোখের দৃষ্টিটা, তারপর—আরে, আরে, এসব কী আবার!—ডান গালটা কাঁপল দু'তিনবার, তারপর—জীবনে যা কল্পনাও করতে পারেনি রানা, তাই দেখল—দুই ফোঁটা পানি চিকচিক করছে কট্টর বুড়োর চোখে। ঝট করে উঠে দাঁড়ালেন বৃদ্ধ। দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

সবই দেখল কর্নেল এহসান, গুলিয়ে গেল ওর কাছে সবকিছু। ব্যাপারটা কি! আত্মীয়-টাত্মীয় নাকি! প্রশ্ন করতে দ্বিধা করছিল, কিন্তু রানাকে সহজ ভঙ্গিতে টেবিলের উপর থেকে ওর সিগারেটের প্যাকেটটা তুলে নিয়ে সিগারেট ধরাতে দেখে জিজ্ঞেস করে বসল, 'কি ব্যাপার বলুন দেখি? আপনাকে শত্রু ভাবব না মিত্র ভাবব বুঝে উঠতে পারছি না। মেজর জেনারেল আপনাকে চিনতে পারলেন না, অথচ পরিচয় শুনে—'

'আমি ছদ্মবেশে আছি, তাই চেহারা দেখে চিনতে পারেননি উনি। আমি ওঁরই ডিপার্টমেন্টের লোক। উনি বেঁচে আছেন এবং "আটক ফোর্টে" বন্দী হয়ে আছেন খবর পেয়ে এসেছি আমি।'

'বন্দী ছিলেন। সতেরো দিন আগে পালিয়ে এসেছেন। ওঁর ওপর ভয়ানক টর্চার হয়েছে। সারা শরীরে অসংখ্য দাগ আছে নির্যাতনের—কিন্তু সে সব সম্পর্কে



কোন আলাপ করতে উনি নারাজ। ভয়ানক কড়া লোক, কাজের কথা ছাড়া কোন কথা বলতে চান না। কিন্তু আপনারা খবর পেলেন কি করে?'

'আমরা মনে করেছিলাম পঁচিশে মার্চের রাতেই মারা গেছেন উনি। কিন্তু লাশটা পাওয়া যায়নি বলে ক্ষীণ একটা আশা ছিল। হঠাৎ তিনদিন আগে এখান থেকে পালিয়ে যাওয়া এক ক্যাপ্টেনের কাছে খবর পেলাম। খবরটা পাঠিয়েছেন মেজর নুরুদ্দিন। খবর পেয়েই চলে এসেছি আমি।' সিগারেটে টান দিল রানা লম্বা করে।

'কিন্তু আপনার নাম আমি জানি না কেন বলুন তো?' কর্নেলের প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত পেয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল কায়েস।

'হয়তো কোড নম্বরটা জানেন,' বলল রানা।

'তা হতে পারে। আমি আপনাদের ডিপার্টমেন্টের লোক নই, কিন্তু যদ্দূর জানি আমাদের ডিপার্টমেন্ট আপনাদেরটার সাথে খুব ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত, অনেক সময় পরস্পরের সাহায্য ও সহযোগিতা নিয়ে থাকি আমরা। সিস্টার ডিপার্টমেন্টের প্রত্যেকের কোড নম্বর মুখস্থ করতে হয়েছে আমাদের, পাছে দরকার পড়ে যায় হঠাৎ। আপনার কোড নম্বর কত?'

'এখন আমার কোন নম্বর নেই। স্বাধীনতার আগে ছিল এম. আর. নাইন।'

অবাক হয়ে চেয়ে রইল কর্নেল এহসান রানার মুখের দিকে। স্পষ্ট চোখের সামনে ভেসে উঠল একটা সংক্ষিপ্ত পরিচিতি—এম. আর. নাইন, পাকিস্তানের সর্বশ্রেষ্ঠ এজেন্ট, উচ্চতা: পাঁচফুট এগারো ইঞ্চি, গায়ের রং: শ্যামলা, মাতৃভাষা: বাংলা, চেহারা: আকর্ষণীয়, গড়ন: একহারা, সব ধরনের খেলা-ধুলা ও দৌড়-ঝাঁপে পারদর্শী; পিস্তল, থ্রোইং নাইফ, রাইফেলে চমৎকার হাতের টিপ, বক্সিং জুডো-কারাতে ট্রেনিংপ্রাপ্ত, সর্বক্ষণ সশস্ত্র ও সতর্ক, অস্ত্র: সাধারণত বাম বগলের নিচে গোপন হোলস্টারে নাইন এম. এম. ল্যুগার অথবা পয়েন্ট থ্রী-টু ওয়ালথার পি. পি. কে, রাখে, কোমরের কাছে বেল্টের সাথে বাঁধা একটা গোপন খাপে থাকে চার ইঞ্চি ব্লেডের একটা থ্রোয়িং নাইফ, জুতোর সোলে স্টীলের পাত বসানো, জুতোর হিলেও থাকে ছোট একটা ছুরি; বহু ভাষায় অনর্গল কথা বলতে পারে, দেশপ্রেমিক, কর্তব্যনিষ্ঠ, ঘুষ দিয়ে বশ করা যায় না, নির্যাতন সহ্য করার ক্ষমতা প্রচণ্ড, ভয়ঙ্কর একরোখা এবং জেদি।

এই লোকই তাহলে এম. আর. নাইন! এরই সাথে পরিচিত হবার স্বপ্ন দেখেছে সে বহুদিন।

'মেজর নুরুদ্দিনকে কিভাবে খুঁজে পেয়েছেন?' প্রশ্ন করল কর্নেল।

'সকাল বিকেল রোজ আধ ঘণ্টা করে সালিমার গার্ডেনের একটা বিশেষ বেঞ্চে গিয়ে বসার কথা আমার নীল স্যুট আর লাল টাই পরে। এছাড়া কিছু সাংকেতিক শব্দ বিনিময়ের ব্যবস্থাও আছে। ওই ভাবেই আমাকে চিনে নেয়ার ব্যবস্থা করেছেন
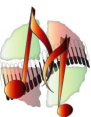
মেজর নূরুদ্দিন।'

'করেছিলেন,' বললেন মেজর জেনারেল পিছন থেকে। ফিরে এসেছেন তিনি। স্বাভাবিক ভাবে টেবিলটা ঘুরে গিয়ে নিজের আসনে বসলেন। 'নূরুদ্দিনের সাথে আর দেখা হবে না তোমার কোনদিন।'

'কেন, কি হয়েছে, স্যার?'

'মারা গেছে। ধরা পড়েছিল। আর্মি ইন্টেলিজেন্সের টর্চার চেম্বারে ওদের মুহূর্তের অসতর্কতার সুযোগে একটা পিস্তল ছিনিয়ে নিয়ে আত্মহত্যা করেছে সে।'

'কিন্তু স্যার, সে খবর আপনারা পেলেন কি করে?'

'কর্নেল এহসান—অর্থাৎ, তুমি যাকে কর্নেল এহসান বলে জানো—ছিল সেখানে। ওর পিস্তলটাই ছিনিয়ে নিয়ে আত্মহত্যা করে বেঁচেছে নূরুদ্দিন।'

এবার রানার অবাক হবার পালা। বিস্মিত দৃষ্টিতে দেখল সে কর্নেলের মুখ। এই লোক সেখানে থাকে কি করে? উত্তরটা দিলেন মেজর জেনারেলই।

'সিক্সটি নাইন থেকে আছে ও পাকিস্তান আর্মি ইন্টেলিজেন্সে ছদ্ম পরিচয়ে। পাঞ্জাবী হিসেবে। আমিই ব্যবস্থা করে দিয়েছিলাম গোপনে। ও হচ্ছে আর্মি ইন্টেলিজেন্সের একজন মেজর। যখন কোন বাঙালী বন্দী আশ্চর্যজনক ভাবে শেষ মুহূর্তে পালিয়ে যায়, কিংবা কিছু গোলমাল হয়ে যায়, সব চাইতে খেপে ওঠে ও-ই—নির্মম ভাবে খাটিয়ে মারে ওর লোকদের, জঘন্যতম গালাগালি বেরোয় ওরই মুখ থেকে। ওদের চীফ গুলজার খান ওকে বোধহয় প্রাণের চেয়েও বেশি ভালবাসে। প্রচণ্ড কর্মতৎপরতা আর ভয়ঙ্কর হিংস্রতা দিয়ে হৃদয় জয় করেছে সে চীফের। অথচ কয়েকশো বাঙালী আর্মি অফিসার ও জোয়ান, এবং হাজার হয়েক সিভিলিয়ান প্রাণ রক্ষা ও বিপদ থেকে উদ্ধারের জন্য চিরঋণী হয়ে আছে ওরই কাছে।'

এহসানকে দেখল রানা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। অদ্ভুত মানুষ। কী ভয়ঙ্কর এর জীবন। কতখানি ঝুঁকি নিয়ে বিপদের মুখে টিকে আছে লোকটা। ওর উপর লক্ষ রাখা হয়েছে কিনা, ওকে সন্দেহ করা হচ্ছে কিনা, ওর আসল পরিচয় প্রকাশ পেয়ে গেল কিনা, কেউ বিশ্বাসঘাতকতা করল কিনা—কিছু জানবার উপায় নেই। যে কোন মুহূর্তে হাত কড়া পড়তে পারে। প্রতি মুহূর্তে উদ্বেগ, আশঙ্কা, উৎকণ্ঠা। আশ্চর্য! এমন অবস্থার মধ্যে বেঁচে আছে কি করে মানুষটা!

'একজন সত্যিকার বুদ্ধিমান ও সাহসী লোকের সাথে পরিচিত হয়ে সুখী হলাম,' বলল রানা আন্তরিক কণ্ঠে। 'কিন্তু আজকের ব্যাপারটা কিভাবে গোপন থাকবে? আর্মি চেক-পোস্ট থেকে...'

'এটা খুব সহজ ব্যাপার।' নতুন একটা চুরুট ধরালেন মেজর জেনারেল। 'ও মাঝে মাঝেই এমন যায়। আজ এ-রাস্তায়, কাল ও-রাস্তায়। মাঝে মাঝেই এমন এক-আধজনকে ধরে নিয়ে আসে এখানে। তোমাদের দেখা হয়ে যাওয়াটা নিতান্তই কোইন্সিডেন্স। নূরুদ্দিনের সংবাদ পাঠানোর খবর আমাদের জানা ছিল না।'



'কিন্তু আজই শেষ, স্যার,' বলল এহসান। 'প্রতিবারই আমি পুলিস বা আর্মির খুদে অফিসারগুলোকে ধমক-ধামক দিয়ে বলে আসি যেন এব্যাপার একদম চেপে যায়। কিন্তু আজ ওরা আগেই টেলিফোন করে দিয়েছিল, আমি পিকাপ দেখলাম ছুটে যাচ্ছে কাহনার দিকে। ওরা গিয়ে বন্দীকে পাবে না, আর্মি ইন্টেলিজেন্সের সাথে যোগাযোগ করে জানতে পারবে বন্দী সেখানে পৌঁছেনি, এমন কি কর্নেল এহসান বলে তাদের কোন অফিসারও নেই—কাজেই সমস্ত পোস্টে জানিয়ে দেওয়া হবে, আর্মি ইন্টেলিজেন্স অফিসারের ছদ্মবেশে একজন লোক আসতে পারে, যেন তাকে সুদ্ধ বাধা হয়। অতএব আজই শেষ।'

'কিন্তু...কিন্তু ওরা তো পরিষ্কার দেখেছে আপনাকে। চার-পাঁচ জন দেখেছে। আপনার চেহারার বর্ণনা এতক্ষণে জেনে গেছে আর্মি ইন্টেলিজেন্স,' বলল রানা।

'ওসব কেয়ার করি না। আসলে যা ভয় পেয়েছিলাম সেটা ভেঙেই বলি।' মুচকে হাসল এহসান। 'আপনাকে নিয়ে গাড়িতে ওঠার পর থেকেই সর্বক্ষণ চেষ্টা করেছি আপনার সত্যিকার পরিচয় জানতে। কারণ, হঠাৎ একটা সন্দেহ মাথায় ঢুকেছিল। এমনও তো হতে পারে, আপনি আসলে পাকিস্তান আর্মি ইন্টেলিজেন্সেরই লোক। হয়তো আমাকে ট্র্যাপ করবার জন্যেই পাঠানো হয়েছে আপনাকে? কারণ আপনার মধ্যে ভয় দেখতে পাচ্ছিলাম না একবিন্দুও। পাকিস্তান আর্মি ইন্টেলিজেন্সের নিয়োজিত লোকের ভয় পাওয়ার কোন কারণ নেই। কিন্তু হেড কোয়ার্টারের সামনে গাড়ি থামিয়ে যখন বললাম, 'আপনাকে অন্যত্র নিয়ে যাচ্ছি, তখনও আপনি নির্বিকার। তখন মনে হলো আপনি আর্মি ইন্টেলিজেন্সের লোক নন—হলে, আমি চিনতে পেরেছি এবং হত্যা করতে নিয়ে চলেছি বুঝতে পেরে হাউ মাউ করে কেঁদে ফেলতেন। কিন্তু পরমুহূর্তে আবার ভাবলাম, এমন হতে পারে, একা আমাকে না ধরে একেবারে দলবল সহ ধরার হয়তো ব্যবস্থা করা হয়েছে। উহ্, মস্ত দুশ্চিন্তার মধ্যে ফেলেছিলেন, সাহেব।'

'দোষটা আপনার,' বলল রানা। 'দিব্যি আমার প্ল্যান অনুযায়ী আমি আসছিলাম, আপনি মাঝখান থেকে ঘাপলা বাধিয়ে দিয়ে নিজের সন্দেহে নিজেই কষ্ট পেয়েছেন।'

'হয়তো তাই। কিন্তু ধরা তো পড়ছিলেন। আমি উদ্ধার করে না আনলে...'

'উদ্ধার করার জন্যে অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনার উপকারকে ছোট করে দেখাতে চাই না। কিন্তু আপনি কি মনে করেন, গোটা চারেক মোটা বুদ্ধির পাঞ্জাবী সেনা আমাকে বন্দী করে রাখতে পারত? ভাল ভাবে সার্চ যারা করতে জানে না, তারা কি করে আটকে রাখবে একজন সুশিক্ষিত, অভিজ্ঞ স্পাইকে? টুপির নিচে থেকে ছুরিটা পেয়েই আপনিও সন্তুষ্ট হয়ে গেলেন, কিন্তু আপনি কি জানেন, আরও তিনটে মারাত্মক অস্ত্র আছে আমার কাছে এখনও? স্যার এসে না পড়লে আপনার এবং কায়েসের কণ্ঠনালী দুই ফাঁক করে দিয়ে এতক্ষণে আমি পৌঁছে যেতাম...'
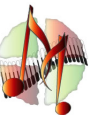
'হয়েছে, হয়েছে,' বাধা দিলেন মেজর জেনারেল। 'যা হবার ভালই হয়েছে। সবকিছু শর্টকাটে চুকে গেছে। এবার কাজের কথায় আসা দরকার। এসে পড়েছ, ভালই হয়েছে। আমাদের সামনে এখন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ রয়েছে একটা। কিন্তু তার আগে তোমার খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা হওয়া উচিত।' এহসানের দিকে ফিরলেন বৃদ্ধ। 'তুমি যাও, চট্ করে তোমার সাজঘর থেকে ঘুরে এসো। যাবার সময় কায়েস আলীকে কিছু খাবারের ব্যবস্থা করতে বলে দাও। আর আবদুকে বলো ছাতটা একপাক ঘুরে এসে গাড়ির নাম্বার প্লেট বদলে ফেলুক।'

বেরিয়ে গেল এহসান। ওর পিছু পিছু বেরিয়ে গেল বাচ্চা ব্লাড হাউণ্ডটা। চুপচাপ এক মিনিট একমনে চুরুট টানলেন মেজর জেনারেল। যেন ভুলেই গেছেন রানার উপস্থিতি। টেবিলের উপর থেকে ওর ছুরি আর পিস্তলটা তুলে নিয়ে যথাস্থানে রেখে দিল রানা। স্পেয়ার ম্যাগাজিন এবং দ্বিতীয় পরিচয়ের কাজগুলোও ভরে নিল পকেটে।

একটা ওয়ার্নিং বেল বেজে উঠল মৃদু শব্দে। চট করে একটা সুইচে হাত দিলেন রাহাত খান। দপ্ করে নিভে গেল ঘরের বাতি। বললেন, 'সামনের রাস্তায় কোন লোক বা গাড়ি দেখলে আলো নিভিয়ে দিই আমরা।' চেয়ার ছেড়ে জানালার পাশে চলে গেলেন। কালো পর্দাটা সামান্য ফাঁক করে চোখ রাখলেন রাস্তায়। এক মিনিট পর ফিরে এসে জ্বেলে দিলেন বাতিটা আবার।

চুরুট টানতে টানতে খানিকক্ষণ উসখুস করলেন বৃদ্ধ। একবার দু'বার কঠোর দৃষ্টিতে চাইলেন রানার দিকে। রানা বুঝল, ঢাকার খবর জানতে চায় বুড়ো, কিন্তু কিভাবে জিজ্ঞেস করবে বুঝতে পারছে না। এই অবস্থায় সাহায্য করতে গেলে রেগে যাবে বুড়ো, ও জানে, তাই চুপ করে থাকল। মিনিট দুয়েক পর মুখ তুললেন মেজর জেনারেল।

'কেমন আছ তোমরা? মানে, যারা বেঁচে আছ আর কি।'

'ভাল, স্যার।'

'রেহানাকে বাঁচাতে পেরেছিলে?'

'না, স্যার। আমি যখন পৌঁছলাম তখন সব শেষ।'

খানিক চুপ করে থেকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আর সবাই? সোহানা?'

'সোহানা আছে। ভালই আছে। ওর বাবাকে মেরে ফেলেছে আর্মি ইন্টেলিজেন্স টর্চার করে। মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য করছিলেন উনি টাকাপয়সা, ওষুধ আর আশ্রয় দিয়ে। সোহানা অবশ্য সামলে নিয়েছে। জয়েন করেছে কাজে।'

'আর সবাই?'

'সোহেল, জাহেদ, সলীল, ইকরাম, জাভেদ, মজিদ, শামসু—এরা সবাই ভাল আছে। বিশ্বাসঘাতক নাসের মারা গেছে—আমার হাতেই। যুদ্ধে মারা গেছে শাহীন, শবনম, ওয়াকিল, রাসেল, সারওয়ার, হাফিজ, টুম্পা, শঙ্কর, অসীম, দিলশাদ। তবে





বেশির ভাগই বেঁচে আছে।'

'খবর পেলাম, তুমি নাকি খুব ভাল চালাচ্ছ বি. সি. আই?'

'না, স্যার, আপনাকে ছাড়া ভাল চলবে কি করে? কোনমতে ঠেকা কাজ চালিয়ে নিয়েছি আমরা। তবে কাজ যা করার ওই সোহেলই করেছে। আমি একটু আধটু অ্যাসিস্ট করেছি। আপনার তৈরি করা নিয়মেই চলছে সব কিছু, সেইজন্যেই যা রক্ষা।'

কথাটা রানা আন্তরিকভাবেই বলল। কারণ, টের পেয়েছে সে, যে কাজটা মেজর জেনারেল রাহাত খানের কাছে ভাদ্রের মেঘের মত হালকা, ওর কাছে সেটা আষাঢ়ের মেঘের মতই ভারি। জগদ্দল পাথর চেপে গিয়েছিল ওর কাঁধে।

'তবু একটা ভেঙে যাওয়া সংস্থাকে আবার গড়ে নেওয়া সহজ কাজ নয়। তোমাদের যোগ্যতা দেখে খুশি হয়েছি আমি। কিন্তু...আমার চেয়ারটা খালি রেখেছ কেন তোমরা? জানতে যে বেঁচে আছি?'

'আপনার আশা ছাড়তে পারিনি, স্যার। ছাব্বিশে মার্চের ভোরে আপনার বাসায় গিয়েছিলাম আমি আর সোহেল। আপনাকে পাইনি।'

চোখ বন্ধ করে রইলেন বৃদ্ধ কয়েক সেকেণ্ড। তারপর বললেন, 'শমশেরকে এত করে বললাম পালিয়ে যেতে, কিছুতেই গেল না। বলল, ত্রিশ বছর ধরে আপনার সাথে আছি, স্যার, মরলে আপনার সাথেই মরব। ওকে মেরে ফেলল আমারই চোখের সামনে—আমাকে মারল না।' একটু চুপ করে থেকে গলাটা পরিষ্কার করে নিলেন বৃদ্ধ। 'হঠাৎ তোমাকে দেখে কেমন যেন আবেগপ্রবণ মত হয়ে পড়েছি রানা। অনেক কথা ভিড় করছে মনের মধ্যে। ভালও লাগছে। আমার হাতে গড়া ছেলেগুলো আমাকে কতখানি ভালবাসে বুঝতে পেরে খুব ভাল লাগছে। নিজেকে সার্থক মনে হচ্ছে। গর্ব হচ্ছে।'

চুপ করলেন বৃদ্ধ। একমনে চুরুট টানছেন ছাতের দিকে চেয়ে। একটা ট্রে হাতে ঘরে ঢুকল কায়েস।

'আপনি বাঙালী?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'হ।' শান্ত সরল দুই চোখ মেলে চাইল কায়েস আলী। বীভৎস মুখে ঝকঝকে সুন্দর একপাটি দাঁত বের করে হাসল। 'কিছু মনে কইরেন না, স্যার। না বুইজ্জা বাধা দিসি।'

'না, না। কি মনে করব আবার। টিপে যে মেরে ফেলেননি, এ-ই বেশি। ওরে সর্বনাশ! কাকে মারতে গিয়েছিলাম!' ভীম দুই বাহুর দিকে সবিস্ময়ে চেয়ে বলল রানা।

ধীর পায়ে বেরিয়ে গেল কায়েস টেবিলের উপর ট্রে-টা রেখে। মেজর জেনারেল বললেন, 'ও ছিল আর্মির হাবিলদার মেজর। চারজনকে খালি হাতে মেরে পালিয়ে এসেছে ব্যারাক থেকে। ওয়েট লিফটিং, ডিসকাস আর শট পুটে ফ্যান্টাস্টিক
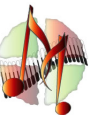
রেকর্ড ওর। শুধু বাঙালী বলে চান্স পেল না কোথাও। এবার ওয়েট লিফটিং-এ অলিম্পিক রেকর্ড হচ্ছে সাতাশ মন—সত্তর সালেই ওর রেকর্ড ছিল সাড়ে সাতাশ মন। কল্পনা করতে পারো? অথচ চেপে দেয়া হলো ওকে বেমালুম, কেবল হিংসার বশে। ওর দোষ—ও বাঙালী। যাক, খেয়ে নাও চটপট, কথা আছে।'

আটার রুটি, মাংস আর কিছু ফলমূল। খেতে খেতে রানা বলল, 'রিপ্যাট্রিয়েশনের ব্যাপারে এরা কি ভাবছে, স্যার?'

'আর বোলো না!' চুরুট ধরা হাতটা ডানদিকে নড়ল একটু। বিরক্তি। 'আগা গোড়া ভুল করে যাচ্ছে ব্যাটারা। আশ্চর্য লাগে ভাবতে। প্রথম থেকে আজ পর্যন্ত শুধু ভুলই করে চলেছে একটার পর একটা। বুঝতে যে পারছে না তা নয়। এখন আর কারও কাছেই কিছু গোপন নেই, যে মহাপ্রভুদের উস্কানিতে এতবড় গণহত্যায় নেমেছিল পাকিস্তান, সেই প্রভুরাই বিশ্বাসঘাতকতা করেছে ওদের সঙ্গে। সবটা ব্যাপার সাজানো। অথচ তবু গোঁ ছাড়বে না।' বিরক্ত মুখে নেভা চুরুটে গোটা চারেক টান দিলেন বৃদ্ধ। 'ওদের উচিত বাস্তব সত্যকে স্বীকার করে নিয়ে বাংলাদেশের সাথে যত দ্রুত সম্ভব মোটামুটি একটা ভাল সম্পর্ক স্থাপন করা। এদের নিজেদের স্বার্থেই এটা করা উচিত। ওভার প্রোডাকশন হয়ে গুদাম ভর্তি হয়ে গেছে এদের। এক্ষুণি যদি বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়ে, রিপ্যাট্রিয়েশনের ব্যবস্থার সাথে সাথে একটা দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি করে ফেলতে পারত...'

'কিন্তু বাংলাদেশ এদের সাথে বাণিজ্য করতে রাজি হবে কেন?'

'হওয়া উচিত। অন্তত আমার তো তাই মনে হয়। বাংলাদেশের স্বার্থেই রাজি হওয়া উচিত। বহুদিনের ইন্টারডিপেণ্ডেন্ট ইকনমি আমাদের। এদের তৈরি বহু জিনিস আমাদের দরকার, আমাদের বহু জিনিস এদের দরকার। আমাদের উপর কোন কিছু চাপিয়ে দেয়ার আর ক্ষমতা নেই এদের। কমপিটিটিভ প্রাইসে যদি এরা এদের মাল আমাদের কাছে বিক্রি করতে পারে তাহলে প্রাণে বেঁচে যাবে, আমাদেরও লাভ হবে অনেক। যাক, যা হবার হবে—দেখা যাক কি হয়।'

'সতেরো দিন আগে বেরিয়েছেন, এতদিন এখানে কি করছেন, স্যার?' সংক্ষিপ্ত নাস্তা সেরে পানি খেল রানা এক গ্লাস, তারপর একটা আপেল তুলে নিয়ে কামড় দিল।

'এখানে কিছু কাজ আছে। তুমি এসে পড়ায় ভালই হয়েছে। অবশ্য তোমাকে হুকুম করবার অধিকার আমার নেই, সমস্ত ব্যাপারটা শুনে তুমি নিজে যা ভাল বুঝবে করবে।'

সম্পূর্ণ অপরিচিত এক যুবক ঘরে ঢুকল। চট করে মেজর জেনারেলের মুখের দিকে চাইল রানা কোন বিপদ সঙ্কেত পাওয়া যায় কিনা দেখার জন্যে। নিজের অজান্তেই ডান হাতটা চলে গেছে শোল্ডার হোলস্টারে রাখা পিস্তলের বাঁটে।

যুবকের মুখে মৃদু হাসি। রানার চেয়ে দু'এক বছর কম হবে বয়স। ব্যাক ব্রাশ



করা কোঁকড়া চুল। ফর্সা সম্ভ্রান্ত রোমান্টিক চেহারা। চকচকে বুদ্ধিদীপ্ত দুই চোখ। বলল, 'আপনি অত্যন্ত ভয়ঙ্কর লোক, মিস্টার মাসুদ রানা।'

কণ্ঠস্বর চিনতে পারল না রানা। এই লোক কি করে ওর নাম জানল বুঝতে পারল না। মৃদু হেসে পরিচয় করিয়ে দিলেন বৃদ্ধ। 'এ হচ্ছে আলম। শামসুল আলম। আর তুমি তো একে চেনই।'

পরিচিতিটা পরিষ্কার হলো না রানার কাছে। কিন্তু কুকুরটাকে পিছু পিছু আসতে দেখে কিছু একটা আঁচ করতে যাচ্ছিল, এমন সময় হেসে উঠল শামসুল আলম। বলল, 'ঠিকই আন্দাজ করেছেন। কিছুক্ষণ আগে আমিই ছিলাম কর্নেল এহসান। এখন আমি শামসুল আলম। যথেষ্ট বিনয়ের সাথে এটুকু দাবি করতে পারি—ছদ্মবেশ ধারণে আর কণ্ঠস্বর নকলে আমার সমান কেউ আজ পর্যন্ত জন্মায়নি পাক-ভারত-বাংলাদেশ উপ-মহাদেশে। এখন মোটামুটি যে চেহারাটা দেখতে পাচ্ছেন, সেটা হচ্ছি আমি। এরপর এখানে একটু দাগ ওখানে একটু কাটা চিহ্ন আর তিল দিলেই হয়ে যাব পাকিস্তান আর্মি ইন্টেলিজেন্সের মেজর দেলওয়ার খান। এখন নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, আর্মি চেক পোস্টে সবাই আমার চেহারা দেখলেও বিন্দুমাত্র বিচলিত হইনি কেন আমি?'

'বুঝতে পারছি। কিন্তু মেজর দেলওয়ার খানের বাড়িতে মেজর জেনারেল রাহাত খান কিংবা হাবিলদার মেজর কায়েস আলীকে রাখা কি বিপজ্জনক নয়?'

'এটা আমার বাসা নয়। আমি এখানে থাকি না। আমি থাকি পার্ক লাগজারি হোটেলে। অবিবাহিত পুরুষ মানুষ—কাজেই মাঝে মাঝে দেরি করে হোটেলে ফিরলে কিংবা সারা রাত না ফিরলেও কেউ আর সেটাকে বড় করে দেখে না। সবাই বোঝে আমোদ-ফুর্তি করতে বেরিয়েছি।—কিন্তু এখন আমাদের বোধহয় কাজের কথায় আসা উচিত।'

'হ্যাঁ।' সোজা হয়ে বসলেন মেজর জেনারেল। রানা ভাবল, কথাটা খুব মনঃপূত হয়েছে বুড়োর—কাজ ছাড়া বোঝে না কিছু। এখন যে সিগারেট টানার জন্যে ওকে মিনিট পাঁচেক রেহাই দেয়া উচিত সে খেয়াল নেই। 'ব্যাপারটা সংক্ষেপে বললে দাঁড়াচ্ছে এই—আমি আটক থেকে পালিয়েছিলাম এক বাঙালী ব্রিগেডিয়ার আতিকুজ্জামানের সহযোগিতায়। উনি আলমের চাচা। পাঞ্জাবী মেয়ে বিয়ে করে এখানে ডোমিসাইলড হয়েছিলেন প্রায় বাইশ-তেইশ বছর আগে। যদিও গত দশ বছর উনি রিটায়ার্ড, তবু এতদিন ওঁকে কোন সন্দেহ করা হয়নি। এমন কি নয় মাসের মুক্তিযুদ্ধের সময়ও তাকে নিষ্ক্রিয় করে রাখা হয়নি। কিন্তু ইদানীং বেশ কয়েকটা অস্বাভাবিক ঘটনা—যেমন আমার পলায়ন, আট দশজন উচ্চপদস্থ আর্মি অফিসারের সীমান্ত অতিক্রম, ইত্যাদি—ঘটে যাওয়ায় কোন কোন মহল তাকে সন্দেহ করতে আরম্ভ করে। টের পেয়ে ছেলে আর মেয়েকে, এবং আমাকেও সরিয়ে দেন উনি এই গোপন আস্তানায়। নিজে শুধু রইলেন ওঁর কোয়ার্টারে। দু'দিন
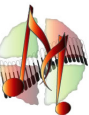
পর কায়েসকেও পাঠিয়ে দিলেন এখানে। প্ল্যান তৈরি করে প্রস্তুত হচ্ছিলাম আমরা। গুজরানওয়ালার একটা বন্দী শিবিরে সাড়ে তিনশো বাঙালী মেয়েকে আটক করে রেখেছে পাকিস্তান আর্মি। তেরো-চোদ্দ বছরের কিশোরী থেকে নিয়ে আটাশ-উনত্রিশ বছরের যুবতী। স্কুল কলেজ থেকে ধরে আনা হয়েছে—কিছু আছে বাঙালী অফিসারের যুবতী স্ত্রী বা মেয়ে। অকথ্য অত্যাচার চলছে ওদের ওপর। প্রতিদিন বিভিন্ন বর্ডার থেকে ট্রাক ভর্তি সোলজার নিয়ে আসা হয় রিক্রিয়েশনের জন্যে। পাশবিক অত্যাচার চালানো হচ্ছে ওদের উপর মাস ছয়েক যাবৎ। কিভাবে এই সাড়ে তিনশো মেয়েকে নিয়ে বর্ডার ক্রস করা যায় তার প্ল্যান চলছিল, এমনি সময় অ্যারেস্ট হয়ে গেল ব্রিগেডিয়ার জামান। মেয়েটাও নিখোঁজ। নির্ধারিত জায়গায় দেখা করতে গিয়েছিল নায়লা বাপের সঙ্গে তিনদিন আগে। আর ফেরেনি। গত পরশু জানা গেল ব্রিগেডিয়ার অ্যারেস্টেড। কোথায় আছে, কিভাবে আছে, বেঁচে আছে, না মেরে ফেলা হয়েছে, কিছু জানা যায়নি এখন পর্যন্ত।'

এতক্ষণ পর থামলেন মেজর জেনারেল। মনে পড়ল উপেক্ষিত চুরুটটার কথা। আবার জ্বেলে নিলেন ব্যস্তসমস্ত হয়ে। তারপর নীরবে টানতে থাকলেন ওটা মন দিয়ে। অনেকক্ষণ চুপচাপ কাটল। অপেক্ষা করল রানা ও আলম। ঝাড়া তিন মিনিট পর মুখ খুললেন বৃদ্ধ।

'কি ভাবছ, রানা?'

সরাসরি প্রশ্নে একটু চমকে গেল রানা। বলল, 'ভাবছি এখন তিনটে কাজ রয়েছে আমাদের সামনে। প্রথম: ব্রিগেডিয়ার ও তাঁর মেয়েকে উদ্ধার করা, দ্বিতীয়: সাড়ে তিনশো বাঙালী মেয়েকে উদ্ধার করা, এবং তৃতীয়: সবাইকে নিয়ে নিরাপদে বর্ডার পার হওয়া। তিনটে কাজই কঠিন। কিন্তু করতেই হবে।'

'তার মানে আপনি সাহায্য করছেন আমাদের?' জিজ্ঞেস করল আলম।

'নিশ্চয়ই।'

'মস্ত বিপদের ঝুঁকি আছে, সাহায্য করতে গিয়ে মৃত্যু ঘটতে পারে আপনার, তা জানেন?'

'নিশ্চয়ই।'

চেপে ধরল আলম রানার হাত।

'ধন্যবাদ।'

আলমের কুকুর ব্লাড হাউণ্ডের বাচ্চা—গুণ্ডাও খুশি হয়ে চেটে দিল রানার হাতটা।



# আট

শামসুল আলমের হাতের একটা গাঁট্টা খেয়ে উঠে বসল হোটেলের পোর্টার। দুই তাড়া লাগাল আলম। 'নাইটপোর্টার, দিনে ঘুমাবে, রাতে জাগবে। যাও, ম্যানেজারকে ডেকে আনো।'

'এত রাতে ম্যানেজার?' দেয়াল ঘড়ির দিকে একবার চেয়ে নিয়ে দুই হাতে চোখ কচলে পোর্টার বলল, 'ম্যানেজার সাহেব ঘুমিয়ে আছেন। কাল সকালে ছাড়া দেখা হবে না।'

কলার ধরে টেনে দাঁড় করিয়ে আইডেন্টিটি কার্ডটা ওর চোখের সামনে ধরল আলম। নিমেষে পাংশু হয়ে গেল ওর মুখ। ভয়ে চোখ দুটো ছানাবড়া।

'মাফ করে দেন, হুজুর। আমি···আমি জানতাম না···'

'জানতে না মানে? আমরা ছাড়া আর কে এসে এত রাতে ডেকে তুলবে?'

'কেউ না হুজুর···কেউ না। তবে বিশ মিনিট আগেই ঘুরে গেছেন আপনারা তাই···'

'আমি এসেছিলাম?'

'না, না, হুজুর। আপনি না। আপনাদের লোক···'

'আমি জানি,' বাধা দিয়ে বলল আলম। 'আমিই পাঠিয়েছিলাম ওদের। যাও, তোমাকে যা বলেছি তাই করোগে যাও।'
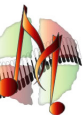
'এক্ষুণি যাচ্ছি, হুজুর!' বুলেটের বেগে ছুটে বেরিয়ে গেল পোর্টার ম্যানেজারকে ডাকতে।

রানা বলল, 'চমৎকার অভিনয়! আমি পর্যন্ত ভড়কে যাচ্ছিলাম আর একটু হলে। বেচারার অন্তরাত্মা কাঁপিয়ে দিয়েছেন একেবারে।'

'প্র্যাকটিস,' বলল আলম। 'এতে কারও তেমন ক্ষতি হয় না, কিন্তু আমার সুনাম হয় প্রচুর। কিন্তু কি বলল শুনলেন?'

'হ্যাঁ। সময় নষ্ট করেনি ওরা!'

'সকাল পর্যন্ত লাহোরের প্রত্যেকটি হোটেলেই খোঁজ চলবে আপনার। প্রত্যেককে জানিয়ে দেয়া হবে আপনার চেহারার মোটামুটি বিবরণ। ব্রিগেডিয়ারের গোপন আস্তানার চাইতে এখন এখানে অনেক নিরাপদ।' খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল আলম। 'খুব সম্ভব ওই বাড়িটার ওপর নজর পড়েছে ওদের, কেমন যেন সন্দেহজনক গতিবিধি লক্ষ করা যাচ্ছে। হয়তো অল্পদিনেই অন্য কোন আস্তানায় সরে যেতে হবে। মেজর জেনারেলকে যদি ধরতে পারে···'

পায়ের শব্দ শুনে থেমে গেল আলম। দৌড় তো নয়, যেন প্রায় উড়ে আসছে হোটেলের ম্যানেজার। চোখে মুখে ভয়, দুশ্চিন্তা আর উদ্বেগের চিহ্ন। চেহারা দেখেই চেনা যাচ্ছে—লোকটা বাঙালী।

'মাফ চাই,' প্রথমেই দুই হাত জড়ো করল ম্যানেজার। 'শত কোটিবার মাফ চাই। এই উল্লুকে পাটঠা···'

'আপনি ম্যানেজার?' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে প্রশ্ন করল আলম।

'জ্বি, হুজুর। আমিই ম্যানেজার, স্যার।'

'তাহলে ওই উল্লুকে পাটঠাকে বিদায় করুন এই ঘর থেকে। আমি গোপনে আপনার সাথে কয়েকটা কথা বলতে চাই।'

'নিশ্চয়ই, স্যার, নিশ্চয়ই।' ম্যানেজারের চোখের ইঙ্গিতে অনিচ্ছাসত্ত্বেও বেরিয়ে গেল পোর্টার ঘর ছেড়ে। নিজের চোখে দেখতে চেয়েছিল সে কেমন অপদস্থ হয় ম্যানেজার। কাল সকালে অন্যান্য স্টাফের কাছে জমিয়ে গল্প করা যেত। যথেষ্ট সময় নিয়ে ধীরে সুস্থে একটা সিগারেট বের করল আলম। আরও সময় নিয়ে ধরাল সেটাকে। ধরিয়ে টানতে থাকল আনমনে। মনে মনে আলমের নিখুঁত সময় জ্ঞানের প্রশংসা না করে পারল না রানা। আতঙ্কের উত্তেজনা চাপতে না পেরে কথা বলে উঠল ম্যানেজার।

'কি ব্যাপার, স্যার? আমার দ্বারা যদি আপনাদের কোন সাহায্য হয়, তবে···'

'চোপ!' এক আঙুল তুলে থামিয়ে দিল ওকে আলম। ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'বাজে কথা শুনতে চাই না। যা প্রশ্ন করব শুধু তার উত্তর দেবেন। আমার লোকেরা এসেছিল?'

'জ্বি, হুজুর। এই তো কয়েক মিনিট আগে। আমি ঘরে ফিরে গিয়ে জামাটা খুলে কেবল চোখটা বুজেছি···'

'আবার!' ভুরু কুঁচকে চাইল আলম ম্যানেজারের দিকে। 'বলেছি না, কেবল প্রশ্নের উত্তর দেবেন? ওরা নতুন লোক কেউ উঠেছে কিনা জিজ্ঞেস করেছে, রেজিস্টার চেক করেছে, তারপর একজন লোকের চেহারার বর্ণনা দিয়ে গেছে। তাই না?'

'জ্বি হুজুর।'

'ওই চেহারার কোন লোক এলে তৎক্ষণাৎ ফোন করতে আদেশ দিয়ে গেছে?'

'জ্বি, স্যার।'

'সেসব কথা ভুলে যান,' হুকুম দিল আলম। 'এইমাত্র জানা গেছে, সেই লোকটা হয় আগেই এসে গেছে এখানে, নয় আগামী চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে এসে পৌঁছবে। ওর লোক রীতিমত বাস করছে এই হোটেলে আজ কয়েক দিন যাবৎ। গত ছয়মাসের মধ্যে এই নিয়ে মোট চারবার এই হোটেলে জায়গা দিয়েছেন আপনি রাষ্ট্রের কয়েকজন ভয়ঙ্কর শত্রুকে।'



'এই হোটেলে?' চমকে উঠল ম্যানেজার। 'আমি আল্লার কসম খেয়ে বলছি, স্যার, আমার অজ্ঞাতসারে···' কাঁপতে আরম্ভ করেছে ম্যানেজার প্রবল ভাবে। গলাটা ভেঙে গেল এখানে এসে।

'আল্লা?' বিস্মিত হবার ভান করল আলম। 'বাংগালীর আবার আল্লা কি? আর তোমাদের কসমেরই বা দাম কি? তোমরা তো আধা-হিন্দু। ভাগোয়ান বলো। এতদিনে তোমার বারোটা বেজে যাওয়া উচিত ছিল, শুধু তোমার বাল-বাচ্চার মুখ চেয়ে কিছু বলা হয়নি তোমাকে এতদিন। তোমাকে মারলে বিধবা হবে এক পাঞ্জাবী মেয়েলোক—শুধু এইজন্যে। তবে সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেছ তুমি। তলে তলে সাহায্য করছ রাষ্ট্র-বিরোধীদের।'

'কসম খোদার, হুজুর। আমার অজ্ঞাতসারে···'

'কাজেই বলছি, এখনও সময় আছে, সাবধান হয়ে যাও। আর একবার এই ব্যাপার ঘটলে আমরা বাধ্য হব বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে। সরাসরি ধরব তোমাকে ইণ্ডিয়ান স্পাই আর বাঙালী রাষ্ট্র বিরোধীদের সঙ্গে যোগাযোগের দায়ে।'
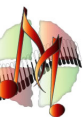
হাঁ করে কিছু বলার চেষ্টা করল ম্যানেজার। গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোল না, শুকনো ঠোঁট দুটো নড়ল কেবল। রানা বুঝতে পারল, কি আশ্চর্য আতঙ্ক আর মানসিক নির্যাতনের মধ্যে রয়েছে লোকটা। শখ করে পাঞ্জাবী মেয়ে বিয়ে করে এখন না হতে পারছে বাঙালী, না পাঞ্জাবী।

'আপনাকে এই শেষ একটা সুযোগ দেয়া হচ্ছে,' বলল আলম আবার 'আপনি'তে ফিরে গিয়ে। বুড়ো আঙুল দিয়ে ইঙ্গিত করল রানার দিকে। 'আমার লোক। যে স্পাইকে হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছি, চেহারায়, শারীরিক গঠনে অনেকটা তারই মত। তার ওপর আমরা আবার খানিক মেকাপ করে পাল্টে দিয়েছি এর চেহারা ওর মত করে। যাক, সেসব আপনার জানার কোন দরকার নেই। একটা কামরায় এর জন্যে ফার্স্ট-ক্লাস ব্যবস্থা করে দিন এক্ষুণি। অ্যাটাচড্ বাথ, টেলিফোন, শর্টওয়েভ রেডিও আর অ্যালার্ম ঘড়ি তো থাকবেই, এই হোটেলের প্রত্যেকটা ঘরের ডুপ্লিকেট চাবিও দেবেন এর কাছে। কেউ যেন একে কোন ডিসটার্ব না করে সেদিকে দেখবেন। কোন চাকর-বাকর ঘেঁষতে দেবেন না ওখানে। নিজ হাতে খাবার পৌঁছে দেবেন ওর ঘরে। মোট কথা ওর উপস্থিতি যেন কেউ টের না পায়। অত্যন্ত গোপনে সবার গতিবিধি লক্ষ করতে হবে ওকে। সব কথা পরিষ্কার বোঝা গেল?'

'নিশ্চয়ই, স্যার। আপনি যা হুকুম করবেন তার একচুল এদিক ওদিক হবে না। যেমন বলবেন, তেমনি হবে, স্যার।'

'আর ওই উল্লুকে পাটঠাকে সাবধান করে দেবেন যেন মুখ বন্ধ রাখে। নইলে জিভ কেটে নেব। এখন ঘরটায় নিয়ে চলুন আমাদের, এক্ষুণি।'

চলে গেল আলম। ব্রিগেডিয়ার জামান ও তাঁর মেয়ের খবর পেলেই জানাবে

টেলিফোনে। আলমের ধারণা এত সহজে মারবে না ওরা ব্রিগেডিয়ারকে। যতদূর মনে হয় তাকে একটা বিশেষ কাজে ব্যবহার করার জন্যে ধরা হয়েছে। আগামী পরশু একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রেস কনফারেন্স ডাকা হয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের পত্র পত্রিকার প্রতিনিধি আসছে এই কনফারেন্সে। আলমের ধারণা এই কনফারেন্সে কোন গুরুত্বপূর্ণ বিবৃতি দিতে বাধ্য করা হবে ব্রিগেডিয়ার জামানকে।

টেলিফোনে আলাপের সাঙ্কেতিক ভাষা ঠিক করে নিয়েছে ওরা। দুই দিন, বড়জোর তিন দিন থাকা যাবে এই হোটেলে, তারপর পরিচয় বদলে নিয়ে অন্য ব্যবস্থা করতে হবে। আপাতত খবর সংগ্রহ করে দেয়ার চেষ্টা করবে আলম, এর বেশি কিছু করা ওর পক্ষে সম্ভব হবে না। খবর পাওয়া গেলে উদ্ধার করার সম্পূর্ণ দায়িত্ব রানার।

আলম বেরিয়ে যেতেই রাজ্যের ক্লান্তি এসে চেপে ধরল রানাকে। দরজাটা বন্ধ করে তালা লাগিয়ে চাবিটা রেখে দিল সে কী হোলে, যাতে বাইরে থেকে ডুপ্লিকেট চাবি দিয়ে কেউ খুলতে না পারে। একটা চেয়ার টেনে এনে হাতলের নিচে আটকে দিল আরও নিশ্চিন্ত হবার জন্যে। তারপর কাপড় ছেড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল বিছানায়।

আশ্চর্য ওর জীবন, ভাবল রানা। আধঘণ্টা আগেও জানা ছিল না যে এই হোটেলের এই বিছানায় ঘুমাবে সে। সব ব্যাপারেই লক্ষ করেছে সে, যত নিখুঁত প্ল্যান করেই কাজে নামুক না কেন কিছুতেই নিয়ম মাফিক হতে চায় না সবকিছু। জীবনটা চলমান। ছক বাঁধা এবং ছক ভাঙার খেলা। কোথা থেকে অদ্ভুত সব ঘটনা, অদ্ভুত সব লোক এসে জড়িয়ে যায় প্ল্যানের সাথে। সব উল্টে-পাল্টে যায়। নতুন করে ভাবতে হয় সবটা ব্যাপার, আগাগোড়া। ভবিষ্যৎটা অনিশ্চিত বলেই এমন অদ্ভুত ওর আকর্ষণ, এত বৈচিত্র্য।

[illegible] থেকে প্ল্যান করে এসেছিল মেজর জেনারেলকে উদ্ধার করে নিয়ে যাবে পাকিস্তান থেকে। এসে কি দেখল? নিজেই উদ্ধার পেয়ে দিব্যি প্ল্যান ফেঁদে বসে আছে বুড়ো—সেই প্ল্যানের মধ্যেও ঘাপলা বেধে গেছে ইতিমধ্যেই। জড়িয়ে গেল সেও। এখন আর ভবিষ্যৎ নয়, অদূর-ভবিষ্যৎ—অর্থাৎ অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা। দূরের প্ল্যান করে লাভ নেই। ঘটনা যেমন ভাবে গড়াবে তেমনি তার সাথে খাপ খাইয়ে নিয়ে চলতে হবে, দ্রুত বিশ্লেষণ করে নিয়ে সুযোগ সুবিধার সদ্ব্যবহার করতে হবে।

শুয়ে শুয়েই পিস্তলটা পরীক্ষা করল রানা। সব ঠিক আছে। গুঁজে দিল ওটা বালিশের নিচে। তারপর ঘুমিয়ে পড়ল নিশ্চিন্তে। ডান হাতটা বালিশের তলে পিস্তলের বাঁটের উপর রাখা।

পরদিন বেলা বারোটায় ঘুম ভাঙল রানার। লম্বা বিশ্রাম পেয়ে রীতিমত চাঙ্গা হয়ে উঠেছে শরীরটা। প্রকাণ্ড হাই তুলে আড়মোড়া ভাঙল সে। আরও মিনিট দুয়েক গড়াগড়ি করে উঠে পড়ল একটা সিগারেট ধরিয়ে। টেলিফোনে খাবারের অর্ডার দিয়ে বাথরুমে ঢুকল। একেবারে দাড়ি কামিয়ে স্নান সেরে বেরোল সে বাথরুম



থেকে। ঝরঝরে লাগছে শরীর মন। জানালার কাছে দাঁড়িয়ে পর্দা ফাঁক করে দেখল রাজপথের ব্যস্ততা, রোদ।

দরজায় টোকা পড়তেই হাতলের নিচ থেকে চেয়ারটা সরিয়ে দরজা খুলে দিল রানা। ট্রে হাতে নিয়ে ঘরে ঢুকল ম্যানেজার স্বয়ং। খাবার নামিয়ে রেখে একটা খাম বের করল সে পকেট থেকে।

'আপনার চিঠি, স্যার।'

'আমার চিঠি? কখন এসেছে?' থমকে উঠল রানা।

'মিনিট পাঁচেক আগে।'

'পাঁচ মিনিট আগে?' ক্রুদ্ধ চোখে চাইল রানা ম্যানেজারের অপরাধী চোখের দিকে। 'পাঁচ মিনিট আগেই এটা নিয়ে আসেননি কেন?'

'মাফ চাই, হুজুর।' ভড়কে গেল ম্যানেজার। 'আপনার খাবার প্রায় তৈরি হয়ে গিয়েছিল, আমি···আমি ভাবলাম···'

'আপনি ভাবলেন?' আকাশ থেকে পড়ল রানা। 'আপনাকে কে ভাবতে বলেছে? ভবিষ্যতে কোন ভাবনা-চিন্তা না করে সংবাদ এলেই তৎক্ষণাৎ জানাবেন আমাকে। কে নিয়ে এসেছে চিঠিটা?'

'একটা মেয়ে—একজন ভদ্রমহিলা।'

'দেখতে কেমন?'

'জানি না, স্যার।'

'জানেন না?'

'বোরখা পরা ছিল। গলার স্বর একটু মোটা। চিঠিটা দিয়েই চলে গেলেন।'

'ঠিক আছে। যান এখন, আধঘণ্টা পর আসবেন।'

কে এসেছিল? মেয়ে! খামের উপর লেখা নেই কিছুই। মেয়ে আসবে কোত্থেকে? বোরখার কথা মনে আসতেই বুঝতে পারল, নিশ্চয়ই সেই হিপ্পি ছোঁড়াটা। আবনু না কি নাম। ব্রিগেডিয়ার জামানের দ্বিতীয় সন্তান। কিন্তু হঠাৎ চিঠি কেন? দুঃসংবাদ? খাম ছিঁড়ে ছোট্ট চিঠি পাওয়া গেল। লেখা:

আলমের সন্দেহই ঠিক—ওর চাচাকে
কনফারেন্সের জন্যেই আটক করা হয়েছে।
ঠিকানা জানতে পারলেই জানানো হবে তোমাকে।
হোটেলেই অপেক্ষা করো। রাত এগারোটার
আগে বাসায় এসো না।
লাইলার খবর নেই।

আর. কে.

চিঠিটা পুড়িয়ে ছাইটা গুঁড়ো করে কমোডে ফেলে চেন টেনে দিল রানা। তারপর খেয়ে নিল লাঞ্চ। এঁটো বাসন নিয়ে চলে গেল ম্যানেজার।
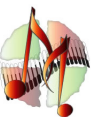
আর তো সময় কাটতে চায় না। সারাদিন অপেক্ষা করল রানা। তিনটে, চারটা, পাঁচটা, ছয়টা বেজে গেল তবু আলমের ফোন আসার নাম নেই। জামা কাপড় পরে তৈরি অবস্থায় এরকম একঘেয়ে অপেক্ষা করতে করতে নানান রকম দুশ্চিন্তা আসতে আরম্ভ করল রানার মনে। ধরা পড়ে গেল না তো শামসুল আলম? সেক্ষেত্রে রানা বা রাহাত খানের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা কতটুকু? বেরিয়ে পড়বে নাকি সে হোটেল থেকে? ব্রিগেডিয়ারের খোঁজ না বের করতে পারলে রানার করণীয় আর কিছুই নেই। ক্রমে বিরক্ত হয়ে উঠতে আরম্ভ করল রানা। এমন অবশ্যই হতে পারে যে খবর বের করতে পারেনি আলম, এখনও চেষ্টায় আছে। কিন্তু একবার ফোন করে সে কথা জানিয়ে দিয়ে উৎকণ্ঠা থেকে তো নিষ্কৃতি দিতে পারত সে রানাকে। কারও জন্যে অপেক্ষা করতে ভাল লাগে না রানার। অসহ্য হয়ে উঠল শেষ কালে।

ঠিক সাড়ে সাতটায় বেজে উঠল ফোন। রিসিভার তুলে নিল রানা।

'মিস্টার শরাফ আলী বলছেন?' আলমের কণ্ঠ চিনতে পারল রানা।

'হ্যাঁ।'

'আপনার জন্যে চমৎকার খবর আছে মিস্টার শরাফ আলী। মিনিস্ট্রীর সাথে কথা হয়েছে। চীফ সেক্রেটারি আপনাদের মাল নিতে রাজি হয়েছে—কিন্তু দামের ব্যাপারে ৭৮-এর বেশি উঠতে রাজি নন। দেখুন এখন আপনি নিজে আলাপ করে কিছু বাড়াতে পারেন কিনা—লোকটার মেজাজ ভয়ানক কড়া। আমার কমিশনের কথাটা কিন্তু ভুলবেন না।'

'নিশ্চয়ই। সে ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাকুন।'

'তাহলে আজ আটটার দিকে আসুন, ডিনার খাওয়া যাক একসাথে?'

'ঠিক আছে। আমি আসছি। চার তলায় তো?'

'তিন তলায়। আচ্ছা, দেখা হবে। রাখলাম।'

লাইন কেটে দিল আলম। যদিও খুব তাড়াহুড়ো করে খবরগুলো দিয়েছে, কিন্তু সব কথাই রয়েছে এর মধ্যে। একটা ছোট্ট কাগজ টেনে নিল রানা। 'খ' লেখা নামটায় টিক চিহ্ন দিল—পরমুহূর্তে চমকে উঠল। ওরেব্বাপস! এখানে সে ঢুকবে কি করে? শরাফের 'খ' মানে স্পেশাল অফিসারস কোয়ার্টার। অত্যন্ত কড়া পাহারা এই ছয়তলা অফিসারস কোয়ার্টারে। মোট একশো বিশটা স্বয়ং-সম্পূর্ণ অ্যাপার্টমেন্ট আছে ছটি তলায়। উচ্চপদস্থ সামরিক অফিসারদের বাইরে থেকে স্পেশাল কোন কাজে ডেকে আনা হলে এইখানে থাকতে দেয়া হয়। ৭৮ মানে রুম নম্বর ৮৭—উল্টে নিতে হবে। আটটায় সময় লাউঞ্জে ডিনার সার্ভ করা হয়। তিন তলার ৮৭ নম্বর অ্যাপার্টমেন্টে রাখা হয়েছে ব্রিগেডিয়ারকে কড়া পাহারায়। লাহোরের কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি এখনও।

তৈরি হয়ে নিল রানা। প্যান্টের ডান পকেটে রাখল একটা শক্তিশালী পেন্সিল টর্চ। সাইলেন্সার লাগিয়ে ল্যুগারটা অতিরিক্ত লম্বা হয়ে যাওয়ায় বেল্টের নিচে গুঁজে



নিল সেটাকে। স্পেয়ার ম্যাগাজিনটা রাখল কোটের পকেটে। তারপর ঘরের বাতি জেলে রেখেই বেরিয়ে এসে তালা লাগিয়ে দিল দরজায়। সরু করিডর দিয়ে হোটেলের একপাশে সুইপার প্যাসেজে বেরিয়ে এল রানা। ওখান থেকে উঠল বড় রাস্তায়।

বিশ মিনিটের হাঁটা পথ।

## নয়

এদিকটা ক্যান্টনমেন্ট এরিয়ার আওতায় পড়ে। যদিও আশে পাশে প্রচুর বেসামরিক বাড়ি ঘর আছে। দিনের বেলায় বেশ জমজমাট থাকে এলাকাটা, কিন্তু সন্ধের পর জনশূন্য হয়ে পড়ে রাস্তা।

রাস্তার অপর পাশ দিয়ে ফুটপাথ ধরে চলে গেল রানা অফিসারস কোয়ার্টারের গেট পেরিয়ে। বাড়িটা প্রকাণ্ড। প্রায় চারকোনা। গেটের দু'পাশে দু'জন সশস্ত্র প্রহরী দেখতে পেল রানা আড়চোখে। দু'জনের হাতেই স্টেনগান।
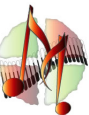
রানা বুঝল, গেট দিয়ে ভিতরে ঢোকা অসম্ভব। বেশ কিছুদূর হেঁটে গিয়ে গার্ড দু'জনের চোখের আড়ালে এসেই রাস্তা পার হয়ে ফিরে এল রানা বাড়িটার কাছাকাছি। নাহ্। পাশ দিয়ে ঢুকবারও কোন ব্যবস্থা নেই। এদিকের জানালাগুলোতে মোটা লোহার শিক। নিশ্চয়ই ওদিকের জানালাগুলোতেও তাই। একটা পাইপও নেই যে বেয়ে উঠবে। এখন একমাত্র ভরসা পিছন দিক।

বাড়িটার গা ঘেঁষে এগিয়ে গেল রানা দ্রুত পায়ে। একটা খিলান দেখা যাচ্ছে বাড়ির পিছনে। বোধহয় চাকর-বাকর-জমাদার-বাবুর্চি-ধোপা আসা যাওয়া করে এই পথে। বাজার বোঝাই ঠেলাগাড়িও অনায়াসে ঢুকিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় স্টোর রুম বা রান্নাঘর পর্যন্ত। গেটটা খোলা। বাড়ির পিছনে বেশ খানিকটা জায়গা দেয়াল দিয়ে ঘেরা। খিলানে এসে মিশেছে সে দেয়াল। সবুজ প্রাঙ্গণ দেখতে পেল রানা।

নিশ্চয়ই এখানেও প্রহরী আছে? থাকতেই হবে।

দেয়ালের সাথে পিঠ লাগিয়ে সাবধানে এগোল রানা খিলানের দিকে। চৌকোণা বাড়িটার পিছনে দুই কোণে দুটো ইলেকট্রিক বাতি জ্বলছে। একশো পাওয়ারের। কিন্তু সারাটা প্রাঙ্গণ পুরোপুরি আলোকিত হয়নি—মাঝখানটা অত্যন্ত ম্লান ভাবে আলোকিত।

খিলানের পাশে এসে দাঁড়াল রানা। ধীরে ধীরে মাথাটা সামনে বাড়াল ভিতরটা দেখবার জন্যে। হঠাৎ চোখ ঝলসে গেল রানার। জ্বলে উঠেছে উজ্জ্বল একটা টর্চ। দুই সেকেণ্ড কিছুই দেখতে পেল না রানা চোখে। ধড়াস ধড়াস লাফাচ্ছে হৃৎপিণ্ডটা

বুকের ভিতর। বুঝতে পারল, ধরা পড়ে গেছে সে। সাইলেন্সার ফিট করা পিস্তলটা ততক্ষণে বেরিয়ে এসেছে ওর হাতে। কিন্তু আশ্চর্য! আলোটা ওর উপর থেকে সরে চলে গেল প্রাঙ্গণের অন্য প্রান্তে। কেউ গুলি ছুঁড়ল না, কিংবা চিৎকার করে উঠল না 'হুকুমদার' বলে।

এবার বুঝল রানা ব্যাপারটা। সাব-মেশিনগান হাতে একজন গার্ড রাউণ্ড দিচ্ছে আঙিনাটায়। ওর হাতের অসতর্ক ভাবে ধরা টর্চের আলোই পড়েছিল রানার চোখের উপর। কিন্তু প্রহরীর চোখ দুটো টর্চের আলো অনুসরণ করছে না বলেই দেখতে পায়নি সে রানাকে। ঘুরে চলে যাচ্ছে সে আরেক দিকে; রানা বুঝল একঘেয়েমিতে ভুগছে গার্ডটা, নিরাসক্ত ভাবে ডিউটি পালন করে যাচ্ছে কেবল, এইপথে কোন শত্রু ঢুকতে পারে এটা ওর কল্পনারও বাইরে। লক্ষণটা ভাল। অন্তত রানার জন্যে। অলস ভঙ্গিতে হাঁটছে প্রহরী, আরেকটু গেলেই আড়াল হয়ে যাবে। আর দেরি করা ঠিক না।

খিলানের হোয়াইট ওয়াশ করা দেয়াল ঘেঁষে লম্বা পা ফেলে এগিয়ে এল রানা। দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছিল, হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে গেল সে বজ্রাহতের মত। সেঁটে গেল দেয়ালের সঙ্গে। দ্বিগুণ বেগে লাফাচ্ছে হৃৎপিণ্ডটা। সাঁ করে একটা সিগারেটের টুকরো এসে পড়েছে রানার সামনে। তিন হাত তফাতে কাদায় পড়ে নিভে যাচ্ছে ওটা এখন। ভয়ার্ত দৃষ্টি তুলে দেখল রানা, খিলানের পরই একটা সেন্ট্রিবক্স। যদি দৈব-ক্রমে সিগারেটের টুকরোটা না ফেলত, তাহলে এতক্ষণে ওই প্রহরীর হাতে ধরা পড়ে যেত ও।

মাত্র চারফুট দূরে একজন সেন্ট্রির দেহের অর্ধেকটা দেখা যাচ্ছে। একটু ঘুরলেই দেখে ফেলবে রানাকে। দেয়ালের সাথে মিশে যেতে ইচ্ছে করল ওর। যদি ভাগ্যক্রমে এই গার্ডটা এদিকে নাও তাকায়, তবু ওর টহলদার সঙ্গীর টর্চের আলোয় ধরা পড়বে সে বিশ সেকেণ্ডের মধ্যে। ওদিকটা দেখেই এক্ষুণি ফিরে আসবে ও আবার এদিকে। অন্ধকারে আত্ম-গোপনের উদ্দেশ্যে গাঢ় ছাই রঙের স্যুট পরে এসেছে রানা, এখন সাদা দেয়ালের গায়ে প্রকট হয়ে রয়েছে ওর অস্তিত্ব। নজর এড়িয়ে যাওয়ার কোন সম্ভাবনাই নেই।

যদি এখন ঘুরে দৌড় দেয় তাহলে হয়তো পালিয়ে যেতে পারবে রানা, কিন্তু প্রহরার ব্যবস্থা আরও শক্ত হয়ে যাবে, ব্রিগেডিয়ারের সাথে দেখা করা আর কিছুতেই সম্ভব হবে না। আর যদি গার্ড দু'জনকে ও হত্যা করে, মৃতদেহ লুকাতে পারবে না কোথাও। রানা এই বাড়ির মধ্যে থাকতে থাকতেই যদি ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে যায়, তাহলে আর জ্যান্ত বেরোতে হবে না স্পেশাল অফিসার্স কোয়ার্টার থেকে। কাজেই অন্য কোন উপায় বের করে নিতে হবে। এবং পনেরো সেকেণ্ডের মধ্যেই।

পিস্তলটা হাতেই রয়েছে। আর মাত্র আটফুট দূরে আছে টর্চ হাতে গার্ডটা।



সেন্ট্রি-বক্সের প্রহরী ওকে কিছু বলবে বলে একটু কেশে পরিষ্কার করে নিল গলাটা। সাথে সাথেই ট্রিগার টিপল রানা।

ছোট্ট একটা কাশির মত শব্দ হলো, কিন্তু সে শব্দটা ঢাকা পড়ে গেল বাম দিকের বাল্বটা ঝনঝন্ করে ভেঙে পড়ায়। সাইলেন্সার লাগানো পিস্তলের শব্দটা শুনতেই পেল না প্রহরী। দু'জনেই ছুটল নিভে যাওয়া বাতির দিকে। নিঃশব্দ পায়ে রানা এসে দাঁড়াল সেন্ট্রিবক্সের পাশে, সেখান থেকে উঁকি দিয়ে গার্ডদের একবার দেখে নিয়েই এক ছুটে চলে এল জমাদার ওঠার লোহার ঘোরানো সিঁড়ির কাছে। দ্রুত পায়ে উঠে গেল রানা। পিঠটা কুঁজো করে নিচু হয়ে উঠছে সে। একেক বারে দুই সিঁড়ি করে টপকে উঠে এল সে তিনতলার বাথরুমের দরজার সামনে। বসে পড়ল। ওখান থেকেই শুনতে পেল প্রহরী দু'জনের আলাপ। কারেন্ট ফ্লাকচুয়েশনের জন্যেই যে ফেটে চৌচির হয়ে গেছে বাল্বটা তাতে ওদের কোন সন্দেহ নেই। তবু ভাল ভাবে একপাক ঘুরে দেখল ওরা আঙিনাটা। খিলান দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এদিক ওদিকে টর্চ ফেলে নিশ্চিন্ত হলো। রানা বুঝল, বেশ অনেকখানি সতর্ক হয়ে গেছে ওরা বাল্বটা হঠাৎ ফেটে যাওয়ায়। একঘেয়েমী দূর হয়ে গিয়ে সজাগ হয়ে উঠেছে প্রহরীরা।

বাথরুমের দরজা বন্ধ। বাইরে থেকে তালা দেয়া। পরপর কয়েকটা চাবি লাগাতেই খুলে গেল তালা। নিঃশব্দে ভিতরে চলে এল রানা। অন্ধকার। দেয়াল হাতড়ে হাতড়ে লাইটের সুইচ পাওয়া গেল। একবার ভাবল, পর্দাগুলো টেনে দেবে নাকি লাইট জ্বালাবার আগে? পরমুহূর্তে বুঝল, আলো দেখলেও সেন্ট্রিদের সন্দেহ করবার কোন কারণ নেই। প্রকৃতির ব্যাপার—আর্মি অফিসারদেরও পেট খারাপ হতে পারে, নিষেধ নেই—যখন তখন এই ঘরের বাতি জ্বলতে পারে। বিনাদ্বিধায় লাইট জেলে দিল রানা।

বেশ বড়সড় বাথরুম। বুক-সমান মোজাইক করা দেয়াল। বেসিন, কমোড, বাথটাব, শাওয়ার—সব রয়েছে যেটা যেখানে থাকা উচিত। দুটো দরজা। একটা পাশের ঘরে যাবার জন্যে, অন্যটা খুব সম্ভব করিডরে যাবার। চারপাশে একবার চোখ বুলিয়ে প্রত্যেকটি জিনিসের অবস্থান সম্পর্কে একটা পরিষ্কার ধারণা করে নিয়েই বাতি নিভিয়ে দিল রানা। ডান ধারের দরজাটা খুলে সামান্য একটু ফাঁক করে চোখ রাখল সেই ফাঁকে।

দেখল, একটা লম্বা কার্পেট মোড়া করিডরের শেষ মাথায় দাঁড়িয়ে আছে সে। করিডরের দুই ধারেই সারি সারি দরজা। একটা দরজার মাথায় নম্বর পড়ল রানা—৮১। ভাগ্যক্রমে ব্রিগেডিয়ার আতিকুজ্জামানের কামরার কাছাকাছিই এসে গেছে সে। মৃদু হাসি ফুটে উঠল ওর মুখে। আজকে তাহলে ভাগ্যটা গত কালকের মত খারাপ ব্যবহার করছে না। ভাগ্য সহায় না হলে কোন কাজ হতে চায় না সহজে।
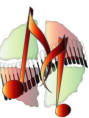
কিন্তু করিডরের শেষ মাথায় তাকিয়েই মুখটা শুকিয়ে গেল ওর। চট্ করে পিছিয়ে এসে আস্তে বন্ধ করে দিল দরজা। করিডরের অপর মাথায় দাঁড়িয়ে কাচের জানালা দিয়ে বাইরে চেয়ে আছে একজন রিভলভারধারী মিলিটারি পুলিস রানার দিকে পিছন ফিরে।

বাথটাবের কিনারে বসে সিগারেট ধরাল রানা একটা। বুদ্ধি বের করতে হবে। গার্ডটা ওখান থেকে নড়বে বলে মনে হয় না। ব্রিগেডিয়ারের উপর নজর রাখার জন্যেই ওকে রাখা হয়েছে ওখানে। কিন্তু ও ব্যাটা ওখানে দাঁড়িয়ে থাকলে ৮৭ নম্বর ঘরে ঢুকতে পারবে না রানা কিছুতেই। কাজেই সরাতে হবে ওকে। কিন্তু কিভাবে? এত লম্বা আলোকিত করিডর দিয়ে এতদূর গিয়ে ওকে কাবু করা অসম্ভব। আত্মহত্যারই সামিল। ওকে এখানে আনতে হবে। এমন ভাবে আনতে হবে যাতে কোন সন্দেহ না করতে পারে। কিন্তু কিভাবে?

হঠাৎ উজ্জ্বল হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল রানার মুখ। ধূর্ত-চূড়ামণি শামসুল আলমও প্রশংসা না করে পারবে না। বাতিটা জ্বেলে দিল সে আবার।

কোট, প্যান্টি, টাই আর শার্ট খুলে ফেলল রানা। লুকিয়ে রাখল খালি বাথটাবের ভিতর। একটা বড় তোয়ালে জড়িয়ে নিল কোমরে। মাথার চুলগুলো এলোমেলো করে নিয়ে বেসিনের উপর রাখা ইরাসমিক শেভিং স্টিক থেকে সাবান নিল ব্রাশে। এবার মুখটা পানি দিয়ে ভিজিয়ে নিয়ে আচ্ছা করে সাবান ঘষে ফেনা তুলে ফেলল। রানার বর্তমান চেহারাটা এম.পি-র জানার কথা নয়, তবু ভবিষ্যতে যেন এই চেহারার বর্ণনাও লোকটা দিতে না পারে সেজন্যে এই সাবধানতা। এবার দুই হাত ধুয়ে মুছে নিল ব্র্যাকেট থেকে মাঝারি আকারের আরেকটা তোয়ালে টেনে নিয়ে। বাম হাতে পিস্তলটা ধরে তোয়ালে দিয়ে ঢেকে দিল রানা। তারপর দরজা খুলে মাথাটা বের করল বাইরে। নিচু ফিশফিশে গলায় ডাকল রানা গার্ডকে, 'এ—ই!'

ঝট্ করে ঘুরে দাঁড়াল গার্ডটা। রিভলভারের বাটে চলে গেছে ওর ডান হাত। কিন্তু বাথরুমের দরজায় তোয়ালে হাতে, মুখে সাবান মাখা একজন নিরীহ নিরস্ত্র লোককে দেখে সরিয়ে নিল হাতটা। নিশ্চয়ই কোন অফিসার। ইশারায় ডাকল রানা ওকে। কিছু বলবার জন্যে হাঁ করেছিল, ঠোঁটের উপর তর্জনী চেপে ধরে ওকে কথা বলতে নিষেধ করল রানা বোবার ভাষায়। একটু দ্বিধা করল গার্ডটা, কিন্তু যখন দেখল, দাঁত খিঁচিয়ে ওকে কাছে যাওয়ার জন্যে ইঙ্গিত করছে লোকটা পাগলের মত, তখন দৌড়ে এগিয়ে এল সে কার্পেটের উপর দিয়ে নিঃশব্দ পায়ে। রানার কাছে পৌঁছবার আগেই রিভলভার বের করে ফেলেছে সে কোমরে ঝোলানো হোলস্টার থেকে।

চোখ ছানাবড়া করে চাপা উত্তেজিত গলায় ফিস ফিস করে বলল রানা গার্ডের কানে কানে, 'ওই দরজার বাইরে একজন লোক আছে!' আঙুল দিয়ে জমাদারের দরজাটা দেখাল রানা। 'দরজা খোলার চেষ্টা করছে।'



'তাই নাকি! আপনি দেখেছেন ওকে?'

'দেখেছি। আমাকে ও দেখতে পায়নি।'

এম. পি-র চোখ দুটো জ্বলজ্বল করে উঠল। পুরু কালো ঠোঁট দুটোতে ফুটে উঠল একটুকরো হাসি। ওর মনের মধ্যে এখন প্রমোশন, বাহবা, ইনক্রিমেন্ট ইত্যাদির চিন্তা ছুটোছুটি করছে। একটুও সন্দেহ করল না রানাকে। বাম হাতের ইশারায় রানাকে সরে দাঁড়াবার ইঙ্গিত করে পা টিপে ঢুকে পড়ল সে বাথরুমের ভিতর। রিভলভারটা বাগিয়ে ধরেছে দরজার দিকে। তোয়ালের তলা থেকে ল্যুগারটা চলে এল রানার ডান হাতে। সে-ও এগোল গার্ডের পিছু পিছু।

দরজার ওপাশের লোকটার উদ্দেশ্যে কিছু একটা হুমকি উচ্চারণ করতে যাচ্ছিল গার্ডটা, ঠিক সেই সময় মারল রানা। ঠক্ করে ল্যুগারের বাঁটটা পড়ল গার্ডের কানের পাশে।

হাঁটু ভাঁজ হয়ে যেতেই ধরে ফেলল রানা ওকে, আস্তে নামিয়ে দিল মেঝের উপর। ইউনিফরমটা খুলে পরে নিল, রিভলভারটা রাখল হোলস্টারে। তারপর হাত-পা বেঁধে জ্ঞানহীন গার্ডের মুখের ভিতর একটা রুমাল ভরে বেঁধে ফেলল মুখটা বাইরে থেকে। নিজের কোট ও প্যান্টের পকেট থেকে প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো বের করে নিয়ে পুরল এম. পি. ইউনিফরমের বিভিন্ন পকেটে। পিস্তলটা গুঁজে নিল পেটের কাছে বেল্টের নিচে। এবার শুইয়ে দিল গার্ডকে বাথটাবের ভিতর, সযত্নে। নিজের শার্ট, প্যান্ট, কোট, টাই আর জুতো একটা পুঁটুলি মত করে রেখে দিল দেয়ালের গায়ে বসানো একটা আলমারিতে।

গার্ডটা বাথরুমে ঢোকার ঠিক দুই মিনিটের মধ্যেই বেরিয়ে এল রানা করিডরে। শেষ মাথায় গিয়ে চাইল বাম পাশের করিডরে। ওই মাথায় দাঁড়িয়ে আছে আরেকজন এম. পি.। এতদূর থেকে চেহারা চেনা যাবে না—মনে মনে নিজেকে প্রবোধ দিল রানা। কাঠের জানালা দিয়ে মূর্ছাপ্রাপ্ত গার্ডের অনুকরণে একই ভঙ্গিতে চেয়ে রইল রানা বাইরের দিকে ঝাড়া দুটো মিনিট। আড়চোখে দেখল দূরের গার্ডটাকে। টের পায়নি ব্যাটা। ধীর পায়ে এসে দাঁড়াল সে ৮৭ নম্বর অ্যাপার্টমেন্টের সামনে। কিন্তু একটা চাবিও লাগল না দরজায়। আবার জানালার সামনে দাঁড়িয়ে মিনিট খানেক নিজের উপস্থিতি জাহির করে ফিরে এল সাতাশী নম্বরের পাশের নম্বর-ছাড়া দরজা—অর্থাৎ অ্যাটাচড্ বাথরুমের দরজার সামনে। এটাতেও চাবি দেয়া। এবং এবারও একটা চাবিও লাগল না। কিন্তু সেজন্যে চিন্তা নেই। সহজে খোলা গেল না, এই যা। যে কোন দরজার তালা খুলবার জন্যে স্পেশাল ট্রেনিং দেয়া হয়েছে ওকে। চারকোনা লম্বাটে একটা পাতলা সেলুলয়েডের টুকরো বের করল সে পকেট থেকে। দরজার ফাঁক দিয়ে সেটা ঢুকিয়ে দিয়ে হ্যান্ডেলটা ধরে নিজের দিকে টান দিল সে, তারপর সেলুলয়েডের টুকরোটা দিয়ে ল্যাচের নিচে একটা চাড় দিতেই ক্লিক করে খুলে গেল দরজা। ঘড়ি দেখল রানা।
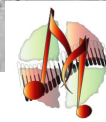
আবার একবার করিডরের শেষ মাথায় নিজের চেহারাটা দেখিয়ে ফিরে এসে ঢুকে পড়ল রানা বাথরুমের ভিতর।

অন্ধকার বাথরুম। বেডরুমের চাবির ফুটোয় চোখ রেখে দেখল, সে ঘরটাও অন্ধকার। আস্তে দরজা খুলে পেন্সিল টর্চটা বুলাল সে সারাঘরে। খালি। পাশের ড্রইংরুমের আলোও নেভানো। সেটাও খালি। জানালাগুলোর ভারি কার্টেন টেনে দিয়ে জ্বেলে দিল সে ঘরের বাতি। দরজার হ্যাণ্ডেলে টুপিটা ঝুলিয়ে দিল যাতে চাবির ফুটো দিয়ে বাইরে আলো না যেতে পারে।

সারা ঘর তন্ন তন্ন করে খুঁজল রানা। দেয়াল, টাঙানো ছবি, ভেন্টিলেটার—কোন জায়গা বাদ রইল না। দুই মিনিটে বের করে ফেলল সে লুকানো মাইক্রোফোন, সেই সাথে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল, ঘরে স্পাই হোল নেই কোন। বাথরুমে কোন মাইক্রোফোন পেল না সে। ঘড়ির দিকে চেয়ে চমকে উঠল রানা। দৌড়ে বেডরুমে চলে এল সে। বাতিগুলো নিভিয়ে দিয়ে টুপিটা মাথায় পরে নিয়ে বেরিয়ে এল সে বাথরুমের দরজা দিয়ে করিডরে। আবার গিয়ে দাঁড়াল শেষ মাথায়।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না। লিফটের গহ্বর থেকে বেরিয়ে এল কয়েকজন আর্মি অফিসার। তিনজন চলে গেল ওদিকে, বাকি দুইজন আসছে এদিকে। খটাশ্ করে বুট ঠুকে পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইল রানা বুক টান করে। একজনের ইউনিফরমের সংকেত দেখে বোঝা গেল, জেনারেল, অপরজনকে এমনিতেই চিনতে পারল রানা—গোপন আস্তানায় একটা ক্যামিনি ফটোগ্রাফ দেখিয়েছিল আলম—লোকটা ব্রিগেডিয়ার আতিকুজ্জামান। প্রকাণ্ড একজোড়া ফুঁচোল গোঁফ, বাঘের মত রাগী একজোড়া চোখ, গোল মুখ, দোহারা গড়ন। বয়স পঞ্চাশের কোঠায়।

দরজায় চাবি লাগালেন ব্রিগেডিয়ার। রানা আশা করেছিল জেনারেল চলে যাবে তার নিজের অ্যাপার্টমেন্টে, কিন্তু না, সেও ঢুকল ব্রিগেডিয়ারের ঘরে। মিনিট পাঁচেক পায়চারি করল রানা। নাহ্, বেরোবার নাম নেই। আবার বাথরুমে ঢুকল রানা। দরজাটা সামান্য একটু ফাঁক করে দেখল, দুজন মুখোমুখি বসে দাবার ঘুঁটি সাজাচ্ছে একটা বোর্ডে। এই সেরেছে! ঝাড়া একটা ঘণ্টা লাগবে এক গেম শেষ হতেই। কয় গেম খেলবে আল্লাই মালুম। ব্রিগেডিয়ার সাদা ঘুঁটির চাল দিল—পন্ কিংস্ ফোর, জেনারেল দিল—নাইট কিংস্ বিশপ থ্রী।

ওরে সর্বনাশ! জেনারেলের বাচ্চাকে এখান থেকে ভাগাতে হবে, ভাবল রানা।

কিন্তু কি করে?

ঘড়ির দিকে চোখ যেতেই আরও একবার চমকে উঠল রানা। দ্রুত ফুরিয়ে আসছে সময়।

কি করে ভাগানো যায় ব্যাটাকে? কয়েকটা আজে-বাজে প্ল্যান এল মাথায়, কিন্তু সবগুলোকে বাতিল করে দিল সে। কোন ঝুঁকি নেয়া চলবে না। ব্রিগেডিয়ারকে



নিয়ে এখান থেকে বেরোতে হলে কোন রকম বিপদের ঝুঁকি নেয়া উচিত হবে না এখন।

বাথরুমের দিকে মুখ করে বসে ছিলেন ব্রিগেডিয়ার জামান। বাথরুমের দরজার ঠিক উল্টাদিকের দেয়ালে বেসিনের উপর বেশ বড়সড় আয়না রয়েছে একটা। নিঃশব্দে আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়াল রানা। লাক্স সাবান তুলে নিয়ে আয়নার কাচের উপর বাংলায় গোটা গোটা করে লিখল:

আমি বাংলাদেশ থেকে এসেছি।

জেনারেলকে বিদায় করুন।

এবার করিডরটা দেখে নিল একবার দরজা দিয়ে মাথা গলিয়ে। কেউ নেই করিডরে। বাইরে বেরিয়ে ব্রিগেডিয়ারের দরজায় দুটো টোকা দিয়েই আবার এসে বাথরুমে ঢুকল রানা।

জেনারেল উঠে দাঁড়িয়েছে ততক্ষণে, দরজা খুলতে যাচ্ছে সে। বাথরুমের দরজা ফাঁক করে মাথাটা ঢোকাল রানা পাশের ঘরে, এক আঙুল ঠোঁটের উপর রেখে এক মুহূর্তের জন্যে পেন্সিল টর্চের আলোটা ফেলল ব্রিগেডিয়ার জামানের চোখে। চমকে চাইলেন ব্রিগেডিয়ার। দরজা দিয়ে বেরিয়ে থাকা রানার মুখটা দেখলেন। রানার টর্চের আলো এখন আয়নার কাচের উপর। বিস্ময়ের ধাক্কা সামলাতে পারলেন না ব্রিগেডিয়ার। রানার ঠোঁটের উপর আঙুল থাকা সত্ত্বেও প্রায় অস্ফুট একটা শব্দ বেরিয়ে এল ওঁর মুখ থেকে। জেনারেল দরজা খুলে ফাঁকা করিডরে এদিক ওদিক চাইছিল, ঘুরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কি হলো, জামান?'

ততক্ষণে সামলে নিয়েছেন ব্রিগেডিয়ার। আয়নার উপরের লেখাটাও দেখে নিয়েছেন রানার টর্চের আলোয়।

'না, এমন কিছু নয়। সেই মাথার যন্ত্রণাটা। হঠাৎ করে বেড়ে ওঠে। কে এল? কেউ নেই বাইরে?'

'নাহ্। কেউ নেই। অথচ আমি স্পষ্ট···তুমি কি খুব খারাপ বোধ করছ, জামান?'

'না স্যার, ঠিক হয়ে যাবে। একটা ট্যাবলেট খেয়ে শুয়ে পড়লেই সেরে যাবে।'

'সেরে না উঠলে তো বিপদ হবে। কাল বিকেলে প্রেস কনফারেন্স, হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে তো চলবে না তোমার। ডাক্তারকে খবর দেব?'

'না, না! কোন দরকার নেই। প্রায়ই হয় এ রকম।' বাম হাতে মাথার পিছনটা চেপে ধরলেন ব্রিগেডিয়ার। 'ট্যাবলেট খেলেই সেরে যায়। এক ঘুম দিয়ে উঠলেই কাল সকালে একেবারে ফ্রেশ হয়ে যাব। ওপেনিংটা বেশ জমে উঠেছিল, কিন্তু—'

'তাতে কি আছে, কাল আবার বসা যাবে। তুমি ওষুধ খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ো। আমি চলি আজ।'

বেডরুমের দরজাটা ক্লিক করে লেগে যেতেই কিছু বলতে যাচ্ছিলেন
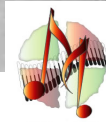
ব্রিগেডিয়ার, হাতের ইশারায় থামিয়ে দিল রানা। বেডরুমের দরজায় চাবি লাগিয়ে দিয়ে বাথরুমে নিয়ে এল সে তাঁকে। মাঝের দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে আলো জ্বেলে দিল বাথরুমের। বিস্মিত ব্রিগেডিয়ার মিলিটারি পুলিসের ইউনিফরম পরিহিত রানাকে আপাদমস্তক দেখলেন বার কয়েক, তারপর পরিষ্কার বাংলায় বললেন, 'কে তুমি? কি করছ এখানে?'

'আমার নাম আপাতত শরাফ আলী। বাংলাদেশ থেকে এসেছি মেজর জেনারেল রাহাত খানকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। উনি পাঠিয়েছেন আমাকে আপনার সাথে দেখা করতে।'

'তুমি এই শত্রুপুরিতে ঢুকলে কি করে? এই ইউনিফরমই বা পেলে কোথেকে?'

সংক্ষেপে দু'চার কথায় বলল রানা কি করে ঢুকেছে, কোথেকে ইউনিফরম পেয়েছে। সব শুনে ব্রিগেডিয়ার বললেন, 'অত্যন্ত রিস্কি ব্যাপার। গার্ডের অনুপস্থিতি কতক্ষণে টের পাবে এরা বুঝতে পারছি না। হয়তো আগামী পাঁচ মিনিটের মধ্যেই শিফট চেঞ্জ হওয়ার কথা—কে জানে! যাই হোক জলদি কথা সারতে হবে। কিন্তু এই বাথরুমে দাঁড়িয়ে কি কথা? ঘরে গিয়ে বসে...'

'ওই ঘরে কথা বলা যাবে না, স্যার। কাবার্ডের মধ্যে লুকানো মাইক্রোফোন আছে ও ঘরে।'

'কি আছে বললে? মাইক্রোফোন? তা তুমি জানলে কি করে?' অবাক হয়ে ভুরুজোড়া উঁচু করলেন ব্রিগেডিয়ার।

'আপনি ঘরে ঢুকবার আগেই আমি একবার ঘরটা পরীক্ষা করে দেখেছি।'

'আচ্ছা! এইজন্যেই আমাকে অন্যান্য সব অফিসারের সাথে মেলামেশার সুযোগ দিয়েছে! তাই ভাবছিলাম, হঠাৎ এমন উদার হয়ে উঠল কেন আমার দেহরক্ষীরা। কি জন্যে এসেছ বলে ফেলো। এতবড় বিপদের ঝুঁকি নিয়ে তোমার এখানে আসা ঠিক হয়নি। ধরা পড়লে কুকুরের মত গুলি করে মারবে এরা তোমাকে।'

'আপনাকে নিয়ে যেতে এসেছি আমি।'

'তার মানে লায়লার খবর পাওনি তোমরা এখনও?'

'না। সে নিখোঁজ।'

'তাহলে ফিরে গিয়ে মেজর জেনারেলকে জানাও— লায়লা নিখোঁজ হয়নি, শি ইজ অ্যারেস্টেড। আমাকে অনুসরণ করা হয়েছিল। লেটেস্ট খবর হচ্ছে, লায়লাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে গুজরাঁনওয়ালা ক্যাম্পে। ওরা কথা দিয়েছে, তার ওপর কোন অত্যাচার করা হবে না। আমি যদি এদের সাথে সহযোগিতা করি তাহলে অক্ষত অবস্থায় ফেরত দেওয়া হবে ওকে আমার কাছে। যদি না করি, তাহলে অন্যান্য সব মেয়ের ভাগ্যে যা ঘটছে, ঠিক তাই ঘটবে লায়লার ভাগ্যে।'

ভুরু কুঁচকে চিন্তা করল রানা কিছুক্ষণ। বলল, 'ওদের কথার এক কানাকড়িও



কি দাম আছে, স্যার?'

'বুঝতে পারছি তুমি কি বলতে চাও। কিন্তু ক্ষীণতম আশাও এখন আমার কাছে অনেক। নিজে পিতা না হলে তুমি বুঝতে পারবে না এই কথাটার তাৎপর্য। আমি সহযোগিতা করব বলে স্থির করেছি।' পরাজিত ভঙ্গিতে মাথা নিচু করলেন ব্রিগেডিয়ার।

'আপনার কাছ থেকে কি ধরনের সহযোগিতা চায় এরা?'

'আমাকে দিয়ে জঘন্য কতগুলো মিথ্যে কথা বলাতে চায় এরা প্রেস কনফারেন্সে। পাকিস্তানে আটক বাঙালীদের সম্পর্কে, বাঙালী সামরিক অফিসার ও জোয়ানদের সম্পর্কে, ভারতে আটক যুদ্ধবন্দীদের সম্পর্কে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে, শেখ সাহেবের নামেও মিথ্যা বলতে হবে আমাকে। আটক কোর্ট থেকে উদ্ধার পাবার জন্যে তিনি ভুট্টোকে কি কি কথা দিয়েছিলেন, সেসব সম্পর্কে এক মিথ্যা বানোয়াট সাজানো গল্প বলতে হবে আমাকে; বলতে হবে আলোচনার সময় আমি উপস্থিত ছিলাম। এমন কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ...'

'কিন্তু আমাকে ফিরে গিয়ে মেজর জেনারেলকে লায়লার সংবাদ দিতে বলছেন কেন? আপনি যাচ্ছেন না আমার সাথে?'

'না। তার চেয়ে আমার একটা চোখ উপড়ে নিয়ে যাও তুমি শরাফ আলী। মেয়েটাকে নেকড়ের মুখে ছেড়ে দিতে পারি না আমি।'

'তাকেও তো উদ্ধার করে আনতে পারি আমরা গুজরানওয়ালা থেকে?'

'যে মুহূর্তে এরা জানবে পালিয়েছি আমি, সেই মুহূর্তে খবর চলে যাবে গুজরানওয়ালায়, আমরা কিছু করার আগেই সর্বনাশ হয়ে যাবে লায়লার।'

দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরল রানা। ভাল মুসিবতেই পড়েছে সে। ব্রিগেডিয়ার উদ্ধার না পেলে দেশে ফিরতে পারছেন না মেজর জেনারেল রাহাত খান, আর লায়লা উদ্ধার না পেলে পালাতে পারছেন না ব্রিগেডিয়ার। বাহ্, চমৎকার! একটা জট ছাড়াতে গেলে বেধে যাচ্ছে আরেক জট। কিন্তু এখন আর ভাবনা চিন্তার কিছুই নেই।

'ঠিক আছে, আগের কাজ আগে,' বলল রানা। 'আপনাকে ছাড়া আমরা এদেশ ছাড়ছি না। কাজেই চললাম আমি গুজরানওয়ালায়। লায়লাকে বের করে এনে সিগন্যাল দেব আপনাকে।'

কয়েক সেকেণ্ড স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন ব্রিগেডিয়ার রানার চোখের দিকে। তারপর বললেন, 'কি দরকার, শরাফ আলী? আমার জন্যে নিজের জীবন বিপন্ন করতে যাবে কেন তুমি? আমাকে চেনো না, জানো না—কেন শুধু শুধু যাবে তুমি মরতে?'

মুচকে হাসল রানা। মনে ভাবল, 'মোরা একটি ফুলকে বাঁচাব বলে যুদ্ধ করি।' মুখে বলল, 'মরব না, স্যার। ধরে নিন, আগামী দুই ঘণ্টার মধ্যে মুক্ত হয়ে গেছে
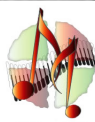
আপনার মেয়ে। হবেই। কিন্তু যেটা ভাবছি, সেটা হচ্ছে ঠিক সেই মুহূর্তে না হলেও কিছুক্ষণের মধ্যেই খবর পেয়ে যাবে এরা। সাথে সাথেই সাবধান হয়ে যাবে। তখন আপনার পক্ষে এখান থেকে পালানো কি করে সম্ভব হবে সেই প্ল্যান ঠিক করে নিতে হবে আমাদের এক্ষুণি।'

কিভাবে ব্রিগেডিয়ার বুঝতে পারবেন যে নায়লা নিরাপদে পালাতে পেরেছে, সেটা ঠিক করে নিতে অসুবিধে হলো না। গুজরানওয়ালার ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে প্রথম সুযোগেই ফোন করবে নায়লা ব্রিগেডিয়ারের নাম্বারে। তিনবার রিং হলে নামিয়ে রাখবে এক মিনিটের জন্যে। তারপর আবার ডায়াল করবে। দ্বিতীয়বার রিসিভার তুলবেন ব্রিগেডিয়ার। যেহেতু টেলিফোন ট্যাপ করা হবে আর্মি ইন্টেলিজেন্সের পক্ষ থেকে, সেহেতু কেউ কোন পরিচয় দেবে না। নায়লা বলবে, আমি মিসেস ফরমান আলীকে চাই, এটা কি সিভিল এভিয়েশন রিসেপশন কাউন্টার? ব্রিগেডিয়ার শুধু বলবেন, রঙ নাম্বার। এবং নামিয়ে রাখবেন রিসিভার।

এবার আলাপ হলো, নায়লার মুক্তির খবরটা পাওয়ার পর ব্রিগেডিয়ার কিভাবে পালাবেন সে সম্বন্ধে। রানার প্ল্যান শুনে চোখ কপালে উঠল ব্রিগেডিয়ারের। তারপর হাসলেন। বললেন, 'আশ্চর্য! অদ্ভুত রিসোর্সফুল ছেলে তো হে তুমি! দারুণ হয়েছে প্ল্যানটা! এবার ভরসা হচ্ছে, সত্যিই উদ্ধার করতে পারবে তুমি নায়লাকে। কিন্তু ওকে নিয়ে কোথায় যাবে—মানে, কোথায় মিট করছি আমরা? এগারটন রোডের সেই একতলা বাড়িটাতেই?'

'জি, স্যার।'

'ভাল কথা, এতক্ষণে মনে এল প্রশ্নটা—কেমন আছেন জেনারেল? আলম, কায়েস, আবরু?'

'ভাল আছে।'

'গুড। এবার মন দিয়ে শোনো। নায়লাকে যাতে সহজেই উদ্ধার করা যায় সেজন্যে তোমাকে গোটাকতক ডিরেকশন দিয়ে দিচ্ছি। আজ দুপুরে নিয়ে গিয়েছিল এরা আমাকে গুজরানওয়ালায় নায়লাকে নিজের চোখে দেখে আসার জন্যে—যাতে ওর যে কোন ক্ষতি হয়নি, সে ব্যাপারে নিঃসন্দেহ হতে পারি। কিভাবে উদ্ধার করবে সেটা তোমার নিজস্ব প্ল্যান মাফিক হবে, কিন্তু ঠিক কোথায় রাখা হয়েছে ওকে, সিকিউরিটি সেটাপটা কেমন, আমি এঁকে দেখিয়ে দিচ্ছি তোমাকে।' পাশের ঘরে গিয়ে কাগজ কলম নিয়ে এলেন ব্রিগেডিয়ার। পুরো এরিয়ার নক্সা এঁকে দেখিয়ে দিলেন কোথায় কি আছে। আশার আলো দেখতে পেয়ে রীতিমত উৎসাহিত হয়ে উঠেছেন তিনি। ভরসা ছেড়ে দিয়েছিলেন তিনি নায়লা গ্রেপ্তার হয়ে যাওয়ায়। এবার ছেলেমেয়ে সহ নিরাপদে বাংলাদেশে ফিরে যাওয়ার সুখ-কল্পনায় বিভোর হয়ে গেলেন তিনি।

ব্রিগেডিয়ারের বাথরুমের গরাদহীন জানালা গলে দুটো বিছানার চাদর আর



গোটা কয়েক দরজা জানালার পর্দা একসাথে গিঁঠ দিয়ে তৈরি দড়ি বেয়ে নেমে এল রানার রান্নাঘরের ছাতে। চাদরগুলো গুটিয়ে নেয়ার আগেই দেয়াল ডিঙিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল রানা রাতের অন্ধকারে।

রাত সাড়ে আটটা।

## এগারো

ডিব ডিব ডিব ডিব—ছুটে চলেছে ফাইভ হ্যাণ্ডরেড সি. সি. ট্রায়াম্ফ মোটর সাইকেল সত্তর মাইল বেগে। ভয় পেয়ে পথের দু'পাশে গমের খেতের মধ্যে থেকে ফুড়ুৎ করে উড়ে পালাচ্ছে এক আধটা নাম-না-জানা পাখি। হেড লাইটের উজ্জ্বল আলোর আকর্ষণে অসংখ্য ছোট ছোট পতঙ্গ উড়ে এসে বুলেটের বেগে লাগছে আরোহীর মুখে, কপালে, হাতে। ছুটে চলেছে রানা গুজরানওয়ালার পথে। আড়াই পঞ্চাশ মাইল।

রাত নয়টা পাঁচ।

চমৎকার রাস্তা। পাকা মেঝের মত মসৃণ। নিজের দেশের রাস্তাগুলোর কথা মনে হলো রানার। রাতের বেলা মোটর সাইকেল ঘণ্টায় ত্রিশ মাইলের বেশি চালাবার মত রাস্তা একটাও নেই। কেন? সেই একই উত্তর। বাংলাদেশের টাকা শুষে এনেই এদের সমৃদ্ধি। এদের এই সমতল রাস্তায় শুয়ে আছে বাংলাদেশের টাকা।

পোকাগুলো মহা জ্বালাতন লাগিয়ে দিয়েছে। বিশেষ করে আধ ইঞ্চি লম্বা হেলিকপ্টারের মত দেখতে পোকাগুলোর গা বড় শক্ত। একেবারে টিভড়ু। কিন্তু হারামী হচ্ছে সবুজগুলো—গায়ে কালো ফোঁটা। দেখতে পিচ্চি হলে কি হবে, ইউনিফর্মের ভিতর ঢুকে যেখানে সুযোগ পাচ্ছে, কামড় বসিয়ে দিচ্ছে কুটুটুশ করে। ছটফটিয়ে উঠছে রানা।

রাস্তা পার হতে গিয়ে থমকে দাঁড়াচ্ছে খেঁক শেয়াল, জ্বলজ্বলে চোখে তাকাচ্ছে রানার দিকে, তারপর দ্রুত নেমে যাচ্ছে রাস্তা ছেড়ে ঝোপ-ঝাড় বা গমের খেতে।

হু-হু হাওয়ায় কানে কিছু শুনতে পাচ্ছে না রানা। নাইট গ্লাসের কাচ ভেদ করে দৃষ্টি রাস্তার উপর নিবদ্ধ। স্থির। রানা ভাবছে মেজর জেনারেল কিংবা আলমকে একটা খবর দিয়ে আসা উচিত ছিল। আরও ভাবছে, চেনা নেই জানা নেই, ব্রিগেডিয়ারের একটা চিঠি পর্যন্ত নেই—ওর সাথে আসবে তো নায়লা? ফ্যামিলি ফটোগ্রাফে দেখা চেহারাটা মনের পর্দায় উজ্জ্বলতর করে নেয়ার চেষ্টা করল রানা। যদি অন্য ঘরে ওকে সরিয়ে দেয়া হয়ে থাকে চিনে বের করতে পারবে তো সে?

যতদূর মনে পড়ছে, অপূর্ব সুন্দরী, বামদিকে চিবুকে তিল আছে, আয়ত দুই চোখে বেপরোয়া ঔদ্ধত্য···পুরুষ শাসিত সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে নারীর সম-অধিকার ও মর্যাদা আদায় করে নেয়ার শপথ। শুনেছে ভাল ছাত্রী, ইকনমিক্সে বি. এ. অনার্স পড়ছিল পাঞ্জাব ইউনিভারসিটিতে। আলমের চাচাত বোন। ওর সাথে কিছু ভজঘট থাকাও বিচিত্র নয়। মেয়েটার মা পাঞ্জাবী। জন্ম ও লালন-পালন পাঞ্জাবেই। বাপ বাঙালী। ওর আনুগত্য কাদের প্রতি? বাঙালী না···

একটা আধমন ওজনের মোটাসোটা গুবরে পোকা সোজা এসে খটাং করে গোঁত্তা খেল রানার কপালে সত্তর মাইল স্পীডে। বাপ-মা তুলে গাল দিল রানা নিরীহ পোকাটাকে। চিন্তার সূত্রটা ছিঁড়ে গেল।

লাহোর থেকে গুজরানওয়ালার পথে একমাত্র বড় শহর কামোক। সোয়া নয়টাতেই প্রায় ঘুমিয়ে পড়েছে শহরটা। শুধু একটা রাস্তায় সিনেমার শো ভাঙার ব্যস্ততা। সযত্নে পুলিস ফাঁড়ি এড়িয়ে আবার উঠে এল রানা হাইওয়েতে। গুজরানওয়ালা আর পনেরো মাইল।

রাত সোয়া নয়টা।
স্পেশাল অফিসারস্ কোয়ার্টারের সিকিউরিটি-ইনচার্জের ছোট্ট অফিস কামরা। সাউণ্ড-প্রুফ ঘর। একটা শেডবিহীন দুশো পাওয়ারের বাল্ব জ্বলছে মাথার উপর। একটা টেবিলে পাশাপাশি ছয়টা ডিকটাফোন। নীরবে ঘুরছে স্পুলগুলো ধীর গতিতে। ইজি চেয়ারে শুয়ে চোখ বুজে সিগারেট ফুঁকছে আর্মি ইন্টেলিজেন্সের ক্যাপ্টেন ফরহাদ।

একটা ডিকটাফোনে রিপ্লে হচ্ছে। হঠাৎ চোখ খুলল ক্যাপ্টেন ভুরু কুঁচকে। কান খাড়া করল। ব্রিগেডিয়ার জামানের কণ্ঠস্বর হুবহু রেকর্ড হয়েছে টেপে—কে তুমি? কি করছ এখানে?

অপরিচিত একটা কণ্ঠস্বর শোনা গেল—আমার নাম আপাতত শরাফ আলী। বাংলাদেশ থেকে এসেছি মেজর জেনারেল রাহাত খানকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। উনি পাঠিয়েছেন আমাকে আপনার সাথে দেখা করতে।

তড়াক করে উঠে দাঁড়াল ক্যাপ্টেন। ব্রিগেডিয়ার তখন জিজ্ঞেস করছেন— তুমি এই শত্রুপুরিতে ঢুকলে কি করে?

এই ইউনিফরমই বা···ঝাঁপিয়ে পড়ল ক্যাপ্টেন টেলিফোনের উপর।

'হ্যালো, ক্যাপ্টেন ফরহাদ স্পিকিং। পুট মি টু কর্নেল মুজাফফর খান। আর্জেন্ট।'

আধ মিনিটের মধ্যেই কর্নেলের খনখনে গলা শোনা গেল, 'ইয়েস, ফরহাদ, হোয়াটস্ ইট?'

'স্ট্রেঞ্জ কিছু রেকর্ডিং হয়েছে স্যার ব্রিগেডিয়ার জামানের ঘর থেকে। কি



ব্যাপার এখনও জানি না। জাস্ট হোল্ড অন প্লীজ, আমি রিওয়াইণ্ড করে সেট করে দিচ্ছি ডিকটাফোন, লিসন ইট ইয়োরসেলফ, ডায়রেক্ট।' একটা বোতাম টিপে পিছনে নিয়ে গেল ক্যাপ্টেন টেপটা, আবার চালু করে দিল। তারপর রিসিভারটা অ্যামপ্লিফায়ারের সামনে নামিয়ে রেখে টিপ দিল ইন্টারনাল কমিউনিকেশন সেটের লাল বাটন। বলল, 'মাহতাব, এক্ষুণি চারজন সশস্ত্র গার্ড পাঠিয়ে দাও ব্রিগেডিয়ার জামানের কামরার সামনে। বাকি সবাইকে অ্যালার্ট করে দাও।'

ধাতব কণ্ঠস্বর ভেসে এল ইন্টারকমের মাধ্যমে, 'ঘরের ভিতর ঢুকতে বলব, স্যার?'

'না,' বলল ক্যাপ্টেন। 'পরবর্তী আদেশের জন্যে অপেক্ষা করতে বলো দরজার সামনে।'

টেবিলের কাছে ফিরে এল ক্যাপ্টেন। কর্নেল হয়তো কোন নির্দেশ দিতে পারে মনে করে রিসিভারটা কানে লাগিয়ে ধরে থাকল। ঠিকই। ইউনিফরমের কাহিনী শুনেই কর্নেল বলল, 'খোঁজ নাও।'

আবার ইন্টারকমে আদেশ দিল ফরহাদ। লুকানো মাইক্রোফোনের গল্প হচ্ছে তখন ডিকটাফোনে। হাসল ফরহাদ। ব্যাটা ঘুণাক্ষরেও টেরও পায়নি বাথরুমের শাওয়ারের মধ্যে লুকানো মাইক্রোফোনটার কথা। মন দিয়ে শুনে যাচ্ছে সে কথোপকথন। চোখ দুটো বিস্ফারিত। কথাগুলো কতক্ষণ আগের? পাওয়া যাবে এখন শরাফ আলীকে ওই ঘরে? মনে মনে হিসেব করে দেখল, আশা কম। প্রায় পোনে এক ঘণ্টা আগে এইসব কথাবার্তা হয়েছে ওদের ওই বাথরুমের মধ্যে।

রানা বলছে—লায়লা বলবে, আমি মিসেস ফরমান আলীকে চাই। এটা কি সিভিল এভিয়েশন রিসেপশন কাউন্টার? আপনি শুধু 'রঙ নাম্বার' বলে নামিয়ে রাখবেন রিসিভার।

মাথা নেড়ে প্রশংসা সূচক ভঙ্গি করল ক্যাপ্টেন ফরহাদ। এতক্ষণে বেশ খানিকটা আশ্বস্ত হয়েছে সে কথাবার্তা শুনে। হিসেব করে দেখেছে, শরাফ আলীর পক্ষে এতটুকু সময়ে গুজরানওয়ালায় পৌঁছে লায়লাকে মুক্ত করে ব্রিগেডিয়ারকে জানানো সম্ভব নয়। তার মানে, খাঁচার মধ্যে রয়েছে এখনও ব্রিগেডিয়ার জামান। কর্নেল চেষ্টা করলে হয়তো এখানে বসেই অ্যারেস্ট করতে পারবেন শরাফ আলীকে গুজরানওয়ালায় সবাইকে সতর্ক করে দিয়ে। সেখান থেকে যদি ফসকে যাও, এয়ারপোর্টরোডে তো আসতেই হবে বাছা। তাছাড়া মিলিটারি পুলিসের ইউনিফরম দেখিয়েও ঘোল খাওয়াতে পারবে না আমাদের। আমরা জেনে গেছি সব। কাজেই ধরা তোমাদের পড়তেই হবে মিস্টার আপাতত শরাফ আলী।

'হুম।' কর্নেল মুজাফফরের কণ্ঠস্বর ভেসে এল। 'আমি আসছি এক্ষুণি। বাথটাবে পাওয়া গেছে গার্ডকে?'

'জ্বি, স্যার। এখনও জ্ঞান ফেরেনি।'
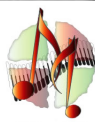
'ঠিক আছে, তুমি গুজরানওয়ালার গার্ডদের হুঁশিয়ার করে দাও। এম. পি. ইউনিফরমের কথাও বলবে। আমি রওনা হচ্ছি, পৌঁছে যাব দশ মিনিটেই।'

গুজরানওয়ালা ক্যাম্পের আর্মি ক্যাপ্টেন সাঈদকে চেনে ফরহাদ। কিন্তু তাকে পাওয়া গেল না। নিশ্চয়ই কোন সুন্দরী যুবতীর ঘরে মজা লুটছে। ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল ফরহাদ—কপাল! যত খুশি, যেটা খুশি···উফ্! শুধু পছন্দ করে বেছে নেয়ার অপেক্ষা। আল্লাহ যাকে দেয়, একেবারে অঢেল দেয়, ছাপ্পড় ফেড়ে! সন্ধের পর ব্যাটাকে পাওয়া যাবে কেন? নিশ্চয়ই এখন সেন্ট মেখে ফুরফুরে জামা গায়ে দিয়ে, সাঈদ মিঞা···না, এ নিয়ে দুঃখ করে না সে। বেচায়েন মনটা স্থির করে নিয়ে অল্প দু'চার কথায় ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিল সে সেকেণ্ড অফিসারকে।

ঠিক দশ মিনিটেই এসে পৌঁছল কর্নেল। মুখটা চিন্তিত, একটু যেন উদ্বিগ্ন। ক্যাপ্টেনের অভিবাদন গ্রহণ করে বসল সে ইজিচেয়ারে। বলল, 'শরাফ আলী লোকটা সত্যিই রিসোর্সফুল। এই একটু আগে খবর পেলাম, আরেকজন এম. পি.কে পাওয়া গেছে একটা ঝোপের মধ্যে অজ্ঞান অবস্থায়। জ্ঞান ফিরে পেয়েছে সে অল্পক্ষণ হলো। তার বক্তব্য স্পেশাল মেসেজ নিয়ে যাচ্ছিল এয়ারপোর্টে আটটা পঁয়ত্রিশ কি চল্লিশের দিকে। রাস্তায় একজন পাঞ্জাবী এম. পি. হাতের ইশারায় থামতে বলল। মোটর সাইকেলটা স্ট্যাণ্ডে তুলে পিছন ফিরবার আগেই মাথার পিছনে প্রচণ্ড আঘাত খেয়ে জ্ঞান হারায়। মোটর সাইকেলটা পাওয়া যাচ্ছে না।'

'তাহলে···তাহলে কি স্যার ওটা নিয়েই রওনা হয়েছে?' চট করে ঘড়ির দিকে চাইল ক্যাপ্টেন ফরহাদ। সাড়ে নয়টা বাজে। তাহলে কি পৌঁছে গেছে লোকটা?

'সন্দেহ নেই। কিন্তু এতে ঘাবড়াবার কিছুই নেই ফরহাদ। কোন চিন্তা কোরো না, ধরা পড়ে যাবে। দাও, টেলিফোনটা দাও এদিকে।'

সরাসরি ডায়াল করল কর্নেল গুজরানওয়ালা ক্যাম্পের একটি বিশেষ নম্বরে। সাড়ে তিনশো বাঙালী মেয়ের চার্জে রয়েছে পাকিস্তান কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের নিষ্ঠুরতম স্ত্রী-এজেন্ট শাকিলা।

'মিস্ শাকিলা মির্জা বলছেন?···আচ্ছা, ব্যাপারটা শুনেছেন তাহলে?···না, না, দেরি নেই, এতক্ষণে প্রায় পৌঁছে গেছে শরাফ আলী, মোটর সাইকেলে রওনা হয়েছিল।···হ্যাঁ, লায়লাকে সরিয়ে ফেলতে হবে।···কে গেছে ওর ঘরে? ও, আচ্ছা।···ঠিক আছে। কিন্তু খুব সাবধান মিস মির্জা, এই লোকটা খুব ডেঞ্জারাস্। আচ্ছা, রাখলাম।'

আপন মনে মুচকি হাসল কর্নেল মুজাফফর। তারপর ডাকল ফরহাদকে, 'চলো হে, সাক্ষাৎ করা যাক মহামান্য ব্রিগেডিয়ার আতিকুজ্জামানের সাথে।'

আশা নিরাশায় দুলছেন ব্রিগেডিয়ার জামান। প্রতিটা মিনিট, মিনিট তো নয়, যেন এক একটা যুগ। সময় কাটিতে চাইছে না কিছুতেই। দুঃসাহসী ছেলেটা চলে যেতেই থমকে দাঁড়িয়েছে সময়। রাজ্যের আশঙ্কা আর দুশ্চিন্তা এসে ভর করতে চাইছে কাঁধে।

পারবে তো ছেলেটা? যদি ধরা পড়ে যায়, তাহলে লায়লার ভাগ্যে বিড়ম্বনা কি তীব্রতর হবে না? আর কোন আশা ভরসা থাকবে?

অবশ্য শরাফ আলীর কথাই ঠিক। এদের কথার এক কানাকড়ি মূল্যও নেই। এরা কথা দিয়েছে ঠিকই, দুপুর বেলা নিজের চোখেই দেখে এসেছেন, কথার হেরফের করেনি। কিন্তু এক্ষুণি এই মুহূর্তে লায়লার উপর নির্যাতন করা হচ্ছে না এমন কথা নিশ্চয় করে বলা যায়? আজ রাতে যদি ওর উপর পাশবিক অত্যাচার করা হয় জানতে পারার উপায় আছে কিছু? কাল কনফারেন্সের আগে লায়লার সাথে দেখা করার কোন উপায় নেই।

কাজেই ভালই হয়েছে। যদি কপাল ভাল হয়, বেঁচে যাবে মেয়েটা; যদি কপাল মন্দ হয়, এমনিতেও বাঁচত না, ওমনিতেও না। এ নিয়ে ভেবে লাভ নেই, যা হবার হবে। খোদা, যেন ভালটাই হয়!

মনকে নানাভাবে প্রবোধ দিচ্ছেন ব্রিগেডিয়ার, কিন্তু ছটফটানি কমছে না কিছুতেই। ন'টা, সোয়া ন'টা, সাড়ে ন'টা···ভিতর ভিতর অস্থির হয়ে উঠছেন ব্রিগেডিয়ার। শুয়ে, বসে, দাঁড়িয়ে, কোনভাবেই শান্তি পাওয়া যাচ্ছে না। বার বার চোখ যাচ্ছে টেলিফোনের উপর। জানালার পাশে গিয়ে দাঁড়াচ্ছেন, দরজায় এসে কান পাতছেন, ফিরে যাচ্ছেন বিছানায়, আবার উঠে এসে বসছেন সোফায়—কোথাও স্বস্তি নেই। বহুবার হিসেব করে দেখেছেন উনি, শরাফ আলী যদি এই পঞ্চাশ মাইল গাড়িতে যায় তাহলে দশটা নাগাদ ফোন পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। এর আগে কিছুতেই সম্ভব নয়। ট্রেনে গেলে আরও অনেক দেরি হবে। দশটা থেকে ভোর পাঁচটার মধ্যেই আসবে ফোন, যদি আসে। আর যদি আগেই ধরা পড়ে যায়, তাহলে কোনদিনই আসবে না ফোন।

পনেরো মিনিট আগেই এল ফোন। ঠিক পোনে দশটায়। শুয়ে ছিলেন, প্রায় আঁৎকে উঠে বসলেন ব্রিগেডিয়ার। থাবলা মেরে তুলে নিতে যাচ্ছিলেন রিসিভার, হঠাৎ মনে পড়ল, তিনবার বেজে থেমে যাওয়ার কথা।

একবার বাজল, দু'বার বাজল বুকের মধ্যে হাতুড়ি পিটছে ব্রিগেডিয়ার জামানের। তিনবার বাজল। উৎকর্ণ হয়ে অপেক্ষা করছেন ব্রিগেডিয়ার। থেমে গেছে রিং। খুশিতে নাচতে ইচ্ছে করছে তাঁর। হাত-পা কাঁপছে থরথর করে।

তাহলে কথা রেখেছে ছেলেটা। লায়লা এখন মুক্ত! নিজের কানকেও বিশ্বাস করতে ভরসা হচ্ছে না। কিন্তু, আবার বাজবে তো?

বেজে উঠল টেলিফোন। গোক্ষুর সাপের মত ছোবল দিয়ে তুলে নিলেন ব্রিগেডিয়ার রিসিভারটা। আশায়, আনন্দে দম বন্ধ হয়ে আসতে চাইছে ওঁর।

'আমি মিসেস ফরমান আলীকে চাই। এটা কি সিভিল এভিয়েশন রিসেপশন
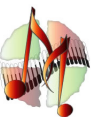
কাউন্টার?'

কোন উত্তর দিতে পারছেন না ব্রিগেডিয়ার। দুর্বল লাগছে হাঁটু দুটো, মনে হচ্ছে এক্ষুণি পা ভাঁজ হয়ে পড়ে যাবেন। প্রশ্নটা উচ্চারিত হয়েছে খনখনে কর্কশ এক পুরুষ কণ্ঠস্বর থেকে। ব্রিগেডিয়ার চেনেন ওকে—ও হচ্ছে আর্মি ইন্টেলিজেন্সের পিশাচ, কর্নেল মুজাফফর খান। নিশ্চয়ই ধরা পড়েছে ওরা! কিছু ভাবতে পারছেন না ব্রিগেডিয়ার, ঝাপসা হয়ে আসছে সবকিছু চোখের সামনে। হাত থেকে খসে পড়ে গেল রিসিভারটা।

দুই মিনিট পরেই টোকা পড়ল দরজায়। জোরে।

হতাশ, ভগ্নোদ্যম ব্রিগেডিয়ার খুলে দিলেন দরজা। ঘরে ঢুকল কর্নেল মুজাফফর, পিছনে ক্যাপ্টেন ফরহাদ, তার পিছনে চারজন সশস্ত্র গার্ড।

'এই যে, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল্র, রঙ নাম্বার বললেন না?' একগাল দেঁতো হাসি হেসে বলল কর্নেল। এগিয়ে এল কাছে। চকচক করছে নীল দুই চোখ।

জবাব দিলেন না ব্রিগেডিয়ার। ঠায় দাঁড়িয়ে রইলেন চুপ করে। এরপর কি? নিশ্চয়ই কোন জেলখানার সেল। এরা কতদূর কি জানে বোঝা যাচ্ছে না। যতদূর মনে হচ্ছে ধরা পড়েছে শরাফ আলী। কিন্তু একা না লায়লা সহ? আর সবার অবস্থা কি? সবাই ধরা পড়েছে?

'আমাদের দ্রুত কয়েকটা কথা সেরে নিতে হবে ব্রিগেডিয়ার,' বলল কর্নেল। 'আশা করি আপনার সহযোগিতা থেকে বঞ্চিত হব না।'

'আমার সহযোগিতার উপর খুব একটা নির্ভর করছেন বলে মনে হয় না।' নীল চোখের উপর স্থির হলো ব্রিগেডিয়ারের বাঘের চোখ।

'তা ঠিক,' বলল কর্নেল। 'যতক্ষণ আপনাকে লায়লা সম্পর্কে ফ্যান্টাসীর মধ্যে রাখা সম্ভব ছিল, ততক্ষণ আমরা আশা করেছিলাম আপনার সহযোগিতা। কিন্তু এখন পাল্টে গেছে পরিস্থিতি। মেজর জেনারেল রাহাত খানের পলায়নের ব্যাপারে আপনার ভূমিকা সম্পর্কে আমাদের আর কোন সন্দেহ নেই। এক্সপোজড হয়ে গেছেন আপনি। আপনার কাছ থেকে আমরা আর কোন সাহায্য আশা করি না। প্রেস কনফারেন্সে যা-তা বলে বসতে পারেন—সেই ঝুঁকি আমরা আর নেব না। এখুনি আপনাকে নিয়ে যাওয়া হবে দুর্ভেদ্য এক কারাগারের নিভৃত সেলে।'

'অর্থাৎ আমার আর কোন প্রয়োজন নেই?'

'ঠিক ধরেছেন। তবে একেবারে প্রয়োজন নেই তা বলব না। আপনার কাছ থেকে কিছু খবর বের করার ব্যাপারে আপনাকে আমাদের প্রয়োজন হবে।'

'লায়লার কি হবে?'

'কি হবে জিজ্ঞেস না করে জিজ্ঞেস করুন, কি হচ্ছে।' হাসল কর্নেল। 'একটু আগে ফোন করে জানতে পারলাম, ওর ঘরে এখন ক্লান্তি দূর করছে ক্যাপ্টেন সাঈদ। আশাকরি তারই কাটছে লায়লার একাকী সময়।'



আবার কাজ করতে শুরু করেছে ব্রিগেডিয়ারের মস্তিষ্ক। এ কথার মানে লায়লা পালাতে গিয়ে ধরা পড়েনি। আরও কথা বের করতে হবে। বললেন, 'এই কি আপনাদের প্রতিজ্ঞা রক্ষার নমুনা? আপনারা বলেছিলেন লায়লার গায়ে···'

'বলেছিলাম। কিন্তু আপনিই বা আপনার কথা কতটুকু রেখেছেন? আগেই সন্দেহ করেছিলাম, কিন্তু এখন নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া গেছে আপনার বিশ্বাসঘাতকতার। বিশ্বাসঘাতকের সাথে আবার অঙ্গীকার কি?'

'প্রশ্নটা উল্টে আমিও তো জিজ্ঞেস করতে পারি? আপনারা সাড়ে সাত কোটি মানুষের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। কে বড় বিশ্বাসঘাতক, আমি, না আপনারা?'

'শাট আপ!' গর্জে উঠল কর্নেল। 'নিমক হারাম! গোক্ষুর সাপও লজ্জা পাবে আপনাকে দেখে। ছোবলের পর ছোবল দিয়ে চলেছেন আপনি আমাদের বুকে, আমাদেরই দুধ কলা খেয়ে। এবার আমাদের পালা। আপনি কি মনে করেছেন শরাফ আলী গিয়ে মুক্ত করে নিয়ে আসবে আপনার মেয়েকে? এতই সহজ? সবাইকে অ্যালার্ট করে দিয়েছি আমরা। এতক্ষণে নিশ্চয়ই ধরা পড়েছে সে ক্যাম্পে ঢোকার চেষ্টা করতে গিয়ে। এবার আপনার ব্যবস্থা করেই যাচ্ছি আমরা এপারটন রোডে বাকি সব ক'টাকে জালে গুটিয়ে তুলতে। চমৎকার গেট-টুগেদার হবে যাহোক।'

এবার আবার গুলিয়ে গেল ব্রিগেডিয়ারের মাথাটা। এদের কথা শুনে বোঝা যাচ্ছে শরাফ আলী ধরা পড়েনি এখনও। তাহলে? তাহলে এরা সব কথা জানল কি করে? আর কেউ ধরা পড়ল? আলম? কিন্তু আলমের তো এসব তথ্য জানবার কথা নয়? তাহলে কি মাইক্রোফোন? সবকিছু পরিষ্কার হয়ে গেল ওঁর কাছে। নিশ্চয়ই বাথরুমেও মাইক্রোফোন ছিল। যাই হোক, মোটকথা কি দাঁড়াচ্ছে? দলের কেউই ধরা পড়েনি এখনও। সবাইকে সাবধান করে দেয়ার পর গুজরানওয়ালা ক্যাম্প থেকে লায়লাকে উদ্ধার করা এখন প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। তবু বলা যায় না। ছেলেটার উপর কেমন অদ্ভুত এক বিশ্বাস জন্মে গেছে তাঁর। হয়তো···

'মেজর জেনারেল রাহাত খান কোথায়?' প্রশ্ন করল কর্নেল মুজাফফর। 'এপারটন রোডে?'

'ওই নামে কাউকে চিনি না আমি।'

ঠাশ্ করে চড় পড়ল ব্রিগেডিয়ারের গালে। বাঁ হাত দিয়ে গালটা চেপে ধরলেন তিনি। দুই চোখে ঘৃণা।

'কর্নেল এহসান কে?' আবার প্রশ্ন।

'জানি না।'

এবার ডান গালে চড় পড়ল। ব্যথায় পানি বেরিয়ে এল চোখ থেকে।

'আমরা জানি আমাদের মধ্যে কেউ বিশ্বাসঘাতকতা করছে। কে সে?'

'নির্যাতন করে আমার কাছ থেকে একটি কথাও বের করতে পারবেন না, কর্নেল।'

'ঠিক আছে, সে দেখা যাবে। ফরহাদ তুমি মহামান্য অতিথিকে নিয়ে জিপে ওঠো। আমি আসছি।'

দু'জন গার্ড ধরল ব্রিগেডিয়ারের দুই হাত। হ্যাঁচকা টানে চলে গেলেন তিনি চৌকাঠের কাছে। টানতে টানতে নিয়ে চলল ওরা ওকে। চার কদম গিয়েই থমকে দাঁড়ালেন ব্রিগেডিয়ার। টেলিফোন বেজে উঠেছে সাতাশি নম্বর অ্যাপার্টমেন্টে। পিছনের ধাক্কায় এগিয়ে গেলেন উনি আরও দুই পা। সমস্ত মনোযোগ একত্রীভূত হয়েছে ওঁর টেলিফোনের ঝনঝন শব্দটার উপর।

তিনবার বেজে থেমে গেল ফোনটা।

লাফিয়ে উঠল কলজেটা বুকের ভিতর। কোনকিছু আশা করতেও ভরসা হচ্ছে না। তবে কি···তবে কি···!

টেনে নিয়ে গিয়ে লিফটে ওঠানো হলো ব্রিগেডিয়ারকে। ওঁর জন্যে অপেক্ষা করছে নির্মম নির্যাতন, আর মৃত্যু। সড়সড় করে নামছে লিফট নিচের দিকে। তলিয়ে যাচ্ছেন ব্রিগেডিয়ার জামান।

## বারো

শুয়ে শুয়ে আকাশ পাতাল ভাবছে লায়লা জামান।

একই কথা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ভাবছে সে বারবার। দুশ্চিন্তায় ছেয়ে রয়েছে মন। কিছুতেই কোন মীমাংসায় পৌছানো যাচ্ছে না।

কি হবে শেষ পর্যন্ত আব্বার? কি হবে ওর নিজের? আব্বা কি বিশ্বাস করেছে ওদের কথা? আব্বা কি জানে না, ওরা সন্দেহ করেছে আটক কোর্ট থেকে মেজর জেনারেল রাহাত খানের উধাও হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে ওঁর হাত আছে? আব্বা কি মনে করেছে, এক পাকিস্তানের কথা স্বীকার করে মুক্তি লাভ করেছিলেন শেখ সাহেব, কিন্তু মুক্তি পাওয়ার পরই পাল্টে ফেলেছেন বুলি, কথার খেলাপ করেছেন, ইত্যাদি বললেই ওঁকে ছেড়ে দেবে এরা? মুক্তি দেবে তাঁর মেয়েকে?

অসম্ভব!

মনে মনে পরিষ্কার জানে লায়লা, এই বন্দী শিবির থেকে মুক্তি নেই ওর। আজই সন্ধ্যায় শাকিলা মির্জার সাথে এসেছিল এক কামুক আর্মি ক্যাপ্টেন পরিচয় করার ছলে। লোলুপ দৃষ্টিতে সারা গা চাটছিল যেন লোকটা। ঘেন্নায় রি-রি করে উঠেছিল লায়লার সর্বশরীর। ও জানে, আজ হোক, কাল হোক, আসবে লোকটা,



আসবেই। এর লালসার হাত থেকে রেহাই নেই ওর। কেবল এই ক্যাপ্টেন কেন, আরও আসবে লোক—সকালে, দুপুরে, বিকেলে, সন্ধ্যায়, রাতে, একজনের পর আসবে আরেকজন।

নিজেকে কুমারী বলে দাবি সে করে না। পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটির কোন এনলাইটেনড্ ছাত্রীর পক্ষেই কুমারী থাকা সম্ভব নয়। সেটা আনস্মার্ট, অশোভন, আনকালচার্ড। সেক্সকে স্পোর্ট হিসেবে নেয়াই এখানকার রীতি। খেলার ছলে বার কয়েক অভিজ্ঞতা হয়েছে ওর। আনন্দের চেয়ে বাহাদুরীর ভাবটাই বেশি—পুরুষদের দেখানো, দেখো তোমাদের চেয়ে কম যাই না আমরা। কিন্তু তাই বলে এরকম পাইকারী ধর্ষণ?

শুনেছে সে এইসব ধরে আনা বাঙালী মেয়েদের কথা, আহা-উহ্ করেছে, কিন্তু স্বপ্নেও ভাবেনি, ওকেও এখানে ধরে এনে পাশবিক অত্যাচার করা হতে পারে। ব্যাপারটা নিজের কাছে যতই পরিষ্কার হচ্ছে, ততই হাহাকার করে উঠছে বুকের ভিতরটা। ভয়ে শুকিয়ে আসছে অন্তরাত্মা। যে খোদাকে কার্লমার্ক্সের ভক্ত হবার পর থেকে গত চার পাঁচটা বছর ডাকেনি একটি বারও, তাকেই ডেকে ফেলেছে সে আজ বেশ কয়েকবার লজ্জার মাথা খেয়ে। ডাকতে গিয়ে নিজের কাছেই ছোট মনে হয়েছে নিজেকে; অপমানে লাল হয়ে গেছে কান। ঈশ্বর, ধর্ম, ইত্যাদি হচ্ছে এক্সপ্লয়টেশনের হাতিয়ার, সর্বহারা মেহনতী মানুষকে আফিম খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখার কৌশল, এসব কথা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে লায়লা। কিন্তু কে জানে, সত্যিই যদি অলৌকিক কিছু থেকেই থাকে? ডেকে দেখতে ক্ষতি কি? যদি সাহায্য পাওয়া যায়। আর কিছুর উপর তো ভরসা নেই এখন।

বুক কাঁপানো চিৎকার ভেসে আসছে দোতলার কোন একটা ঘর থেকে। বোধহয় সেই তেরো বছরের মেয়েটা!

আসলে ভয় পেয়েছে লায়লা। আব্বার পক্ষে সাহায্য করা অসম্ভব। আজ দুপুরেই টের পেয়েছে সে ওর আব্বার অসহায়ত্ব। কিছু সাহায্য করতে পারলে পারত একমাত্র আলম ভাইয়া। কিন্তু সে বেচারা অসুস্থ শরীর নিয়ে সামলাবে কতদিক? তাছাড়া খবর বের করতে পারলে তো সাহায্যের প্রশ্ন ওঠে। অত্যন্ত গোপনে পাচার করা হয়েছে ওকে এখানে, কারও খোঁজ পাওয়ার কথা নয়। সে-সব ভরসা করে লাভ নেই।

আচ্ছা নিজে চেষ্টা করে দেখবে?

ঘরের চারদিকে চোখ বুলাল লায়না। জানালার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। গরাদ নেই।

কিন্তু তেতলার জানালা দিয়ে নিচে নামা ওর পক্ষে অসম্ভব। সরু কার্নিস বেয়ে দশ হাত দূরে পাইপের কাছেই পৌছতে পারবে না সে, পাইপ বেয়ে নামা তো দূরের কথা। জানালার ধারে দাঁড়িয়ে নিচের দিকে তাকাতেই ঘুরে উঠতে চাইছে
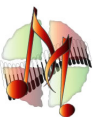
মাথাটা, এক ফুট চওড়া কার্নিসের উপর দিয়ে হাঁটছে ভাবতে গিয়েই জোর পাচ্ছে না হাঁটুতে, কাঁপছে পা। নাহ, এদিক দিয়ে অসম্ভব। কিন্তু দরজা দিয়ে বেরিয়ে সিঁড়ি বেয়ে যে নেমে যাবে সেটাও অসম্ভব। প্রথমত, দরজা দুটোই বাইরে থেকে বন্ধ। দ্বিতীয়ত, বারান্দায় টহল দিচ্ছে প্রহরী। তৃতীয়ত, তেতলা-দোতলা-একতলা প্রত্যেকটি সিঁড়ির গোড়ায় মোতায়েন রয়েছে সশস্ত্র গার্ড। এবং চতুর্থত, পুরো এলাকাটা দিনে রাতে চব্বিশ ঘন্টা পাহারা দিচ্ছে ছয়জন গার্ড। জেলখানার মত দুর্ভেদ্য এই বন্দীশিবির।

এটা একটা কলেজ ছিল। যুদ্ধের সময় জরুরী অবস্থার দোহাই দিয়ে দখল করে নিয়েছিল আর্মি, এখনও ছাড়েনি। শহর থেকে মাইল তিনেক দূরের নিভৃত এই কলেজ ভবনটা খুবই পছন্দ হয়েছে ওদের, লোকচক্ষুর অন্তরালে গোপনে এটাকে ব্যবহার করছে প্রমোদ ভবন হিসেবে। জাতির সেবা হচ্ছে, কারও কিছু বলবার সাধ্য নেই।

দেয়ালের গায়ে ফিট করা একটা কাঠের তাকের উপর বিদঘুটে আকারের কয়েকটা কাচের জার দেখে বুঝতে পারে লায়লা, এ ঘরটা সায়েন্স সেকশনের ল্যাবরেটরির অংশ ছিল। হয়তো বায়োলজিক্যাল রিপ্রোডাকশন সম্বন্ধে লেকচার দিয়েছেন এখানে এক সময় বায়োলজির অধ্যাপক, এরা আজ তার প্র্যাকটিক্যাল ডেমনস্ট্রেশন দেখাচ্ছে। অধিকাংশ মেয়েই আজ গর্ভবতী। তবু অত্যাচার কমেনি এক বিন্দুও। দূর থেকে আবার ভেসে এল আর্তচিৎকার···মা···গো—!

শিউরে উঠল লায়লা।

কোনও উপায় নেই ওর। পাঞ্জাবী মায়ের সন্তান সে, মাতৃভাষা পাঞ্জাবী, পাঞ্জাবে জন্ম ওর, বড় হয়েছে পাঞ্জাবে, শিক্ষাদীক্ষা আচার ব্যবহারে পুরোদস্তুর পাঞ্জাবী সে। সেজন্যেই অন্তরের অন্তস্তল থেকে উপলব্ধি করতে পারছে সে, নিস্তার নেই ওর এদের হাত থেকে। বুনো হিংস্র ক্ষুধার্ত নেকড়ের মত ছিঁড়ে খাবে ওরা ওকে সামান্য দুর্বলতার সুযোগেই। ওর অপরাধ—ওর বাবা বাঙালী। অসহায় সে। চোখের জল ফেলা ছাড়া আর কিছুই করবার নেই।

ঠিকই করেছে বাঙালীরা এই বর্বরদের সাথে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে।

এছাড়া উপায় ছিল না। জানোয়ারেরও অধম ওরা।

পাশের কোন একটা ঘরে নিচু গলায় একটানা ককিয়ে চলেছে একটা মেয়ে। আধ ঘন্টা ধরেই গোঙাচ্ছে। অস্পষ্ট উচ্চারণে বিলাপ করছে। হয়তো অসুখ-বিসুখ হয়েছে, দেখার কেউ নেই, চিকিৎসার ব্যবস্থা নেই। এখানকার বেশির ভাগ মেয়েই সোগগ্রস্তা হয়ে পড়েছে। কিন্তু তাতেও কি নিস্তার আছে? ট্রাক ভর্তি সোলজার আসছে বর্ডার থেকে, ট্রাকের পর ট্রাক। এই ক্যাম্পে নবাগতাদের জন্যে আলাদা ব্যবস্থা। কমিশনড অফিসারদের জন্যে আলাদা করে রাখা হয় তাদের তেতলায়। একটু পরানো হয়ে গেলে নামিয়ে দেয়া হয় নন-কমিশনড অফিসারদের জন্য



দোতলায়। সেখান থেকে কিছুদিন পর নামিয়ে দেয়া হয় একতলায় জোয়ানদের হরির লুটের মেলায়। নাৎসীদের ভয়ঙ্করতম বর্বরতাও লজ্জা পাবে এদের নৃশংসতার কাছে।

জুতোর খচমচ আওয়াজ তুলে কেউ আসছে বারান্দা ধরে। নিশ্চয়ই কোন অফিসার চলেছে প্রেমের তৃষ্ণা মিটাতে। সারারাত ধরে বারান্দায় পায়ের শব্দ পাওয়া যায়, আসছে-যাচ্ছে বিরাম নেই।

হঠাৎ ধক্ করে উঠল লায়লার বুকের ভিতরটা। দরজার সামনে থেমে গেছে পায়ের শব্দ। হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন থমকে গেল এক মুহূর্তের জন্যে। পর মুহূর্তে দ্বিগুণ হয়ে গেল ধুকপুকানি। দরজায় তালা খোলার শব্দ। তারপর খুলে গেল কপাট।

ধড়মড়িয়ে উঠে বসল লায়লা বিছানায়।

সেই ক্যাপ্টেন! ইউনিফরম খুলে রেখেছে, নীল প্যান্ট আর সাদা শার্ট পরনে।

ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল লোকটা। ঘুরে দাঁড়িয়ে হাসল মনোহর হাসি। এগিয়ে এল বিছানার কাছে। তড়াক করে এক লাফে উঠে দাঁড়াল লায়লা। লোলুপ দৃষ্টিতে ভীত সন্ত্রস্ত লায়লাকে দেখল ক্যাপ্টেন আপাদমস্তক। কোমরের বাঁকে এসে আটকে গেল দৃষ্টিটা কয়েক সেকেণ্ড, তারপর উঠে এল সুউন্নত বুকের উপর, চকচক করছে চোখ দুটো লোভে, বুক থেকে সরে স্থির হলো দৃষ্টিটা লায়লার চোখে। আবার হাসল ক্যাপ্টেন। এবারের হাসিটা কেমন ফ্যাকাসে, কামদগ্ধ। দুই পা এগিয়ে এল সে।

দুই পা পিছিয়ে গেল লায়লা।

'বেহুদা ভয় পাচ্ছ তুমি, সুন্দরী। আমি বাঘ নই, ভালুকও নই। খেয়ে ফেলব না তোমাকে,' বলল ক্যাপ্টেন। কিন্তু লায়লার মধ্যে কোন ভাবান্তর না দেখে বলল, 'এটাকে খেলা হিসাবে নিলেই ভয় লাগবে না আর। কি আছে এতে? তুমিও মজা পাবে, আমিও। স্ত্রী-পুরুষ চিরকাল ধরে করে আসছে এই কাজ। ব্যথা লাগবে না, কথা দিচ্ছি···' আরও এক পা এগিয়ে এল ক্যাপ্টেন সাঈদ।

'খবরদার, ক্যাপ্টেন! আর এক পা এগোলে চিৎকার করে ডাকব আমি মিস শাকিলা মির্জাকে।'

অনাবিল হাসি হাসল সাঈদ। 'ওকে ডেকে কোন লাভ হবে না, লায়লা। শাকিলার অনুমতি নিয়েই এসেছি আমি। প্রকাণ্ড পালোয়ান এক মাকরানী জওয়ানকে দিয়ে এসেছি ওর ঘরে ঘুষ হিসেবে। এতক্ষণে ওরা বিছানায় পৌঁছে গেছে। শুধু শুধু ধস্তাধস্তি করে মিষ্টি ব্যাপারটাকে তেতো না করে চলে এসো সুন্দরী। জোর খাটাতে চাই না আমি তোমার ওপর।' দু'হাত সামনে বাড়িয়ে এগিয়ে এল ক্যাপ্টেন।

লাথি চালাল লায়লা, ফস্কে গেল লাথি, তাল সামলাতে না পেরে পড়ে যাচ্ছিল, দু'হাতে জড়িয়ে ধরল ক্যাপ্টেন সাঈদ। প্রচণ্ড শক্তি লোকটার গায়ে, ছটফট করল, কিন্তু ছুটতে পারল না লায়লা। পুরু ভেজা এক জোড়া ঠোঁট চেপে বসল ওর ঠোঁটের

উপর। চুল ধরে টেনেও পিছনে সরাতে পারল না মাথাটা। দু'হাতে কিল মারল ওর পেশীবহুল পিঠে। কিন্তু কিছুতেই স্থির হলো না। এক মিনিট পর ঠোঁট সরিয়ে নিল ক্যাপ্টেন। আঁচল খসে গিয়েছিল কাঁধ থেকে আগেই, এবার ব্লাউজ নিয়ে টানাটানি শুরু করল সে।

এক ঝটকায় সরে এল লায়লা। পটপট করে ছিঁড়ে গেল ব্লাউজের সব ক'টা বোতাম ও হুক। উন্মুক্ত হয়ে পড়েছে ব্রেসিয়ারহীন বুক। দ্রুত শ্বাস টেনে রুদ্ধশ্বাসে চেয়ে রইল ক্যাপ্টেন, জিভ দিয়ে চাটল পুরু ঠোঁট। দুই চোখে আদিম লালসা।

'বাধা দিয়ে কোন লাভ নেই, সুন্দরী। শুধু শুধু খেপিয়ে দিয়ো না আমাকে, আমি তাহলে জংলী হয়ে যাব।' নিজের জামা কাপড় খুলতে আরম্ভ করল ক্যাপ্টেন। শার্ট, গেঞ্জি, প্যান্ট, জাঙ্গিয়া, জুতো।

ঘৃণায় মুখ ফিরাল লায়লা। ফিরিয়েই চোখ পড়ল পিতলের ফ্লাওয়ার ভাসটার উপর। আলগোছে সেটা হাতে নিয়ে হাতটা পিছনে লুকিয়ে রাখল। এগিয়ে এল ক্যাপ্টেন, পিছিয়ে গেল লায়লা এক পা। আরও দ্রুত এগোল ক্যাপ্টেন। এবার এক পা এগিয়ে এসেই ডান হাতটা চালাল লায়লা। কিন্তু জায়গা মত লাগল না। চট করে মাথাটা সরিয়ে নিয়েছে ক্যাপ্টেন। কপালের একপাশে লেগে পিছলে গিয়ে আঘাতটা পড়ল কাঁধের উপর। কপাল ফেটে রক্ত বেরিয়ে পড়ল। দ্বিতীয়বার আঘাত করবার জন্যে মাথার উপর তুলল লায়লা ফুলদানীটা, কিন্তু খপ করে ধরে ফেলল ক্যাপ্টেন ওর কব্জি। ধরেই মোচড় দিল।

ঝন্ ঝন্ শব্দে মেঝের উপর পড়ল ফুলদানীটা লায়লার হাত থেকে খসে। ঠাস করে প্রচণ্ড এক চড় পড়ল ওর গালে। মাথাটা ঘুরে গেল। অনুভব করল, একটানে ব্লাউজটা ছিঁড়ে ফেলল ক্যাপ্টেন ওর গা থেকে। আরেক গালে চড় পড়ল এবার। টলছে লায়লা। ক্ষিপ্র হাতের দু'-তিন টানে মেঝেতে খসে পড়ল শাড়ি, অন্তর্বাস। দু'হাতে জাপটে ধরেছে এবার ক্যাপ্টেন, দাঁত বসিয়ে দিয়েছে বুকে। শূন্যে তুলে নিয়ে এগিয়ে গেল বিছানার কাছে। দড়াম করে আছড়ে ফেলল ওকে বিছানায়। ঝাঁপিয়ে পড়ল ওর উপর ক্ষুধার্ত বাঘের মত।

উঠে বসার চেষ্টা করল লায়লা, চুল ধরে হ্যাঁচকা টান মেরে ক্যাপ্টেন শুইয়ে দিল ওকে আবার। পাগলের মত হাত-পা ছুঁড়ছে লায়লা, প্রচণ্ড এক ঘুসি পড়ল পাঁজরের উপর। দম বন্ধ হয়ে আসছে লায়লার, শ্বাস নিতে পারছে না। বুকের উপর উঠে এসেছে জানোয়ারটা।

শেষবারের মত খোদাকে ডাকল সে একবার। ঠিক সেই মুহূর্তে চোখ পড়ল জানালায়। পর্দাহীন জানালা টপকে ঘরে ঢুকছে একজন লোক। আশান্বিত হয়ে উঠতে যাচ্ছিল, কিন্তু দপ করে নিভে গেল সব আশা। হায় খোদা! এ তো ওদেরই আরেকজন! মিলিটারি পুলিস। পাঞ্জাবী।

নিঃশব্দ পায়ে এগিয়ে এল রানা। চুলের মুঠি ধরে টেনে তোলার আগে কিছুই



টের পেল না ক্যাপ্টেন। পরমুহূর্তেই দড়াম করে প্রচণ্ড একটা ঘুসি পড়ল ওর নাকের উপর। চোখে সর্ষে ফুল দেখছে ক্যাপ্টেন। আবছা মত দেখতে পেল এম. পি. ইউনিফরম পরা একজন লম্বা লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে সামনে। তারপরই টু শব্দ না করে জ্ঞান হারাল সে তলপেটে রানার হাঁটুর মারাত্মক এক গুঁতো খেয়ে। সেই সাথে মরার উপর খাঁড়ার ঘায়ের মত ঘাড়ের উপর পড়ল তীব্র বেগে একখানা জুডো চপ্।

লায়লা দেখল, ক্যাপ্টেনের পতন্ত দেহটা ধরে আস্তে করে মাটিতে নামিয়ে রাখছে আগন্তুক। লম্বা একহারা নিষ্ঠুর চেহারা লোকটার। কিন্তু অসম্ভব শক্তিশালী। লোকটার চলা ফেরায় বিদ্যুৎ-বেগ। যেন কিছুই হয়নি, এমনি ভাবে সোজা হয়ে দাঁড়াল। এগিয়ে গিয়ে মেঝে থেকে শাড়ি আর অন্তর্বাস তুলে ছুঁড়ে দিল ওর দিকে। অনুচ্চ ভারি গলায় বলল, 'তোমার নাম লায়লা জামান?'

পরিষ্কার বাংলা। লোকটা বাঙালী!

'কে আপনি?' দ্রুতহাতে লজ্জা নিবারণ করে পাল্টা প্রশ্ন করল লায়লা। 'এখানে এলেন কি করে? আমার নামই বা…'

'বুঝেছি। ঠিক জায়গাতেই পৌঁছেছি, এবং ঠিক সময় মত। নাও, ওঠো, এক্ষুনি পালাতে হবে এখান থেকে।'

'কে আপনি?' আবার প্রশ্ন করল লায়লা।

'আমার ছদ্মনাম আপাতত শরাফ আলী। তোমাকে নিয়ে যেতে এসেছি।'

'আমি তো এভাবে পালাতে পারি না। আব্বাকে তাহলে ওরা…'

'তোমার আব্বার কাছ থেকেই আসছি আমি। তোমাকে মুক্ত না করলে উনি পালাতে রাজি হচ্ছেন না। অথচ ওঁকে ফেলে আমরা এদেশ থেকে যেতেও পারছি না। তাই আগে তোমার মুক্ত হওয়া দরকার। এখান থেকে বেরিয়ে তুমি ফোন করবে তোমার আব্বার নাম্বারে। তোমার কণ্ঠস্বর শুনে নিশ্চিন্ত হলেই উনি পালিয়ে যাবেন স্পেশাল অফিসার্স কোয়ার্টার থেকে। সবকিছু ঠিকঠাক। এবার তুমি দয়া করে গাত্রোত্থান করলেই হয়।'

'কিন্তু…কিন্তু এখান থেকে পালাবেন কি করে?'

'যেভাবে এসেছি ঠিক সেইভাবেই।'

'জানালা দিয়ে?' চোখ জোড়া কপালে উঠল লায়লার। 'অসম্ভব! মাথা ঘুরে পড়েই মরে যাব। তাছাড়া গার্ড রয়েছে নিচে…'

'আছে। কিন্তু ঝোপের আড়ালে ঘুমিয়ে আছে। বেশি দেরি করলে আবার জ্ঞান ফিরে পেয়ে চাঙ্গা হয়ে উঠতে পারে। এখান থেকে বেরিয়ে এক মাইল হাঁটতে হবে। কাজেই…' হঠাৎ থেমে গেল রানা। কিন্তু তখন দেরি হয়ে গেছে। কথা বলছিল বলে পায়ের শব্দ পায়নি সে।

খটাং করে খুলে গেল একটা দরজা। পাঁই করে ঘুরে দাঁড়াল রানা। দরজার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে অপূর্ব সুন্দরী এক মহিলা। একা। পরনে পেটিকোট ও
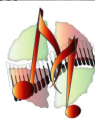
ব্লাউজ ছাড়া কিছুই নেই। ঠোঁটের লিপস্টিক লেগে আছে চিবুকে, গালে। ডান হাতে পয়েন্ট টু-ফাইভ ক্যালিবারের ছোট্ট একটা অ্যাসট্রা পিস্তল। লোলুপ দৃষ্টিতে চেয়ে আছে পিস্তলটা রানার বুকের দিকে।

'হ্যাণ্ডস আপ!'

মুহূর্তে চিনতে পারল রানা শাকিলা মির্জাকে। বছর চারেক আগে একসাথে হংকং গিয়েছিল একটা অ্যাসাইনমেন্টে। ঘনিষ্ঠ ভাবে একে অপরকে দেখার সুযোগ হয়েছিল ওদের একাধিক বার। অদ্ভুত রকমের পার্ভার্টেড মেয়ে। যৌন বিকারগ্রস্ত। শেষ কালে কঠোর ভাবে প্রত্যাখ্যান করতে বাধ্য হয়েছিল রানা। প্রতিহিংসার বশে ক্ষতি করার চেষ্টা করেছিল সে রানার, সুযোগ পায়নি। কিন্তু পাকিস্তান কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের এজেন্ট শাকিলা মির্জা কি করছে এখানে? ধীরে ধীরে হাত দুটো তুলল সে মাথার উপর।

মুহূর্তে ছদ্মবেশ ভেদ করে চিনতে পারল শাকিলা রানাকে। বিস্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে রইল পাঁচ সেকেণ্ড, তারপর বাঁকা হাসি ফুটে উঠল ওর ঠোঁটে।

'তাই বলি, কার এত বড় বুকের পাটা! এ যে দেখছি আমাদের সেই উজ্জ্বলতম তারকা, পাকিস্তান কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের বিস্ময়, মেজর জেনারেল রাহাত খানের সুযোগ্য মানস-পুত্র জনাব মাসুদ রানা! ওয়েলকাম, তোমার জন্যে অপেক্ষা করছিলাম আমরা। ক্যাপ্টেন সাঈদের উলঙ্গ জ্ঞানহীন দেহের দিকে চেয়েই চট করে ফিরে এল দৃষ্টিটা রানার উপর। কুঁচকে গেল ভ্রূ। 'ইজ হি ডেড?'

'বলতে পারি না। দেখব?'

'না! খবরদার! একটুও নড়াচড়া করবে না রানা। তুমি জানো, তোমার প্রতি বিশেষ সন্তুষ্ট নই আমি। তোমার হৃৎপিণ্ডে গোটা দুয়েক সীসা ঢোকাতে পারলে আমি খুবই সুখী হব। কাজেই সাবধান। কোন চালাকি নয়। গুলি করতে দ্বিধা করব না আমি। অপমানের জ্বালা যায়নি এখনও আমার। ইউ ইনসালটেড মি। রিমেমবার?'

প্রমাদ গুণল রানা। বন্দী করলে মুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, কিন্তু পরিষ্কার বুঝতে পারল সে, গুলি করার ছুঁতো খুঁজছে শাকিলা। পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইল সে। এগিয়ে এসে পা দিয়ে ঠেলে চিৎ করল শাকিলা ক্যাপ্টেন সাঈদের শরীরটা। কিন্তু পিস্তলটা কাঁপল না একবিন্দু। স্থির হয়ে আছে সেটা রানার বুকের দিকে। জোরে একটা লাথি মারল সে ক্যাপ্টেনের গোপন অঙ্গে। অজ্ঞান অবস্থাতেই ককিয়ে উঠল ক্যাপ্টেন।

'তোমার কপাল ভাল। বেঁচে আছে। নইলে…'

নড়ে উঠল লায়লা। ক্লিক করে অ্যাসট্রার সেফটি ক্যাচটা নেমে গেল। ডান হাতের ইঙ্গিতে নড়তে বারণ করল রানা লায়লাকে। বলল, 'আমি দুঃখিত, মিস লায়লা। তোমাকে উদ্ধার করতে পারলাম না এই দোজখ থেকে। কিছুই করার নেই



এখন। বোকামি কোরো না। অনর্থক গুলি খেয়ে মরার কোন মানে হয় না। মিস শাকিলা মির্জা একজন হাইলি ট্রেইনড এসপিয়োনাজ এজেন্ট। সব রকম কৌশলই জানা আছে ওর। ওর বিরুদ্ধে কিছু করতে যেয়ো না।'

'থ্যাঙ্ক ইউ ফর দা কমপ্লিমেন্ট। প্রাক্তন কলিগের মুখে প্রশংসা শুনতে ভালই লাগে। এবার ঘুরে দাঁড়াও,' বলল শাকিলা।

অ্যাসট্রার নল এসে ঠেকল রানার পিঠে। দক্ষ হাতে সার্চ করল শাকিলা। আধ মিনিটের মধ্যেই এম. পি.-র রিভলভার এবং রানার ল্যুগারটা চলে গেল শাকিলার হাতে। পেটিকোটে গুঁজে নিল সে ও দুটো।

ঠিক সেই মুহূর্তে লাফ দিল লায়লা। কেউ কিছু বোঝার আগেই ঝট করে মেঝে থেকে ফুলদানীটা তুলে মারল ছুঁড়ে প্রাণপণ শক্তিতে। সোজা এসে খটাং করে লাগল সেটা রানার মাথায়। খিক খিক করে হেসে উঠল শাকিলা, এবং সাথে সাথেই পিছন থেকে ধাক্কা মারল সে রানাকে প্রচণ্ড বেগে। হুমড়ি খেয়ে পড়ল রানা দেয়ালের গায়ে। আবার ঠুকে গেল কপালটা দেয়ালে বসানো কাঠের তাকের সাথে। ঠুন ঠুন করে পরস্পরের গায়ে ঠোকাঠুকি খেল বিদঘুটে আকারের কয়েকটা বোতল।

একলাফে লায়লার সামনে গিয়ে হাজির হলো শাকিলা, বাম হাতে ধরে ফেলল ওর ডান হাতের কব্জি, অদ্ভুত কৌশলে পিছন দিকে নিয়ে এল সে কব্জিটা, আবছা একটা ইঙ্গিত করল রানাকে। এই ইঙ্গিতের অর্থ জানা আছে রানার। বিশেষ বিশেষ অবস্থায় পারস্পরিক সহযোগিতার জন্যে কিছু ইঙ্গিত অভ্যাস করতে হয়েছিল পাকিস্তান কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের প্রত্যেকটি এজেন্টকে। বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের ইঙ্গিত পাল্টে দিয়েছে রানা নিজেই। পাকিস্তানও সম্ভবত পাল্টেছে। কিন্তু শাকিলার ইঙ্গিতটা প্রাক্তন পি. সি. আই. এজেন্টের ইশারা। এর অর্থ, এক্ষণি লায়লার হাতটা মট করে ভেঙে ফেলতে যাচ্ছে সে। রানার প্রতি চ্যালেঞ্জ—পারো তো ঠেকাও। পিস্তলের মুখটা তেমনি ধরা আছে অকম্পিত হাতে রানার বুকের দিকে।

'উঁহু, রানা!' সাবধান করল শাকিলা। 'হাত দুটো আর এক ইঞ্চি নিচে নামলে গুলি করব। আমার গুলি মিস্ হয় না, তুমি জানো। মারা পড়ার চেয়ে ধরা পড়া ভাল—রুল নাম্বার সেভেন্টিনাইন।' নিষ্ঠুর এক টুকরো বাঁকা হাসি ফুটে উঠল শাকিলার ঠোঁটে।

বেচারা লায়লা জানেও না কার পাল্লায় পড়েছে সে। টেরও পাচ্ছে না কতবড় বিপদ ডেকে এনেছে রানাকে সাহায্য করতে গিয়ে। আর কয়েক সেকেণ্ড পরই মড়াৎ করে ভেঙে যাবে ওর হাত। কোনভাবে ঠেকানো যায় না? কিছুই বুঝে উঠতে পারছে না রানা। মাথায় পর পর দুটো আঘাত খেয়ে ঘোলা হয়ে গেছে বুদ্ধিটা।

'এক সেকেণ্ড, শাকিলা!' সময় চাইল রানা। 'মেজর জেনারেল রাহাত খানের ঠিকানাটা পেতে পারো তুমি ইচ্ছে করলে। বিনিময়ে…'
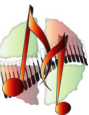
'ওর ঠিকানা আমাদের জানা আছে।' চাপ দিতে শুরু করল শাকিলা। বাম হাত ধীরে ধীরে নিচু হচ্ছে। মুখে বাঁকা হাসি। প্রথমে ব্যথায় ককিয়ে উঠল লায়লা, তারপর চিৎকার করে উঠল তীক্ষ্ণ কণ্ঠে।

রানার হাতে ঠেকল একটা কাচের জার। সাঁই করে ছুঁড়ে মারল জারটা সে শাকিলার কপাল লক্ষ্য করে। সেই সাথে বিদ্যুৎ বেগে সরে গেল ডান পাশে। গুলি করল শাকিলা। ইউনিফরমের হাতায় একটা ঝটকা টান অনুভব করল রানা। এই প্রথম বোধহয় মিস হলো শাকিলার গুলি। দ্বিতীয় গুলির আগেই ডাইভ দিয়ে পড়ল রানা মাটিতে। সাথে সাথেই পা চালাল। শাকিলার হাতে ধরা পিস্তলটা ছিটকে চলে গেল ঘরের কোণে। কিন্তু···এ রকম করছে কেন শাকিলা? কি দেখছে লায়লা বিস্ফারিত নেত্রে? এগিয়ে গেল রানা।

কপালে লেগে ভেঙে চুর হয়ে গিয়েছিল পাতলা কাচের জারটা। একরাশ তরল পদার্থ নেমে এসেছিল কপাল বেয়ে চোখে-মুখে-নাকে। সঙ্গে সঙ্গে বীভৎস ফোস্কায় ভরে গেছে শাকিলার অপরূপ সুন্দর মুখটা।

রাত্রির বুক চিরে দিয়ে তীক্ষ্ণ চিৎকার করে উঠল শাকিলা। দুই হাতে চোখ ঢাকল সে। কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়ল মেঝের উপর। তারপর শুয়ে পড়ল। মুমূর্ষু জানোয়ারের মত চার হাত-পায়ে এগোবার চেষ্টা করল মেঝের উপর দিয়ে। পর মুহূর্তে জ্ঞান হারাল।

অবাক হয়ে চেয়ে রয়েছে রানা, লায়লা। কিছুক্ষণ আগেও অপূর্ব সুন্দর ছিল যে মুখ, বিশ্রী দগদগে ঘায়ে ভরে উঠেছে এখন সেটা। বীভৎস! ছোট ছোট বুদ্বুদ উঠছে এখনও। জায়গায় জায়গায় হাড় দেখা যাচ্ছে।

কনসেনট্রেটেড সালফিউরিক অ্যাসিড ছিল বোতলের মধ্যে।

বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল ওরা বেশ কিছুক্ষণ। বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে উঠতে পারছে না কিছুতেই। লায়লাই সামলে নিল আগে।

'এক্ষুণি খোঁজ পড়বে শাকিলা মির্জার। একটু আগে এক মাকরানী সোলজারকে নিয়ে বিছানায় ছিল, উঠে এসেছে কিছু একটা সন্দেহ করে। তাছাড়া পিস্তলের আওয়াজ শুনেছে নিশ্চয়ই কেউ। খোঁজাখুঁজি শুরু হয়ে যাবে এখুনি। আমাদের হাতে আর সময় নেই, মাসুদ সাহেব।'

'হ্যাঁ। সময় নেই,' আনমনে বলল রানা। তারপর লায়লাকে বিস্মিত করে দিয়ে কাপড় ছাড়তে শুরু করল ত্রস্ত হাতে। রানার মতলব বুঝতে না পেরে একটু ঘাবড়ে গেল লায়লা। ইউনিফরম খুলে ফেলেছে রানা। এবার ক্যাপ্টেন সাঈদের সিভিল ড্রেস পরতে শুরু করল সে। এতক্ষণে বুঝতে পারল লায়লা, রানার পরিবর্তন হচ্ছে ছদ্মবেশ। রানার গায়ের বিভিন্ন জখমের চিহ্নগুলো দেখল আড়চোখে। আর দেখল, সামান্য একটু নড়াচড়াতেই সারা দেহের পেশীগুলো কি রকম কিলবিল করে উঠছে। পেটা শরীর বোধহয় একেই বলে।



'হাঁ করে দাঁড়িয়ে না থেকে শাকিলার ব্লাউজটা খুলে পরে নাও চটপট। আর ওই পিস্তলটা তুলে নিয়ে কোমরে গোঁজো। কুইক।'

শাকিলার পেটিকোটে গোঁজা ল্যুগার এবং এম. পি.-র কাছ থেকে পাওয়া রিভলভারটা বের করে নিল রানা। কয়েকটা প্রশ্ন ঘুরঘুর করছে ওর মাথায়, কিন্তু স্পষ্ট হচ্ছে না কিছুতেই। শাকিলার দুটো বাক্য বেশ ভাবিয়ে তুলেছে ওকে। শাকিলা বলেছিল: তোমার জন্যে অপেক্ষা করছিলাম আমরা। আরও বলেছিল: ওর (মেজর জেনারেলের) ঠিকানা আমাদের জানা আছে। কেমন যেন খটকা লাগছে।

'কিন্তু এখান থেকে বেরোব কি করে?' জানালার দিকে একবার চেয়ে ভয়ে ভয়ে বলল লায়লা।

'ওটাই একমাত্র পথ,' বলল রানা।

'অসম্ভব! আমি পারব না। মাথা ঘুরে পড়ে যাব নিচে।'

'চোখ বন্ধ করে রাখলেই ভয় লাগবে না। নাও, ওঠো। পিঠে উঠে চোখ বন্ধ করো। হাত-পা দিয়ে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে থাকো আমাকে নিশ্চিন্তে।'

রানার পিঠে উঠতে ইতস্তত করছে লায়লা। সঙ্কোচ হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু ভয় লাগছে তার চেয়ে অনেক বেশি। যদি দু'জনেই পড়ে যায়!

'কই ওঠো। জলদি।' জানালার পাশে এসে দাঁড়াল রানা। পিঠ নিচু করল।

'ভয় লাগছে!'

হাসল রানা। বলল, 'ভয় তো আমারও লাগছে। সেই জন্যেই তো তাড়াতাড়ি পালাতে চাইছি। এখানে থাকাটা আরও বেশি ভয়ের ব্যাপার। নাও, ওঠো। আমি বলছি, চোখ বন্ধ করে রাখলে কিচ্ছু ভয় লাগবে না। লিফটের মত সড় সড় করে নেমে যাব···'

কিন্তু বেশি বোঝাতে হলো না। চিৎকার করে উঠেছে দোতালার কোনও কামরা থেকে একটা নারী কণ্ঠ: মাফ করে দাও আমাকে। পায়ে পড়ি, ছেড়ে দাও। নয়তো মেরে ফেলো একেবারে। হু-হু করে কেঁদে উঠল মেয়েটা।

স্তব্ধ হয়ে শুনল লায়লা কথাগুলো, কান্না। বিনা বাক্য ব্যয়ে পিছন থেকে জড়িয়ে ধরল রানার গলা। দুই পায়ে আঁকড়ে ধরল রানার উরু।

জানালা টপকে কার্নিসে চলে এল রানা। সাবধানে, ধীরে ধীরে এগোল পানির পাইপের দিকে।

দোতলা থেকে গর্জন শোনা গেল পুরুষ কণ্ঠে: কাপড়া খুল!

আবার মেয়েটির কণ্ঠ: তুমি আমার বাবার বয়সী, দয়া করো, দয়া করে ছেড়ে দাও আমাকে, আর পারি না

আবার পুরুষ কণ্ঠ: ফির বাত কারতা!

ঠাশ করে চপেটাঘাতের শব্দ। আর্তকণ্ঠে ককিয়ে উঠল মেয়েটা: উহ! বাবাগো! মেরো না, মেরো না, খুলছি···

পাইপ বেয়ে অর্ধেক পথ নেমেই দেখতে পেল রানা মেয়েটিকে। একেবারে বাচ্চা মেয়ে। তেরো কি চোদ্দ বছর বয়স হবে। সবে উন্মেষ হচ্ছে যৌবনের। প্রকাণ্ড গোঁফওয়ালা মাঝবয়সী এক মোটাসোটা পাঞ্জাবী সুবেদারের সামনে দাঁড়িয়ে কাঁপছে বাঁশ পাতার মত। ভয়ে বিস্ফারিত দুই চোখ। খ্যাক খ্যাক করে হাসছে সুবেদার।

কার না জানি স্কুলে পড়া বেণী দুলানো আদুরে ক্লাস সেভেনের মেয়ে।

নেমে গেল রানা নিচে। পাঁচ মিনিটের মধ্যে বেরিয়ে গেল ওরা অভিশপ্ত বন্দী শিবির থেকে। অনেকক্ষণ কেউ কোন কথা বলল না। একটা লাইট পোস্টের কাছে এসে লক্ষ করল লায়লা রানার চোখ দুটো কেমন যেন ভেজা-ভেজা।

## তেরো

গুজরানওয়ালার শ্রেষ্ঠ হোটেল স্প্রিং ফিল্ডে পৌঁছল ওরা ঠিক সোয়া দশটায়। চোস্ত পাঞ্জাবীতে লাহোরে একটা জরুরী ফোন করার অনুমতি নিল লায়লা। আগেই তিন মিনিট এস. টি. ডি. কলের টাকা দিয়ে দিল রানা।

ডায়াল করল লায়লা। তিন বার রিং হবার পর নামিয়ে রাখল রিসিভার। ঠিক এক মিনিট পর আবার ডায়াল করল। ওপাশ থেকে রিসিভার তোলার শব্দ হলো খট্‌ করে। মুখস্থ গত বলে গেল লায়লা। ওপাশ থেকে ছোট্ট একটুকরো জবাব এল। রিসিভার নামিয়ে রাখল লায়লা।

'কি হলো?' লায়লার ভ্রূ জোড়া সামান্য একটু কুঁচকাতে দেখে জিজ্ঞেস করল রানা।

'জবাবটা ঠিকই আছে। কিন্তু গলাটা কেমন যেন অন্য রকম লাগল। কেমন একটু কর্কশ, খনখনে।'

'উত্তেজনার বশে ওরকম হতে পারে,' বলল রানা। কিন্তু খটকা একটু লেগেই রইল ওর মনে। কোথাও কিছু গোলমাল হয়ে গেল নাকি?

'তা অবশ্য পারে,' বলল লায়লা। 'যাক, এখন আমাদের কি প্রোগ্রাম?'

'যত দ্রুত সম্ভব এখান থেকে কেটে পড়া।'

হাত ধরাধরি করে বেরিয়ে এল ওরা হোটেলের রিসেপশন থেকে। মোটর সাইকেলটার কাছে এসে মত পাল্টাল রানা। আজও মেঘ করেছে আকাশে। বৃষ্টি আসবে। তাছাড়া আর্মির মোটর বাইক নিয়ে লাহোরে ফেরত যাওয়া ঠিক হবে না। গাড়ি দরকার।

কার পার্কের কাছাকাছি একটা ছায়ায় দাঁড়াল ওরা। তিনজন সুবেশী ভদ্রলোক বেরিয়ে এল বার থেকে, গাড়িতে উঠল, চলে গেল বেরিয়ে। এবার বেরোল



এক জোড়া যুবক-যুবতী। নাহ্, কপালটা তো আবার দুর্ব্যবহার শুরু করেছে! কিন্তু না, মিনিট তিনেক পরই বেরোল একজন হৃষ্টপুষ্ট ভদ্রলোক—খুব সম্ভব কন্ট্রাকটর—একা। পিছন পিছন দু'হাতে দুটো হুইস্কির বোতল নিয়ে আসছে বেয়ারা। একটা সাদা ফোক্সওয়াগেনের সামনের বুটে বোতল দুটো রেখে বকশিশ নিয়ে চলে গেল বেয়ারা সালাম ঠুকে। খুশি হলো রানা—গাড়িটার নাম্বার প্লেট রাওয়ালপিণ্ডির।

'এইবার,' বলল রানা। 'তোমার সতীত্ব রক্ষা করো এবার। প্রাণপণে একটা ফাইট দাও দেখি।'

একটানে আলোকিত চত্বরে নিয়ে এল রানা লায়লাকে। দুই হাতে জড়িয়ে ধরে চুমো খাবার চেষ্টা করছে সে লায়লার ঠোঁটে। মাথাটা এদিক ওদিক সরিয়ে ওর হাত থেকে বাঁচবার চেষ্টা করছে লায়লা পিছন দিকে হেলে। খোঁপা খুলে আলগা হয়ে গেছে। দুই হাতে কিল দিচ্ছে সে রানার পিঠে।

গাড়ির বুট লাগাতে গিয়ে হঠাৎ দেখতে পেল লোকটা লায়লার এই প্রাণপণ যুদ্ধ। নারীর অবমাননা হচ্ছে। জেগে উঠল পুরুষের সনাতন শিভালরি। নিশ্চয়ই গুণ্ডার পাল্লায় পড়েছে ভদ্রমহিলা। উদ্ধার করতেই হবে। বিড়ালের মত নিঃশব্দ পায়ে এগিয়ে এল সে জ্যাক উঁচু-নিচু করার রডটা নিয়ে। রডটা মাথার উপর তুলেছে সে, মারবে এইবার। ঠিক সময় মত লায়লার মুখ থেকে শব্দ বেরোল একটা। অমনি ধাঁই করে রানার কনুইটা গিয়ে পড়ল লোকটার পেটের উপর। পরমুহূর্তে ঘুরে দাঁড়িয়ে খোলা হাতে মারল রানা ওর ঘাড়ের উপর কারাতের এক কোপ। ধপাস করে পড়ে গেল লোকটা জ্ঞান হারিয়ে। টেনে নিয়ে গেল রানা ওকে অন্ধকারতম ছায়ায়। পকেট থেকে ড্রাইভিং লাইসেন্স আর চাবিটা বের করে নিয়ে এগিয়ে গেল রানা গাড়িটার দিকে।

পাশের সীটে উঠে বসল লায়লা। সাঁ করে বেরিয়ে গেল গাড়িটা স্প্রিং ফিল্ড হোটেলের মেইন গেট দিয়ে। সরাসরি লাহোরের পথে না গিয়ে মোড় নিল দক্ষিণ-পশ্চিমে শেখুপুরার দিকে।

'আপনি খুব সাহসী লোক। আর নিষ্ঠুর,' বলল লায়লা।

'কি রকম?'

'যেভাবে শত্রুর সাথে দেখা করেছেন, তারপর গুজরানওয়ালার ক্যাম্প থেকে আমাকে উদ্ধার করে নিয়ে চলেছেন, তাতে আপনাকে সাহসী বলব না তো কি বলব? আর আপনার নিষ্ঠুরতার তিন-চারটে জলজ্যান্ত প্রমাণ আমি নিজের চোখে দেখেছি।'

'আমি সাহসীও নই নিষ্ঠুরও নই লায়লা। আমি আসলে জন্ম-যোদ্ধা। আর বার্ণার্ড শ'র মতে, যে লোকের প্রাণের ভয় যত বেশি সে তত ভাল যোদ্ধা। মরতে
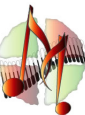
ভয়ানক ভয় পাই, তাই আগেই মেরে বসি। এটা সাহসের কিছু নয়। আর নিষ্ঠুর বলছ, স্পেশাল অফিসার্স কোয়ার্টারের গার্ডটাকে না মারলে তোমার আব্বার সাথে দেখা করাই সম্ভব হত না। সাইলেন্সার লাগানো পিস্তল ছিল, ঝুঁকি না নিয়ে মেরেই ফেলতে পারতাম গুলি করে। কই তা তো করিনি, নিষ্ঠুর কি করে হলাম? তোমার ঘরের ক্যাপ্টেনটাকে না মারলে ও ব্যাটাই আমাকে মারত। শাকিলার ব্যাপারটায় এখনও মনটা খচখচ করছে। আমি জানতাম না বোতলটায় অ্যাসিড ছিল; কিন্তু ও তোমার হাতটা ভেঙে ফেলতে যাচ্ছিল, সেই সাথে ছুতো খুঁজছিল আমাকে গুলি করবার, গুলি করেও ছিল। আমার নিষ্ঠুরতা প্রমাণ হলো কি করে? আর গাড়িটা ছাড়া লাহোর পৌঁছানোই যেত না আজ, কাজেই অনিচ্ছা সত্ত্বেও দু'ঘা দিতে হলো বেচারা আনিস আয়াজুয়ালাকে।'

'বড় ভয়ঙ্কর আপনার জীবন। এ জীবন আপনার ভাল লাগে?'

'নাহ, "ভাল লাগে" ঠিক বলা উচিত না। সব সময় মৃত্যু-ভয়, পালিয়ে বেড়ানো। যে-কোন মুহূর্তে যে-কোন দিক থেকে আসতে পারে বিপদ, সব সময় চমকে তাকিয়ে দেখতে হয় কেউ আছে কিনা পিছনে। পিছনে তাকাতেও আবার ভয় লাগে, যদি সত্যিই কেউ থাকে! এ জীবনটা ভাল লাগে বললে মিথ্যে বলা হবে। তবে এ জীবন ছাড়া আর কিছুই ভাল লাগে না—এটাও সত্যি।'

'তাই বেছে বেছে এই ধরনের চাকরি নিয়েছেন?'

'আমি ঠিক নিইনি। আমাকেই বেছে নিয়েছে ওরা। দিব্যি ছিলাম আর্মিতে, এতদিনে কর্নেল-ফর্নেল হয়ে যেতাম, ঢুকতে হলো আর্মি ইন্টেলিজেন্সে, সেখান থেকে কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সে। স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে দিল না আমাকে মেজর জেনারেল।'

'আপনার বাবাও আর্মিতে ছিলেন?'

'না। তিনি ছিলেন বিচার বিভাগে। হাইকোর্টের জজ। কিন্তু একমাত্র সন্তানের প্রতি সুবিচার করেননি ভদ্রলোক। অল্প বয়সেই আমাকে অসহায় এতিম অবস্থায় ফেলে পটল তুলেছেন।'

'বিয়ে করেছেন?'

'হ্যাঁ। বি. এ. পাস করেই ঢুকেছিলাম আর্মিতে।'

'না, মানে, বিয়ে থা...'

হেসে উঠল রানা। 'এ আবার কি প্রশ্ন?'

'ভয় নেই, আমার কোন মতলব নেই। শুধুই কৌতূহল। একাডেমিক ইন্টারেস্ট।'

'আকদ হয়েছে, কিন্তু রুসমত হয়নি,' বলল রানা।

'মেয়েটা বাঙালী?'

'মেয়ে? আমার মত ছন্নছাড়াকে বিয়ে করবে কোন বোকা মেয়ে? কলমা



পড়েছি বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের সাথে।'

'ও, তাই বলুন।' কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'ঢাকায় ফিরে হয়তো আর আপনার সাথে দেখা হবে না কোনদিন। তাই না?'

'হয়তো হবে।'

খানিকক্ষণ চুপচাপ কাটল। পঁচাত্তর মাইল বেগে ছুটে চলেছে গাড়ি। এক আধটা আলোকিত জনপদ দেখা যাচ্ছে দূরে, এগিয়ে আসছে কাছে, তারপর মিলিয়ে যাচ্ছে পিছনে। হু-হু বাতাসে চুল উড়ছে লায়লার। বলল, 'আপনার কাছে কৃতজ্ঞ বোধ করছি।'

'কেন?'

'অপমানের হাত থেকে বাঁচিয়েছেন আপনি আমাকে।'

'আমি আমার কর্তব্য করেছি। কৃতজ্ঞতা এক্ষেত্রে অবান্তর। লায়লা না হয়ে চমনআরা কিংবা লুৎফুন্নেসা হলেও উদ্ধার করে আনতাম।'

'তার মানে বাহাদুরী নিতে চাচ্ছেন না। আচ্ছা, আপনি খোদা বিশ্বাস করেন?'

'বিশ্বাস বা অবিশ্বাস কিছুই করি না। কেন?'

'আমি বিশ্বাস করতাম না। কিন্তু আজ অসহায় অবস্থায় চরম অপমানের মুহূর্তে আল্লাকে ডেকেছিলাম। ঠিক সেই সময়েই জানালা গলে ঘরে ঢুকলেন আপনি।'

'এটা কোইন্সিডেন্স।'

'আপনি বলতে চান, খোদা আমার ডাক শুনে আপনাকে পাঠায়নি?'

হাসল রানা। বলল, 'তার মানে একটা তর্ক বাধিয়ে সময় কাটাতে চাও। কিন্তু তর্ক ভাল লাগছে না এখন। তার চেয়ে নিজের সম্পর্কে কিছু বলো, শুনি।'

'না, তর্ক নয়। আমার কাছে ভয়ানক অবাক লাগছে ব্যাপারটা। খোদা যদি না-ই থাকবে...'

'তোমার ডাক শুনে দয়া পরবশ হয়ে যদি খোদা তোমাকে আমার মাধ্যমে উদ্ধার করে থাকেন, তাহলে বুঝতে হবে সবটা ব্যাপার আগে থেকে জানা ছিল তাঁর। তোমার ঘরে পৌঁছবার প্রায় পৌনে একঘণ্টা আগে রওনা হয়ে গেছি আমি লাহোর থেকে। অর্থাৎ, উদ্ধার করার জন্যে আমাকে ওদিকে রওনা করে দিয়ে তোমার উপর নির্যাতন চালাবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সবকিছুই আগে থেকে প্ল্যান করা। যেই তুমি খোদাকে ডাকবে, ওমনি আমি হাজির হয়ে যাব, এবং খোদার মাহাত্ম্য দেখে মুগ্ধ হয়ে যাবে তুমি। এ সবই ঠিক করা ছিল আগে থেকে। তোমাকে মুগ্ধ করার জন্যেই এতসব ঘটনার অবতারণা। ডু ইউ ফাইণ্ড এনি সেন্স ইন ইট?'

লজ্জা পেল লায়লা। বলল, 'না, মানে, হয়তো কোন বৃহত্তর উদ্দেশ্য আছে এসবের পিছনে...'

'থাকতে পারে, নাও থাকতে পারে। আমি ঘটনাকে ঘটনা হিসেবেই দেখি। এর পিছনে কোন উদ্দেশ্য দেখতে পাই না। সবই যদি খোদার ইচ্ছেয় হবে, পৃথিবীর সব
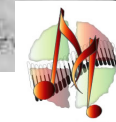
ঘটনা যদি ঘটবে তাঁরই প্ল্যান মাফিক, অর্থাৎ ক্যাপ্টেন সাঈদ এবং আমাকে যদি উনিই তোমার ঘরে পাঠিয়ে থাকবেন, তাহলে পাপের শাস্তি এবং পুণ্যের পুরস্কারের প্রশ্নই ওঠা উচিত না। ছেলেমানুষী হয়ে যাচ্ছে না ব্যাপারটা? মানুষকে সৃষ্টি করবার অনেক আগে থেকেই খোদা জানেন সে পাপ করবে না পুণ্য করবে, সে ভাল হবে না খারাপ হবে, পৃথিবীর প্রত্যেক ঘটনা ঘটছে তাঁরই পরিকল্পনা ও ইচ্ছা অনুযায়ী, তাঁর ইচ্ছের বাইরে কিছুই করার উপায় নেই কারও; কাজেই "দেখি তো সে সুপথে থাকে না কুপথে যায়" এই প্রশ্নই ওঠে না। মৃত্যুর পরের বিচার তাহলে প্রহসন হয়ে যায় না?' হাসল রানা। 'তাই বলছি, কোন দৈব-ঘটনা দেখেই খোদার উপর ভক্তি বা বিশ্বাস এসে যাওয়াটা ঠুনকো ব্যাপার। যদি আসে, সেটা আসবে আত্মার গভীর থেকে। অন্তরের সত্য-উপলব্ধি থেকে। যুক্তি তর্ক দিয়ে একে বাগে আনতে পারবে না।'

'আপনার সে উপলব্ধি হয়েছে?'

'না। তবে বিপদে পড়ে খোদাকে ডেকে পার পেয়েছি বহুবার। ব্যাপারটা কেন হয়, কি করে হয় জানি না। হয়তো এর কোন বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা থাকলেও থাকতে পারে। জানি না। কিন্তু আর না। তত্ত্ব নিয়ে অনেক আলাপ হয়েছে, এবার তোমার কথা বলো।'

গল্প করতে করতে চলেছে, তাই সময় কেটে গেল দ্রুত। শেখুপুরা ছেড়ে চিচোকি মালিয়ানের পথে চলেছে ওরা। টিপ-টিপ করে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে। লায়লা বলে চলেছে নিজের জীবনের নানা ঘটনার কথা, আলম ভাইয়ার কথা, ছোট ভাই হিপ্পি আবলুর কথা, আব্বার কথা, মায়ের কথা। দশ বছর বয়সে মাকে হারিয়েছে, সেই সব স্মৃতি।

'সামসুল আলম ভালবাসে তোমাকে,' বলল রানা।

'হয়তো,' বলল লায়লা। 'কিন্তু কোনদিন প্রকাশ করেনি সেকথা। বড় মায়া হয় মানুষটার জন্যে। চোখের সামনে দেখছি মারা যাচ্ছেন উনি, কিন্তু কিছুই করবার নেই।'

'মারা যাচ্ছেন মানে?'

'আপনি জানেন না বুঝি? ভয়ঙ্কর অসুখ হয়েছে ওর। অ্যাওরটিক অ্যানিউরিজম্—নাক মুখ দিয়ে মাঝে মাঝে গল গল করে রক্ত পড়ে। ডাক্তার বলেছে, যদি কমপ্লিট রেস্ট নেয় তাহলে আর বড়জোর দু'মাস বাঁচবে। কিন্তু বিশ্রাম নেবার লোকই নয় সে। বলে, কি হবে দু'দিন আগে বা পরে গেলে? কাজের মধ্যে থেকে মরতে চাই আমি।'

রানা মনে মনে ভাবল, এই জন্যেই এত দুর্ধর্ষ হতে পেরেছে আলম। মৃত্যুরই যার ভয় নেই, তার আবার বিপদের ভয় কি, কোন ঝুঁকিই ওর কাছে ঝুঁকি নয়।

পথে চেকিং হলো না কোথাও।



শালিমার গার্ডেনের সামনে এসে গাড়ি থামাল রানা। আর এক সাথে যাওয়া ঠিক না। বলল, 'এবার যে যার পথে কেটে পড়ব আমরা। আমি হোটেলে ফিরছি। এগারটন রোডে দেখা হবে রাত বারোটায়। গাড়িটা নিয়ে যাও তুমি, বাড়ির কাছাকাছি কোন একটা রাস্তায় পার্ক করে হেঁটে চলে যেয়ো।'

রানার সাথে সাথে গাড়ি থেকে নামল লায়লাও। হঠাৎ জড়িয়ে ধরল রানার গলা। অনভ্যস্ত, অপটু এক জোড়া ঠোঁট চেপে ধরল রানার ঠোঁটে। রানা সাড়া দেয়ার আগেই সরে গেল লায়লা। বলল, 'দুঃসাহস, নিষ্ঠুরতা আর বিনয়ের পুরস্কার।'

একরাশ ক্ষুধা নিয়ে হোটেলে ফিরল রানা।

দরজার তালা পরীক্ষা করে বুঝল ওর অনুপস্থিতিতে ঘরে ঢোকেনি কেউ। ঘরে ঢুকে চারদিক পরীক্ষা করল। না, যেমন ছিল তেমনি আছে সব।

টেলিফোনে হুকুম করল সে ম্যানেজারকে খাবার দিয়ে যাবার জন্যে। তারপর ভিজে জামা কাপড় ছেড়ে দাঁড়াল শাওয়ারের নিচে। সমস্ত ক্লান্তি দূর হয়ে গেল রানার।

খাওয়া-দাওয়া সেরে বিছানায় শুয়ে একটা সিগারেট ধরাল রানা। এখানকার কাজ শেষ। ব্রিগেডিয়ার নিশ্চয়ই পৌঁছে গেছেন এতক্ষণে এগারটন রোডে। একটা জট ছাড়ানো গেছে। এবার আবার যেতে হবে গুজরানওয়ালায়। মেয়েগুলোকে উদ্ধারের ব্যাপারে দুই বুড়ো কি প্ল্যান ঠিক করেছে কে জানে। যাই হোক, ওই মেয়েদের না নিয়ে ফিরতে পারবে না সে বাংলাদেশে—এটুকু বুঝে নিয়েছে রানা। কানে ভেসে এল সেই বাচ্চা মেয়েটির কান্না: তুমি আমার বাবার বয়সী, ছেড়ে দাও, নয় মেরে ফেলো একেবারে···দয়া করো, আর পারি না···উহ্! মেরো না, মেরো না, শুনছি···

মাথা ঝাঁকিয়ে দূর করে দিল রানা চিন্তাটা। কিন্তু এক চিন্তা গেলে আরেক চিন্তা আসে। নানান কথা ঘুরপাক খাচ্ছে মনের মধ্যে। মনটা মুহূর্তে চলে গেল হাজার মাইল দূরের ঢাকায়। সোহেল, সোহানা, অফিসের আর সবাই ছবির মত মানসপটে এল, গেল। সেদিন সোহানা কথাই বলেনি ওর সাথে। ক'দিন আগে রানার আমন্ত্রণে ক্লাবে গিয়ে রানার সাথে চুম্বনরত অন্য মেয়েকে দেখে রেগে-মেগে বেরিয়ে গিয়েছিল। সেই থেকে কথা বন্ধ।

ধীরে ধীরে অতীতে চলে গেল মনটা। মনে পড়ছে অতীতের অনেক, অনেক দিনের স্মৃতি। কত টুকরো টুকরো পুরানো কথা। জীবনের কত বিচিত্র ঘটনার কথা। প্রবল এক স্রোতের টানে চলেছে সে ভেসে। কোথায় এর শেষ? মৃত্যু?

লায়লার কথা ভাবল রানা। ক্ষণিকের মোহ। কিন্তু এর মূল্যও কম নয়।

সিগারেট শেষ করেই উঠে পড়ল রানা। অনেক দূর যেতে হবে। নতুন এক গ্রহ
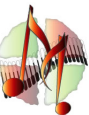
স্যুট পরে নিল সে। তার উপর পরে নিল রেইন-কোট। দরজায় চাবি লাগিয়ে দিয়ে এগোল সে সরু করিডর ধরে। করিডরের শেষ প্রান্তে এসে মনে হলো যেন ওর ঘরের টেলিফোনটা বাজছে। একটু থমকে দাঁড়াল রানা। তিনবার, চারবার, পাঁচবার···বেজেই চলেছে। ওর ঘরেই বাজছে, নাকি অন্য কোথাও, ঠিক ঠাহর করতে পারল না। আবার ফিরে গিয়ে পরীক্ষা করে দেখার বিশেষ আগ্রহ বোধ করল না সে। কাঁধটা একবার ঝাঁকিয়ে সুইংপার প্যাসেজ দিয়ে বেরিয়ে গেল সে রাস্তায়।

বৃষ্টির জন্য রাস্তাঘাট প্রায় জনশূন্য। মিনিট পাঁচেক হাঁটার পর নিশ্চিত হলো রানা—অনুসরণ করছে না কেউ। সবাই দ্রুত বাড়ি ফেরার তালে আছে। আজ রাত প্রেমের রাত।

গত কালকের কথা মত গ্যারেজের দরজাটা খোলা। ভিতরটা অন্ধকার। বিনা দ্বিধায় অন্ধকার গ্যারেজে ঢুকে পড়ল রানা। বাম পাশের দেয়ালের গায়ে বসানো ছোট্ট দরজাটার দিকে চলল সে কোনাকুনি। ঠিক চার পা এগোতেই ফ্লাড লাইট জ্বলে উঠল গ্যারেজের মধ্যে। তীব্র আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে গেল রানার। কিছু দেখতে পাচ্ছে না, কিন্তু স্পষ্ট শুনতে পেল সে খটাং করে লেগে গেল লোহার গেটটা। আঁৎকে ওঠা ঘোড়ার মত থমকে দাঁড়াল রানা। বার কয়েক চোখ মিটমিট করে আলোটা সইয়ে নিল সে চোখে, তারপর চাইল চারপাশে।

গ্যারেজের চারকোণে চারজন কালো রেইন-কোট পরা লোক মিটিমিটি হাসছে। চারজনের হাতের অটোমেটিক কারবাইনগুলোও যেন মুচকে হাসছে ওর বুকের দিকে চেয়ে। বিদ্রূপের হাসি। পাকিস্তান আর্মি ইন্টেলিজেন্স। এক নজরেই চেনা যায় ওদের স্পষ্ট। ভুল হবার কথা নয়।

দরজা দিয়ে গ্যারেজে ঢুকল পঞ্চম এক ব্যক্তি। পাতলা ছিপছিপে। সম্ভ্রান্ত চেহারা। উজ্জ্বল বুদ্ধিদীপ্ত নীল দুই চোখ। মৃদু হেসে বিদেশী কায়দায় মাথা নত করে অভিবাদন জানাল রানাকে।

কর্কশ, খনখনে গলায় বলল, 'আসুন, আসুন, মিস্টার শরাফ আলী। আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছি আমরা। বাংলাদেশ কাউন্টার স্কুলিশনেসের প্রতিভাবান গর্দভ আপনি—কর্নেল মুজাফ্ফর খানের অভিবাদন গ্রহণ করুন।'



# বিপদজনক-২

প্রথম প্রকাশ: নভেম্বর, ১৯৭২

## চোদ্দ

একটি কথাও বেরোল না রানার মুখ থেকে। একটুও নড়াচড়া করল না সে। পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইল গ্যারেজের মাঝখানে। আকস্মিক ধাক্কাটা সামলে নিতেই তার জায়গায় এল তিক্ত একটা উপলব্ধি। ধীরে ধীরে চোয়ালটা নিচে নেমে মুখটা হা হলো খানিকটা, চোখ দুটো একটু বিস্ফারিত। পরাজয়ের বিস্বাদ অনুভব করল সে শুকিয়ে আসা কণ্ঠতালুতে।

'শরাফ আলী!' ফিসফিস করে পাঞ্জাবীতে বলল রানা, 'আপনি কি বলতে চাইছেন আমি ঠিক বুঝতে পারছি না কর্নেল। কি হয়েছে? বন্দুক কেন? কি করেছি আমি? আমি তো কোন অন্যায় করিনি, স্যার!' রানার কণ্ঠস্বরে সত্যিকার বিস্ময় ফুটে উঠল। কারবাইন হাতে গার্ডগুলো একটু যেন হতভম্ব হয়ে এ ওর দিকে চাইল। এই লোকটা যে খাস পাঞ্জাবী তাতে ওদের বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। কিন্তু কর্নেল মুজাফ্ফরের উজ্জ্বল নীল চোখে বিন্দুমাত্র সন্দেহের রেখাপাত হলো না। হওয়ার কথাও নয়। অকুপেশনের নয়টা মাস অত্যন্ত দক্ষতার সাথে কাজ করেছে এই লোক বাংলাদেশে। এর অত্যাচারের কাহিনী রানার কানে পৌঁছেছে বহুবার। অত্যন্ত হিংস্র ও ধূর্ত বলে কুখ্যাতি অর্জন করেছিল সে বাংলাদেশে। কাষ্ঠ হাসি হাসল লোকটা।

'স্মৃতিভ্রম,' বলল কর্নেল শান্ত কণ্ঠে। 'এরকম হয়। হঠাৎ শক পেলে অনেকে নিজের নাম, বাপের নাম সব ভুলে যায়। অভিনয়টা চমৎকার হয়েছে, প্রশংসা না করে পারছি না। বুঝতে পারছি, বাংলাদেশ তার সেরা এজেন্টকেই পাঠিয়েছে। অবশ্য মেজর জেনারেল রাহাত খানকে উদ্ধার করবার জন্যে সেরা লোক পাঠানোই স্বাভাবিক।'

রক্তশূন্য ফ্যাকাসে হয়ে গেল রানার মুখ। ব্যাপার কি! এই খবর যদি ওরা জেনে থাকে তাহলে সবই জেনেছে। সব আশা, সব ভরসা দপ করে নিভে গেল যেন ওর। কিভাবে জানল ওরা এসব? কে ধরা পড়ল!

'আমাকে ছেড়ে দিন, স্যার। আমি কোন অন্যায় করিনি। আমি পাঞ্জাবের লোক। শিয়ালকোটে বাড়ি। নাম আনিস আল্লাওয়ালা।'

'এখানে কি করতে ঢুকেছেন?'

'পেচ্ছাব করতে স্যার। পথ চলতে চলতে খুব জোর···'

'নর্দমা কোথায়?'

'লায়লা? লায়লা কে? লায়লা বলে কাউকে চিনি না তো আমি। ভুল হয়েছে আপনাদের। আমার নাম শরাফ আলী না, স্যার, আনিস আহ্রাওয়ালা। ড্রাইভিং লাইসেন্সটা দেখাচ্ছি।' পকেটে হাত ঢুকাল রানা। কিন্তু পিস্তলের বাঁট পর্যন্ত পৌঁছল না হাতটা। তার আগেই খনখনে গলায় গর্জে উঠল কর্নেল।

'খবরদার! হাত বের করে আনুন পকেট থেকে।'

বরফের মত জমে গেল রানার শরীর। বুঝল কর্নেলের হাতে ধরা রিভলভারটা দেরি করবে না এক মুহূর্ত। ধীরে ধীরে পকেট থেকে বেরিয়ে এল ওর খালি হাত। বিদ্রূপের হাসি ফুটে উঠল কর্নেল মুজাফ্ফরের ঠোঁটে। রানার কাঁধের উপর দিয়ে পিছনে চাইল কর্নেল।

'বাহাদুর খান! মিস্টার শরাফ আলী এইমাত্র পকেট থেকে পিস্তল বা ওই জাতীয় আপত্তিকর কিছু বের করতে যাচ্ছিলেন। ওঁকে এই প্রলোভন থেকে মুক্ত করো।'

ভারি একটা জুতোর শব্দ শোনা গেল পিছনে, পরমুহূর্তে আর্তনাদ করে উঠল রানা। ভীষণ জোরে আঘাত করল কেউ ওর পিঠে। শিরদাঁড়ার উপর পড়ল কারবাইনের কুঁদো। মাথা ঘুরে পড়ে যাচ্ছিল রানা, একটা শক্তিশালী হাত পিছন থেকে কলার চেপে ধরে দাঁড় করিয়ে রাখল ওকে, অন্য হাতটা চলে গেল রানা যে পকেটে হাত ঢুকিয়েছিল সেই পকেটে। প্রথমেই বেরোল রানার সাইলেন্সার ফিট করা লাইন এম. এম. ল্যুগারটা।

'বাহ, শিয়ালকোটের একজন শান্তিপ্রিয় নিরীহ নাগরিকের কাছে থাকবার মত জিনিসই বটে। নিশ্চয়ই রাস্তায় কুড়িয়ে পেয়েছেন ওটা আপনি?' রানার অন্য পকেট থেকে রিভলভারটা বেরোতেই গলার স্বরটা পাল্টে গেল কর্নেল মুজাফ্ফরের। 'আরে, এ তো আমাদের জিনিস! কেউ চিনতে পারো, এটা কার? দেখি, এদিকে দাও।'

অনেক কষ্টে চোখ খুলে চাইল রানা। দেখল বাহাদুরের ছুঁড়ে দেয়া রিভলভারটা খপ করে শূন্যে ধরে নিয়ে পরীক্ষা করছে কর্নেল। স্পেশাল অফিসারস কোয়ার্টারের সেই গার্ডের রিভলভার।

'আমি চিনতে পেরেছি, স্যার,' বাহাদুর নামধারী লোকটা কথা বলে উঠল রানার কানের পাশ থেকে। মিকি মাউজের মত কণ্ঠস্বর। ক্যারিক্যাচারের মত হাস্যকর। রানাকে ছেড়ে দিয়ে কর্নেলের দিকে এগিয়ে গেল বাহাদুর। রানা দেখল লোকটা পাহাড়ের সমান লম্বা। ছয় ফুট চারের কম হবে না। তেমনি পাশে। লোমশ হাত দুটো দেখেই বোঝা যাচ্ছে লোকটার সর্বশরীর ঘন লোমে আবৃত। নাকটা ভাঙা। বিকট চেহারা। চেহারার সাথে নামের মিল আছে, কিন্তু গলার স্বরের অদ্ভুত অসামঞ্জস্য। বলল, 'ওটা মুন্নার। এই যে ওর নামের প্রথম অক্ষর দুটো লেখা। এই রিভলভার কোথায় পেয়েছিস তুই (অকথ্য গালি)?'

'ওই পিস্তলটার সঙ্গেই। একটা পার্সেলের মধ্যে ছিল। জিন্না পার্কের...'



চোখের নিমেষে বাহাদুর খানের প্রকাণ্ড লোমশ হাতের এক থাবড়া এসে পড়ল রানার নাক-মুখের উপর। মাথাটা নিচু করবার আর সময় পেল না সে। ছিটকে গিয়ে ধাক্কা খেল রানা ওপাশের দেয়ালে, ওখান থেকে মাটিতে। টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল আবার। চোখে কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছে না। অনুভব করল নাক দিয়ে রক্ত ঝরছে ওর।

ঝড়ের বেগে এগোচ্ছিল বাহাদুর, মোলায়েম ভাবে শাসন করল কর্নেল ওকে।

'ধীরে, বাহাদুর, ধীরে। এত ব্যস্ততার কিছুই নেই। অনেক সুযোগ পাবে তুমি ভবিষ্যতে।' রানার দিকে ফিরল কর্নেল। 'কিন্তু বাহাদুরের দোষ দেয়া যায় না, মিস্টার শরাফ আলী। দোষ আপনার। বাহাদুরের সব চাইতে অন্তরঙ্গ বন্ধু মুন্না এখন হাসপাতালে মৃত্যু শয্যায়। বেঁচে আছে কি নেই কে জানে? বাথরুমেই অর্ধেক প্রাণ বেরিয়ে গিয়েছিল ওর। এই অবস্থায় বাহাদুর যদি মাথা ঠিক না রাখতে পারে তবে ওকে বড় একটা দোষ দেয়া যায় না।' দৈত্যটার পিঠে দুটো থাবড়া দিল কর্নেল। 'এই লোকটা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর বাহাদুর খান। একে আঘাত করার সময় সাবধান না থাকলে বিপদে পড়বে।'

একজন গার্ডকে আদেশ দিল কর্নেল হেডকোয়ার্টারে ফোন করে ভ্যান পাঠাবার বন্দোবস্ত করতে। তারপর রানার দিকে ফিরে বলল, 'মিনিট দশেক লাগবে ভ্যান এসে পৌঁছতে। ততক্ষণে আপনার কার্যকলাপের একটা রিপোর্ট তৈরি করে ফেলা যাক। কি বলেন? ভেতরে নিয়ে এসো মিস্টার শরাফ আলীকে।'

মেজর জেনারেল রাহাত খানের চেয়ারে বসল কর্নেল মুজাফ্ফর। রানাকে দাঁড় করানো হলো সেক্রেটারিয়েট টেবিলের সামনে। একটা কাগজ আর কলম নিয়ে প্রস্তুত হলো কর্নেল।

'আপনার সম্পর্কে অনেক কিছুই জানি আমরা। কাজেই মিথ্যে কথা বলে আমাদের ধোঁকা দেয়ার চেষ্টা করে লাভ হবে না কোন। আর সবাই সবকিছু স্বীকার করেছে। ওই প্রকাণ্ড চওড়া কাঁধের লোকটা তো বাহাদুরের হাতের এক থাবড়া খেয়ে কেঁদেই ফেলেছে হাউমাউ করে। ওর কাছ থেকেই বেরিয়েছে সব কথা। তাছাড়া আবদুও সব স্বীকার করেছে। আমি কথা দিচ্ছি, সব কথা অকপটে বললে আপনাকে কোন রকম নির্যাতন করা হবে না।' রানা বুঝল বাঁধা গৎ বলে যাচ্ছে কর্নেল। ঠিক এমনি ভাবে জেরা শুরু হত ঢাকায় মুক্তিযোদ্ধা সন্দেহে নিরীহ লোক ধরে এনে। তারপর শুরু হত চরম নির্যাতন। বলেই চলেছে কর্নেল, 'কথা দিচ্ছি, একটা চিমটি পর্যন্ত লাগবে না আপনার গায়ে। সাধারণ কোর্টে বিচারের ব্যবস্থা হবে আপনার। ন্যায়সঙ্গত এবং উপযুক্ত শাস্তিই হবে আপনার, তার বেশি নয়। কিন্তু যদি শুধু শুধু দেরি করবার চেষ্টা করেন, তাহলে...' হাসল কর্নেল বাহাদুরের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে।

এত কথা না বললেই ভাল করত কর্নেল। কারণ এই কথাগুলো থেকেই পরিষ্কার
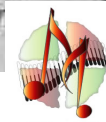
বুঝে নিল রানা. মেজর জেনারেলের দলের কেউ ধরা পড়েনি। কাউকেই ধরতে পারেনি ওরা। লায়লাকেও না। বড় জোর কায়েস আলীর চেহারা দেখেছে এদের কেউ দূর থেকে। কায়েসের পক্ষে সব কথা বলা অসম্ভব—আসলে ও জানেই না সব কথা। তাছাড়া শারীরিক নির্যাতনের ভয়ে কায়েস আলী এদের কাছে কোন কিছু স্বীকার করছে, একথা কেন জানি রানার কাছে কিছুতেই বিশ্বাসযোগ্য মনে হলো না। এরা তো কেউ কায়েসের হাতের চাপ খায়নি! কায়েস ধরা পড়লে ভূমিকম্প হয়ে যেত এই ঘরের মধ্যে—দেয়ালগুলো আর খাড়া থাকত না।

'আচ্ছা, শুরু করা যাক। আপনার নামটা আপাতত শরাফ আলীই ধরে নিলাম। বলুন দেখি, কোন্ পথে ঢুকলেন এদেশে? রাস্তায় অসুবিধা হয়নি তো কোন?'

'ঢুকলাম এদেশে! রাস্তায় অসুবিধা!' বিস্মিত চোখ তুলল রানা কর্নেলের দিকে। 'আমি বুঝতে পারছি স্যার, মারাত্মক কোন ভুল হয়েছে আপনাদের। আমাকে শরাফ আলী বলে ডাকছেন, চিনি না জানি না কে এক লায়লার কথা জিজ্ঞেস করছেন...অন্য লোক মনে করে আমাকে ধরে...' হঠাৎ লাফ দিয়ে সরে গেল রানা একপাশে কর্নেলকে বাহাদুরের দিকে চেয়ে মাথাটা একটু ঝাঁকাতে দেখে। খচ্ করে উঠল শিরদাঁড়ার ব্যথাটা। সরে গিয়েই ঘুরে দাঁড়াল সে। প্রচণ্ড জোরে গাঁট্টা চালিয়েছিল বাহাদুর রানার মাথা লক্ষ্য করে, পিঠের উপর দিয়ে ফস্কে গেল হাতটা। সাথে সাথেই দেহের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলল বাহাদুর। এবং রানাও পূর্ণ সদ্ব্যবহার করল এই সুযোগের, ভুল হলো না ওর। আর্মি চেকপোস্টের ছোকরা লেফটেন্যান্টকে যেখানটায় মেরেছিল, বাহাদুরের ঠিক সেইখানটায় লাথি বসিয়ে দিয়েছে রানা, কিন্তু দশগুণ জোরে, প্রাণপণ শক্তিতে।

লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল কর্নেল। হাতে পিস্তল। অসহ্য ব্যথায় মাটিতে পড়ে গোঁ-গোঁ করছে আর গড়াগড়ি খাচ্ছে বাহাদুর খান। লাথি মারতে গিয়ে ডান পায়ের কব্জিতে ব্যথা পেয়েছে রানা, বাম পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে চুপচাপ। কারবাইন হাতে ছুটে আসছে ওর দিকে অপর দু'জন গার্ড। হাত তুলে ওদের থামবার ইঙ্গিত করে মৃদু হাসল কর্নেল মুজাফ্ফর।

'নিজের মৃত্যুদণ্ড নিজেই ঘোষণা করলেন মিস্টার শরাফ আলী। কিন্তু স্পষ্ট বুঝতে পারছি, বোমা মারলেও কথা বেরোবে না আপনার পেট থেকে। এজন্যে অন্য ব্যবস্থা আছে আমাদের। আপাতত চলুন হেডকোয়ার্টারে। কিন্তু দ্বিতীয়বার আক্রমণাত্মক মনোভাব প্রকাশ পেলে, কিংবা তার আভাস পেলেই গুলি করব বিনা দ্বিধায়। কাজেই সাবধান।'

গ্যারেজের বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছে ভ্যান। চারদিক বন্ধ। অনেকটা প্রিজন ভ্যানের মত। সবাই উঠে পড়ল ভ্যানে। দৈত্যাকার বাহাদুর খানকে কয়েকজন মিলে ধরাধরি করে তোলা হলো গাড়িতে। ব্যথায় মাঝে মাঝে কুঁচকে উঠছে ওর বিকট মুখ। প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে গিয়ে ড্রাইভারের ঠিক পিছনে একটা বেঞ্চের উপর বসে



পড়ল সে। দরজার কাছাকাছি মুখোমুখি দুটো সীটের একদিকে বসল কর্নেল মুজাফ্ফর, অপর দিকে দু'জন গার্ড। রানাকে বসানো হলো মেঝের উপর ড্রাইভারের দিকে পিছন ফিরিয়ে। চতুর্থ গার্ড উঠল ড্রাইভারের পাশে।

প্রথম মোড় ঘুরতেই লাগল ধাক্কাটা। পনেরো সেকেণ্ডও হয়নি রওনা হয়েছে ভ্যানটা। প্রচণ্ড সংঘর্ষ হলো কিছুর সাথে। বিশ্রী ধাতব শব্দ। ভ্যানের যাত্রীরা ছিটকে পড়ল এ ওর গায়ে। রানার ঘাড়ে এসে পড়ল একজন প্রহরী।

ব্রেক কষেছিল ড্রাইভার। কিন্তু তাহলে কি হবে—এক মুহূর্ত আগেও সে দেখতে পায়নি, সুযোগই পায়নি প্রস্তুত হবার। চৌরাস্তার মোড়ের উপর সান বাঁধানো আয়ল্যাণ্ডের সঙ্গে জোরে ধাক্কা খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল গাড়ি।

উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে সবাই। সবার অলক্ষ্যে চলে এসেছে রানা দরজার কাছাকাছি. ঠিক এমনি সময়ে ঝটাং করে খুলে গেল পিছনের দরজাটা, এবং সাথে সাথেই নিভে গেল গাড়ির ভিতরের লাইট। পরমুহূর্তেই জ্বলে উঠল দুটো শক্তিশালী টর্চ। টর্চের পাশেই দুটো পিস্তলের নল চকচক করছে। একটা কর্কশ গলায় আদেশ এল মাথার উপর হাত তুলে রাখবার। টর্চ দুটো সরে গেল দু'পাশে। হুড়মুড় করে গাড়ির মধ্যে এসে পড়ল চতুর্থ গার্ডটা। তার পিছন পিছন ড্রাইভার। পরমুহূর্তে প্রায় উড়ে এসে গাড়ির ভিতর উঠে পড়ল একটা বাচ্চা ব্লাড হাউণ্ড। গুপ্ত! দড়াম করে লেগে গেল পিছনের দরজা। জানালা দিয়ে অকম্পিত হাতে ধরা আছে টর্চ আর পিস্তল। কয়েক গজ পিছিয়ে এল ভ্যানটা সশব্দে সামনের বাম্পারটা কোন কিছুর সাথে ভেঙে রেখে। তারপর আবার এগোল সোজা রাস্তা ধরে। সমস্ত ঘটনাটা ঘটে গেল বিশ সেকেণ্ডের মধ্যেই। মনে মনে স্বীকার করতেই হলো রানাকে, নিপুণ হাতের কাজ। একফুট উঁচু, দু'ফুট লম্বা ভয়ঙ্কর দর্শন ব্লাড হাউণ্ডের বাচ্চাটা প্রবল বেগে লেজ নাড়ছে আর রানার হাত চাটছে।

এক সেকেণ্ডের জন্যে পিস্তলধরা একটা হাতের কব্জিতে বাঁধা কাফলিংক দেখতে পেয়েছে রানা টর্চের আলোয়। মেজর জেনারেল! এই বুড়ো বয়সে অ্যাকশনে নেমেছে মেজর জেনারেল—হাসি পেল রানার। হাসতে গিয়ে খচ্ করে উঠল পিঠের ব্যথাটা। প্রচণ্ড জোরে মেরেছিল বাহাদুর খান কারবাইনের বাঁট দিয়ে, অসহ্য টনটন করছে জায়গাটা। অবাক হয়ে ভাবল রানা, এতক্ষণ ব্যথাটা কোথায় ছিল? যেই নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়েছে, ওমনি অদূর ভবিষ্যতের ভয়ঙ্কর সব নির্যাতনের দুঃস্বপ্ন ছেড়ে বাস্তবে ফিরে এসেছে সে—চেগিয়ে উঠেছে ব্যথাটা। বসতে পেলে শুতে চায়—কথাটা অদ্ভুত সত্যি।

বুড়োর পাশের পিস্তলধারী নিশ্চয়ই আলম। গাড়ি চালাচ্ছে কায়েস অথবা আবদুল। লায়লা কোথায়? বাসায় পৌঁছবার আগেই সরিয়ে নিয়েছে এরা, নাকি নিজেই সাবধান হয়ে সরে গেছে কোথাও? নাকি ধরা পড়ল?

যাই হোক, আগের কাজ আগে। গুপ্তার মাথায় গোটা দুই চাপড় দিয়ে আদর
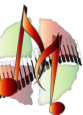
করল রানা। তারপর দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরে একে একে কারবাইনগুলো তুলল সে বেঞ্চির উপর, ঠেলে দিল পিছন দিকে। সেখান থেকে একে একে তুলে নিল সেগুলো একটা অদৃশ্য হাত, চলে গেল সেগুলো বাইরের অন্ধকারে। কর্নেলের পকেটে রাখা রিভলভার দুটোও একই ভাবে অদৃশ্য হলো। নিজের পিস্তলটা ভরল রানা কোটের পকেটে। তারপর বসল একটা বেঞ্চির উপর। মাথাটা ঘুরছে।

কিছুদূর গিয়ে কমে এল ভ্যানের গতি। পিছনের পিস্তল দুটো ইঞ্চি কয়েক এগিয়ে এল সামনে। রানাও বের করল পিস্তলটা। পিছন থেকে একটা কর্কশ কণ্ঠস্বর ভিতরের সবাইকে সাবধান করল, যেন টুঁ শব্দটি না করে। কর্নেল মুজাফ্ফরের জুলফির উপর ঠেসে ধরল রানা ওর সাইলেন্সার লাগানো লুগার। চেকপোস্ট। গাড়িটা থেমে দাঁড়াতেই কয়েকটা গৎ বাঁধা প্রশ্ন এবং কর্কশ হুকুমের সুরে উত্তর কানে এল। তারপর আবার ছুটল গাড়ি পূর্ণবেগে।

রানা ভাবছে, কোনদিকে চলেছে? চেকপোস্ট কেন? গুজরানওয়ালা থেকে ফেরার পথে তো কোন চেক হয়নি। সেটা কি ইচ্ছাকৃত? লায়লার উদ্ধার সম্পর্কে জানে কর্নেল, আশা করেছিল ওদের দু'জনকেই পাওয়া যাবে এগারটন রোডের বাসায়। কিন্তু জানল কি করে? সবটা ব্যাপার কেমন যেন গোলমাল লাগছে।

আবার চেকপোস্ট। একই ব্যাপারের পুনরাবৃত্তি হলো পরের চেকপোস্টে। তারপর দশ মিনিট সোজা চলার পর ডানদিকে মোড় নিয়ে অপেক্ষাকৃত খারাপ রাস্তা দিয়ে চলতে শুরু করল ভ্যানটা। গ্রাম্য পথ। খুব সম্ভব শাহদারা থেকে সিধানওয়া হয়ে পাসরুরের দিকে চলেছে ভ্যান। দুটো টর্চ আর দুটো পিস্তল স্থির হয়ে চেয়ে রইল যাত্রীদের দিকে। প্রত্যেকটা গার্ড অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দুশ্চিন্তায় ভীত, কেবল কর্নেল মুজাফ্ফর বসে রইল দৃঢ়, নির্ভীক ভঙ্গিতে—মুখে ভয় ভাবনার বিন্দুমাত্র ছায়া নেই। জয় এবং পরাজয়কে একই বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গিতে গ্রহণ করেছে সে।

প্রায় আধঘণ্টা পর বিকৃত কর্কশ কণ্ঠস্বরে আবার কথা বলে উঠল আলম।

'জুতো-মোজা খুলে ফেলো সবাই একজন একজন করে। বেঞ্চির উপর সাজিয়ে রাখো।'

সবাই আদেশ পালন করল একে একে। কর্নেল মুজাফ্ফরও।

'চমৎকার। এবার ইউনিফরমগুলোও দয়া করে খুলতে হবে,' বলল সেই কণ্ঠ। আদেশ পালন করছে সবাই। তিন মিনিট চুপ করে থেকে বলল আলম, 'ঠিক আছে। জাঙ্গিয়া খুলতে হবে না। এবার শোনো মন দিয়ে। রাভী নদী পার হয়ে ভারতীয় এলাকায় নামিয়ে দেয়া হবে তোমাদের। নৌকোটা ফেরত নিয়ে আসব আমরা এপারে। সাঁতার কেটে নদী পেরোবার সাধ্য নেই তোমাদের। ডাঙ্গার দিকে গেলে কিংবা হৈ-হল্লা করলে ধরা পড়বে ভারতীয় গার্ডদের হাতে। কাজেই আজকের রাতটা নদীর ধারে ঝোপ-ঝাড়ে লুকিয়ে থেকে কাল দিনের বেলায় সুযোগ বুঝে নদী পেরোতে পারবে কোন মাঝির সাহায্যে। সকালে কোন না কোন মোষের গাড়ি বা



কপাল ভাল হলে ট্রাক পেয়ে যাবে লাহোর ফেরার জন্যে।'

'এসবের কি অর্থ?' জিজ্ঞেস করল কর্নেল মুজাফ্ফর।

'অর্থ হচ্ছে এই যে, তোমরা কাউকে সাবধান করতে পারছ না আজ রাতে। কেউ জানে না যে আমরা আর্মি ইন্টেলিজেন্সের ভ্যান নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছি। জাসার থেকে সীমান্ত পেরিয়ে আমরা ট্রেনে করে চলে যাব অমৃতসর। আরও প্রায় ষাট সত্তর মাইলের ব্যাপার। এই পথটুকু নিরুপদ্রবে পার হতে চাই আমরা। জাসার পৌঁছে ভ্যানটা খাদের মধ্যে ফেলে দিয়ে চলে যাব ভারতে।'

'আমাদের খুন করে রেখে গেলেই কি তোমাদের পক্ষে বেশি নিরাপদ হত না?'

'তা হত, কিন্তু আমরা তোমাদের মত পিশাচ নই। অকারণ গণহত্যা আমরা ঘৃণা করি।'

থেমে গেল ভ্যান একটা সাইড ট্র্যাক ধরে কিছুদূর এগিয়ে। পিছনের কপাট দুটো খুলে গেল ঝটাং করে। একে একে নেমে গেল ড্রাইভার ও গার্ড চারজন, বাহাদুর নামল খুঁড়িয়ে। সবশেষে নামল মুজাফ্ফর। একলাফে নেমে গেল কুকুরটাও।

রাভী নদীর ঠাণ্ডা বাতাস এসে লাগল রানার চোখে মুখে। অত্যন্ত দুর্বল বোধ করছে রানা। শুয়ে পড়ল বেঞ্চির উপর। পিছনের দরজাটা সশব্দে বন্ধ হয়ে যেতেই চোখ মেলল সে। কতক্ষণ পার হয়ে গেছে বুঝতে পারল না প্রথমে, কোথায় আছে তাও বুঝতে পারল না। গাড়িটা নড়ে উঠতেই মনে পড়ে গেল সব। মিনিট দশেকের জন্যে ঘুমিয়ে পড়েছিল সে, কর্নেল আর গার্ডদের নদীর ওপারে নামিয়ে দিয়ে ফেরত এসেছে এরা। চলতে আরম্ভ করল ভ্যান।

জ্বলে উঠল গাড়ির ভিতরের বাতি। রানার চেহারাটা আর দর্শনযোগ্য নেই। 'ইশ্শ্!' বলে উঠল একটা নারীকণ্ঠ। কিন্তু কথা বলল আলমই প্রথম।

'আহা, দেখে মনে হচ্ছে ঘোড়ার গাড়ির তলায় পড়েছিলেন, মিস্টার মাসুদ রানা। হয় তাই, নয়তো বাহাদুরের সাথে কিছুক্ষণ ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচয় হয়েছে।'

'আপনি চেনেন ওকে?' কেমন একটা খশখশে শব্দ বেরোল রানার গলা দিয়ে। নিজের কণ্ঠস্বর চিনতে পারল না নিজেই।

'আর্মি ইন্টেলিজেন্সের সবাই চেনে ওকে। সামরিক বাহিনীর বাঙালী অফিসার আর জোয়ানদের অর্ধেক লোকই চেনে ওকে হাড়ে হাড়ে। কর্নেল মুজাফ্ফরের প্রিয় দৈত্য। কিন্তু দৈত্যটাকে আজ যেন একটু কাহিল দেখলাম?'

'আমি মেরেছি।'

'আপনি মেরেছেন! বলেন কি সাহেব! আপনি মেরেছেন বাহাদুর খানকে? আপনি দেখছি রীতিমত নমস্য...'

'আহ্, তুমি থামবে, আলম ভাই?' ধমকে উঠল লায়লা। 'ওর চেহারাটা দেখছ? এক্ষুণি কিছু করা দরকার।'

'আবলুকে থামতে বলো,' শান্ত গলায় বললেন মেজর জেনারেল। রানার মুখের দিকে ভাল করে লক্ষ করে বললেন, 'তুমি জখম হয়েছ, রানা। মুখটা তো দেখতেই পাচ্ছি, আর কোথায় লেগেছে?'

'পিঠে, স্যার। রাইফেলের কুঁদো। ঠিক শিরদাঁড়ার ওপর। জায়গাটাতে আর কোন সাড়া পাচ্ছি না।'

গাড়িটা থামিয়ে এক লাফে নেমে এল আবলু। উত্তেজনায় টগবগ করে ফুটছে সে। আলমকে বলল, 'কারবুরেটারে ময়লা আছে, প্লাগগুলোও অপরিষ্কার, স্পীড উঠছে না, আলম ভাই।' প্রশংসা পাওয়ার জন্যে বলল, 'উহ্, দারুণ গোঁত্তা দিয়েছিলাম জানটার নাকের ওপর, না? একেবারে চি…ও…প্যাক্কা!'

'চোপ!' ধমক দিল আলম। 'তুই কথা বলবি না আমার সাথে। আমার সাধের শেভ্রোলেটা সর্বনাশ করে দিয়ে আবার বাহাদুরী মারতে এসেছে!'

'বারে! আমার কি দোষ? শালিমার গার্ডেনের সামনে ওকে তুলে নিলেই ঝামেলা চুকে যেত। তুমিই তো দিলে না। তুমিই তো বললে জেমস বণ্ডের মত…'

'বলেছিলাম, ক্র্যাশটাও হয়েছে এক্সপার্টের হাতের কাজ, কিন্তু আমার গাড়িটা তো গেল। নে, এখন একটু পানির ব্যবস্থা কর। যাকে সেভ করলি, তার অবস্থাটা দ্যাখ।'

ডান ভুরুটা আধ ইঞ্চি উপরে তুলে পরীক্ষা করল আবলু রানাকে। তারপর বলল, 'নো প্রব্লেম। এক্ষুণি গরম পানির ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।' গলার স্বরটা এক পর্দা চড়িয়ে দিয়ে বলল, 'কাফ্লেস চাচা, বনেটটা খোলো।' গার্ডদের খুলে রাখা ইউনিফরম থেকে পরিষ্কার দেখে গোটা দুই শার্ট বেছে নিয়ে নেমে গেল সে। আধ মিনিটেই ফিরে এল চুপচুপে ভেজা শার্ট হাতে। গরম ভাপ বেরোচ্ছে শার্টের গা থেকে। র‍্যাডিয়েটারে চুবিয়ে নিয়ে এসেছে সে ও দুটো।

আবলুর হাত থেকে শার্ট দুটো নিয়ে লায়লার দিকে বাড়িয়ে দিল আলম। বলল, 'মেয়েমানুষের কাজ। পিঠে সেঁক দাও প্রথমে। কাপড়টা ঠাণ্ডা হয়ে এলে মুখ-টুখ মুছে দিয়ো। এখন দু'একটা ট্যাবলেট পেলে কাজ হত। কিন্তু নেই। বিকল্প উপায়…' ঘাড়ের কাছে চুলকাল আলম। 'যা তো, আবলু, আনিস আল্লাওয়ালার শরাবের বোতল থেকে আউন্স চারেক হুইস্কি নিয়ে আয়। নে, চটপট কর, তারপর গাড়ি ছেড়ে দে।'

গরম সেঁক পেয়ে কিছুটা আরাম বোধ করল রানা। একটা শার্ট পিঠের নিচে রেখে অপরটা দিয়ে আলতো হাতে মুছতে শুরু করল লায়লা রানার মুখের শুকিয়ে যাওয়া চটচটে রক্ত। পিছনের দু'পায়ে ভর দিয়ে বসে রানাকে লক্ষ করছে গুণ্ডা। কাটা জায়গাগুলোর অসম্ভব জ্বলুনিতে ককিয়ে উঠল রানা। সহানুভূতি প্রকাশ করার জন্যে কাছে ঘেঁষে এল গুণ্ডা—চেটে দিল রানার গাল। লম্বা হয়ে শুয়ে আছে রানা সীটের উপর। মনের মধ্যে কতগুলো প্রশ্ন বড় বেশি খোঁচাখুঁচি শুরু করেছে। চোখ



খুলল রানা। চোখ পড়ল লায়লার চোখে। উদ্বিগ্ন চোখে চেয়ে আছে লায়লা, মিষ্টি করে হাসল। গুণ্ডার চোখে চোখ পড়তেই 'কেঁউ' বলে আনন্দ প্রকাশ করল সে। আলমের চোখে চোখ পড়ল রানার। চট্ করে চোখ সরিয়ে নিয়ে বাইরের দিকে চাইল আলম।

'কিন্তু সব কিছু ভণ্ডুল হয়ে গেল কেন?' জিজ্ঞেস করল রানা দুই ঢোক হুইস্কি খেয়ে। 'ওরা টের পেল কি করে? কি হয়েছিল? তাছাড়া ব্রিগেডিয়ার জামান গেলেন কোথায়?'

'আমরা সবাই ভুল করেছি রানা,' বললেন মেজর জেনারেল। 'প্রত্যেকে মারাত্মক ভুল করেছি। তুমি, আমি, আলম, আর্মি ইন্টেলিজেন্স—সবাই। প্রথম ভুলটা অবশ্য আমরাই করেছি। বাড়ির আশে পাশে ক'দিন ধরে দু'জন লোক ঘুরঘুর করছিল, ওদের ব্যাপারে আরও সাবধান হওয়া উচিত ছিল আমাদের। কিন্তু সবচেয়ে বড় ভুল করেছ তুমি। লায়লার কাছে তোমার স্পেশাল অফিসার্স কোয়ার্টারের অভিযান সম্পর্কে শুনেছি। সঙ্কেত পাওয়ার সাথে সাথেই পালিয়ে এসে আমাদের সাথে মিলিত হবার কথা ছিল জামানের। কিন্তু এল না কেন বলতে পারো?'

'কেন?' বিস্মিত হলো রানা।

'ব্রিগেডিয়ারের সাথে যখন কথা বলছিলে তখন একটা মস্ত বড় ভুল করেছ তুমি। সেজন্যে ব্রিগেডিয়ার না এসে এশারুটনের বাড়িতে এসে উপস্থিত হয়েছে কর্নেল মুজাফ্ফর।'

'ঠিক বুঝলাম না, স্যার।'

'ওটা আসলে আমারই দোষ,' বলল শামসুল আলম। 'আমি জানতাম, কিন্তু ওকে সাবধান করতে ভুলে গিয়েছিলাম।'

'কি বলছেন বুঝতে পারছি না। কি ভুলে গিয়েছিলেন?' বলল রানা।

'ঘরের মধ্যে মাইক আছে কিনা পরীক্ষা করেছিলেন?' জিজ্ঞেস করল আলম।

'নিশ্চয়ই। কাবার্ডের মধ্যে লুকানো ছিল।'

'বাথরুম দেখেছিলেন?'

'বাথরুমে ছিল না।'

'ছিল। শাওয়ারের মধ্যে ছিল লুকানো,' বললেন মেজর জেনারেল। 'আলম বলছে, প্রত্যেকটা অ্যাপার্টমেন্টের বাথরুমের শাওয়ারের ভিতরই লুকানো আছে একটা করে মাইক্রোফোন। শাওয়ারটা নিশ্চয়ই পরীক্ষা করোনি তুমি।'

'শাওয়ার!' উঠে বসল রানা। 'মাইক্রোফোন!' মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করছে ওর। 'তাহলে যা যা বলেছি…'

থেমে গেল রানা। এতক্ষণে বুঝল, কর্নেল মুজাফফর ওকে শরাফ আলী বলে চিনল কি করে, এশারুটন রোডের বাড়িটার ঠিকানা জানল কি করে। উহ্! কী মারাত্মক ভুল করেছে সে! একে একে আরও দু'একটা কথা বুঝতে পারল রানা।
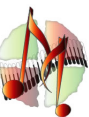
বুঝতে পারল কেন শাকিলা মির্জা বলেছিল: তোমার জন্যে অপেক্ষা করছিলাম আমরা। কেন বলেছিল মেজর জেনারেলের ঠিকানা জানা আছে ওদের। কেন হোটেল স্প্রিং ফিল্ডে ব্রিগেডিয়ারের কণ্ঠস্বর খনখনে ও কর্কশ লেগেছিল নায়লার কাছে। সব শেষ; হেরে গেছে রানা। এর পর ব্রিগেডিয়ারকে উদ্ধার করা এখন অসম্ভব। এমন নিষ্ঠুর পরাজয় আর হয়নি কখনও রানার।

'তোমার সাধ্যমত চেষ্টা তো তুমি করেছ, রানা।' মৃদু কণ্ঠে বলল নায়লা। 'এজন্যে নিজেকে দোষী করলে লাভ তো নেই-ই, বরং কষ্ট বাড়বে।'

সবাই চুপ করে থাকল কিছুক্ষণ। কাঁচা রাস্তার উপর টায়ারের একটানা শব্দ। এঞ্জিনের মৃদু কম্পন। উঁচু-নিচু জায়গায় পড়লে ঝাঁকিতে দুলছে সবাই। কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে পড়েছে গুণ্ডা সীটের নিচে। ধীরে ধীরে রানার চিন্তাটা পরিষ্কার হয়ে গেল। যেন আপন মনে কথা বলছে এমনি ভাবে কথা বলে উঠল রানা।

'ব্রিগেডিয়ারকে এতক্ষণে নিশ্চয়ই সরিয়ে ফেলা হয়েছে অন্য কোথাও, আরও কড়া পাহারার মধ্যে। সব গোলমাল হয়ে গেল। ভাগ্য ভাল, সবাই গ্রেপ্তার হয়ে যায়নি। একমাত্র লাভ হয়েছে, নায়লাকে ফেরত আনা গেছে। কিন্তু এতে লাভ কি হলো? হাতের মুঠোর মধ্যে নেই, তবু নায়লার ভয় দেখিয়ে ব্রিগেডিয়ারকে দিয়ে যা খুশি করাতে পারে ওরা। উনি তো আর জানেন না যে নায়লা মুক্ত হয়েছে। কিন্তু... বিদঘুটে লাগছে আমার কয়েকটা ব্যাপার। কয়েকটা জিনিসে খটকা...'

'কি জিনিস?' প্রশ্ন করলেন মেজর জেনারেল।

'প্রথম কথা, অফিসারস্ কোয়ার্টারেই যদি ওরা আমার কথাগুলো শুনতে পাচ্ছিল, তাহলে তখনই ধরেনি কেন আমাকে?'

'তোমার কথাগুলো টেপ রেকর্ড হয়ে গিয়েছে প্রথমে। পরে বাজিয়ে শুনেছে ওরা। ততক্ষণে বেরিয়ে গেছ তুমি ওখান থেকে।'

'কিন্তু, স্যার, আপনারা আগেই পালিয়ে গেছেন ওই বাড়ি থেকে। নায়লা ওখানে গিয়ে ধরা পড়ার আগেই ওকে সরিয়ে নেয়া হলো, কিন্তু আমি কি দোষ করলাম? আমাকে থামালেন না কেন?'

'নিশ্চয়ই তোমাকে কন্ট্যাক্ট করতে পারেনি আলম। ওর ওপরেই ভার ছিল। প্রশ্নটা আমার মনেও জেগেছে। অপারেশন-ইন-চার্জের কাছেই শোনা যাক উত্তরটা।'

একটু ইতস্তত করল আলম। তারপর বলল, 'আপনার হোটেলে ফোন করেছিলাম আপনাকে। পাইনি।'

'হ্যাঁ, আলম ভাই সোয়া এগারোটা থেকে পোনে বারোটা পর্যন্ত বহুবার ডায়াল করেছে হোটেলের নম্বরে। রিং হয়, কিন্তু ধরে না কেউ। বোধহয় ফোনটা খারাপ ছিল। শেষবারের মত আমিও চেষ্টা করে দেখলাম একবার পোনে বারোটায়, তারপর চলে গেলাম আমরা যার যার পজিশনে,' বলল নায়লা।



রানার মনে পড়ল হোটেল থেকে বেরোবার সময় টেলিফোন রিং-এর কথা। তখন পৌনে বারোটা বাজে। তার মানে নায়লার রিং শুনেছে সে। কিন্তু আলম যখন রিং করছিল, তখন তো সে ঘরেই ছিল; একবারও বাজেনি কেন ফোনটা? ইচ্ছাকৃত ভাবে অন্য নাম্বারে রিং করেছে আলম? কেন?

'কিন্তু...' রানা বলল, 'রাস্তাতেও তো আমাকে তুলে নিতে পারতেন আপনারা—কিংবা সাবধান করে দিতে পারতেন?' প্রশ্নটা করল রানা সরাসরি আলমের চোখের দিকে চেয়ে।

'পারতাম।' একটু সময় লাগল আলমের সঙ্কোচ কাটিয়ে উঠতে। তারপর ঝেড়ে ফেলল সমস্ত দ্বিধা। 'কর্নেল মুজাফফর হচ্ছে পাকিস্তান আর্মি ইন্টেলিজেন্সের ডেপুটি চীফ। যেমন বুদ্ধিমান, তেমনি ভয়ঙ্কর লোক। এত ধুরন্ধর লোক সারা আর্মি ইন্টেলিজেন্সে দ্বিতীয়জন আছে কিনা আমার সন্দেহ। কেবল ধূর্ত নয়, অদ্ভুত প্রতিভাবান এবং করিৎকর্মা এই লোক। এই একটি মাত্র লোককে আমি শ্রদ্ধার চোখে দেখি। নিশ্চয়ই লক্ষ করেছেন—ছদ্মবেশ থাকা সত্ত্বেও ভুলেও এর নজরের সামনে আসিনি আমি একবারও। ধরা পড়বার ভয়ে...'

'আসল কথায় আসুন মিস্টার আলম,' অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলল রানা। বলবার আগেই সমস্ত ব্যাপারটা বুঝে ফেলেছে সে। বুঝেই তিক্ত হয়ে গেছে রানার মনটা। আর কিছু না, ঈর্ষান্বিত প্রেমিকের কোপে পড়েছিল সে। সালিমার গার্ডেনের সামনে ওদেরকে চুম্বনরত অবস্থায় দেখেছিল আলম। বুকের মধ্যে কাঁটার মত বিঁধেছে দৃশ্যটা।

'এসে গেছি,' বলল আলম। 'আমাকে আপনি বা আর কেউ যেন ভুল না বোঝেন, সেজন্যেই এই ভূমিকার প্রয়োজন। যা বলছিলাম, এই লোকটি ইদানীং আমার প্রতি একটু সদয় ব্যবহার করছেন। ভয়ানক সন্দিগ্ধ হয়ে উঠেছি আমি এর ফলে। আপনাকে আগেই বলেছি মিস্টার রানা, সন্দেহের জোরেই বেঁচে আছি আমি আজ পর্যন্ত। কেন যেন আপনাকে পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারিনি আমি কিছুতেই। আমার মনে হয়েছে, আপনি কর্নেল মুজাফফরের লোক, আমাকে ধরার জন্যেই নিয়োগ করা হয়েছে আপনাকে।' মৃদু হাসল আলম। বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেছে নায়লার মুখ। মেজর জেনারেলের চোখ দুটোও সামান্য বিস্ফারিত। বলে চলল আলম, 'মেজর জেনারেল আপনাকে চেহারায় চিনতে পারেননি, গলার স্বর ও পরিচয় শুনে চিনেছেন। গুজরানওয়ালা থেকে লাহোর এলেন গাড়ি চালিয়ে, অথচ কোথাও চেক হলো না। এদিকে এগারটনের বাসায় এসে হাজির হলো আর্মি ইন্টেলিজেন্স। সন্ধে সাড়ে সাতটার পর থেকে রাত এগারোটা পর্যন্ত আপনার কোন খবর নেই। হঠাৎ রাত এগারোটায় ফোক্সওয়াগেন চালিয়ে হাজির হলো নায়লা গুজরানওয়ালা ক্যাম্প থেকে অতি নাটকীয় মুক্তির গল্প নিয়ে। বারবার রিং করছি হোটেলের নাম্বারে অথচ ধরছে না কেউ টেলিফোন। এতসব ব্যাপার সহজ ভাবে হজম করতে পারিনি
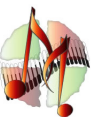
আমি।'

'আমাকে জিজ্ঞেস করলেই পারতে,' বললেন মেজর জেনারেল শান্ত কণ্ঠে।

'আমাকে তো এসব কথা বলোনি, আলম ভাইয়া!' রাগে দুঃখে লাল হয়ে গেছে লায়লার মুখটা। দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে নিজেকে সামলাবার চেষ্টা করল সে।

'তোমাকে আমরা সব সময় জীবনের কর্কশ দিকটা থেকে আড়াল রাখবার চেষ্টা করি, লায়লা। আর আপনাকে দুঃখ দিতে চাইনি বলে বলিনি, স্যার। সত্যি বলতে কি, আমি আর আবলু সারাটা পথ অনুসরণ করেছি আপনাকে মিস্টার মাসুদ রানা। আপনি লক্ষ করেননি, কিন্তু এ রাস্তায় ও রাস্তায়, এ বাড়ি ও বাড়ির সামনে পার্ক করা একটা গাড়িকেই কয়েকবার দেখেছেন আপনি। আমি আর আবলু নিচু হয়ে বসেছিলাম সেই গাড়ির মধ্যে। অন্ততঃপক্ষে ছয় সাতবার আমাদের গাড়ির পাশ দিয়ে হেঁটে গেছেন আপনি। ওই গাড়িটা দিয়েই গুঁতো মেরেছে আবলু এই ভ্যানকে। আমি আপনাকে যাচাই করে নিতে চেয়েছিলাম, মিস্টার মাসুদ রানা। কিন্তু ওরা যে এত তাড়াতাড়ি মারপিট শুরু করে দেবে ভাবতেও পারিনি। সেজন্যে আমি দুঃখিত।'

থামল আলম। এতগুলো কথার মধ্যে কয়েকটা বড় বড় ফাঁক আছে। স্পষ্ট বুঝতে পারছে রানা, আলম জানে এসব কথায় ভোলেনি সে, আসল কথা ঠিকই বুঝে নিয়েছে।

রানা দেখল চুপচাপ বসে আছেন মেজর জেনারেল রাহাত খান। আসল ব্যাপারটা উনি বুঝতে পেরেছেন কি পারেননি বোঝবার উপায় নেই।

'আপনার সন্দেহ নিরসন হয়েছে আশাকরি?' মৃদু হেসে বলল রানা। ইচ্ছে করলেই সে এই মুহূর্তে সবাইকে বুঝিয়ে দিতে পারে আলমের সত্যিকার উদ্দেশ্য। সবার কাছে ছোট করে দিতে পারে ওকে। কিন্তু কেন যেন মায়া হলো ওর লোকটার প্রতি। বেচারা আর দু'মাস বাঁচবে। এখন এই ভালবাসা অর্থহীন। মুখ ফুটে বলতে পারেনি, পারবেও না আলম। আর বলে লাভই বা কি। মনে মনে ক্ষমা করে দিল সে আলমের অক্ষম ঈর্ষা। ওকে লক্ষ করছিল আলম, চোখ তুলতেই চট করে অন্যদিকে চাইল। রানা বলল, 'আমি বুঝতে পারছি, আপনাকে যে টেনশনের মধ্যে থাকতে হয় তাতে সন্দেহপ্রবণ না হয়ে উপায় থাকে না। কিন্তু আপনার সন্দেহের এক ধাক্কা সামলাতেই ভয়ানক কষ্ট হচ্ছে, আরেক ধাক্কায় মারাই পড়ব। আপনি ক্লিয়াকেন্স সার্টিফিকেট না দিলে আর আপনার সাথে কাজ করব না, সাহেব।'

রানার এই প্রতিক্রিয়া দেখে খুশি হয়ে তাকালেন ওর দিকে একবার মেজর জেনারেল। ওঁর চোখে স্নেহ ঝরে পড়তে দেখে পরিষ্কার বুঝতে পারল রানা, ব্যাটা পাক্কা ঘুঘু। সম্পূর্ণ ব্যাপারটা জলের মত পরিষ্কার বুঝেছে বুড়ো আগা থেকে গোড়া পর্যন্ত। রানা যে পাল্টা আক্রমণ করল না, সেজন্যে মনে মনে খুশি হয়েছেন তিনি।

কিন্তু এত বড় নিষ্ঠুরতা হজম করতে পারছে না লায়লা। ক্ষোভে, দুঃখে জর্জরিত হচ্ছে ওর কোমল হৃদয়। রানাকে হাসতে দেখে বলল, 'নিষ্ঠুর লোকদের



কিছুতেই বুঝতে পারি না আমি। আলম ভাইয়াকে জানি নরম মনের মানুষ বলে, তাকে দেখছি কি আশ্চর্য নিষ্ঠুর হয়ে উঠেছে; আর এই নিষ্ঠুর মানুষটা মারধোর খেয়ে এখন আবার হাসছে। তোমাদের সবকিছুই অদ্ভুত!'

সবাই মিলে হাসল। সহজ হয়ে গেল আলম।

এইবার নিশ্চয়ই কাজের কথা পাড়বে বুড়ো, ভাবল রানা। ঠিক তাই। একটু কেশে গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে তৈরি হলেন বৃদ্ধ। তারপর বললেন, 'যাক, সব তো জেনে গেল, এখন কি করবে, রানা? সোজা বর্ডার?'

'বর্ডার তো নিশ্চয়ই, স্যার,' বলল রানা, 'কিন্তু ব্রিগেডিয়ার জামান আর ওই সাড়ে তিনশো মেয়েকে ছাড়া নয়।'

স্তব্ধ হয়ে গেল সবাই। বিস্মিত দৃষ্টিতে চাইল আলম রানার মুখের দিকে। এক মিনিট কেটে গেল চুপচাপ।

'কিন্তু... কিন্তু এটা তো অসম্ভব ব্যাপার, রানা!' বলল লায়লা।

'অসম্ভবকেই সম্ভব করতে হবে। করে ছাড়ব।'

'কিভাবে?' জিজ্ঞেস করল আলম।

'সবার চেষ্টায়। আমাদের লোক আমরা বাঘের খাঁচায় ছেড়ে দিয়ে দেশে ফিরতে পারি না।'

'ব্রিগেডিয়ারের কথা না হয় বুঝলাম, আমাদের দলের লোক। কিন্তু ওই মেয়েগুলো? ওদের আর আছে কি? এতগুলো ধর্ষিতা গর্ভবতী মেয়েকে দেশে ফিরিয়ে নিয়ে গরীব দেশের কি উপকার হবে?'

'উপকার-অপকার বুঝি না। ধর্ষিতা হওয়াটা ওদের অপরাধ নয়। ওরা বাঙালী, আমাদেরই মা-বোন-মেয়ে। বাংলাদেশেই স্থান পাবে ওরা। আমরা গরীব হতে পারি, কিন্তু আমাদের মেয়েদের আমরা পানিতে ভাসিয়ে দিতে পারি না। আমাদের মেয়ে আমরা ফেরত নিয়ে যাব যে-কোন অবস্থায়। ওদের কান্না শোনেননি আপনি, আমি শুনেছি।'

'কিন্তু ওদের জীবনের আর মূল্য কি?'

'নিজের কাছে সবারই জীবন মূল্যবান, মিস্টার আলম। কে মরতে চায়?'

'তাছাড়া আসল কথা হচ্ছে,' বললেন মেজর জেনারেল, 'আর সবাই রিপ্যাট্রিয়েশনের সময় বাংলাদেশে ফিরবে, কিন্তু এই মেয়েদের আর কোনদিন খুঁজে পাওয়া যাবে না। পাকিস্তান কখনও স্বীকার করবে না এদের অস্তিত্ব।'

'সে রকম ধরতে গেলে তো অন্যান্য ক্যাম্প থেকেও উদ্ধার করা দরকার হাজার হাজার মেয়েকে।'

'সন্ধান পেলে আমরা সে চেষ্টা করব বৈকি!'

'ভঁ। তাহলে দাঁড়াচ্ছে, ব্রিগেডিয়ার এবং সাড়ে তিনশো মেয়েকে ছাড়া ফিরছি না আমরা,' বলল শামসুল আলম। 'কিন্তু কিভাবে? কিভাবে মুক্ত করব এদের?'

# পনেরো

ঘুম ভাঙল রানার ভোর ছ'টায়। ছোট্ট একটা ঘরে শুয়ে আছে সে। রাত দুটোর সময় পৌঁছেচে ওরা এখানে এসে। রাস্তা থেকে মাইল খানেক বায়ে হেঁটে এই পল্লী। ব্রিগেডিয়ার জামানের গোপন আস্তানা। বৃষ্টিটা থেমে গিয়েছিল মাঝে কিছুক্ষণের জন্য, এখন আবার আরম্ভ হয়েছে।

শুয়ে শুয়ে কাচের জানালা দিয়ে ভোরের পূর্বাভাস দেখছিল রানা। পিঠের জ্বলুনিটা নেই, কিন্তু মাঝে মাঝে সবটা জায়গা ভূমিকম্পের মত কেঁপে উঠছে। সেই সাথে কাঁটা-ফোটানোর মত খচখচে ব্যথা। যতটা সম্ভব নড়াচড়া না করে সিগারেট ধরাল সে একটা। ঘুম পুরো হয়নি—বিস্বাদ মুখে কাগজ পোড়া গন্ধ লাগছে সিগারেটটা।

রাতেই আলম আর আবলু ফিরে গেছে লাহোরে। ভ্যানটাকে শহরের কাছাকাছি কোথাও ফেলে রাখতে হবে। এদিকে কোথাও ওটা পাওয়া গেলে চলবে না। তাছাড়া আলমের ফিরে যাওয়াটা একান্তই দরকার। এটুকু অন্তত নিশ্চিত হওয়া গেছে যে ওর উপর কোন সন্দেহ আসেনি কর্নেল মুজাফফরের। ব্রিগেডিয়ার জামানকে স্পেশাল অফিসারস কোয়ার্টার থেকে সরিয়ে কোথায় রাখা হয়েছে, সেটা জানার চেষ্টা করবে সে আজ অফিসে ডিউটিতে গিয়ে। এ খবর জানবার আর কোন রাস্তা নেই এছাড়া।

শান্ত ভাবে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বিচার করে দেখল রানা অবস্থাটা। দশগুণ বর্ধিত প্রহরার মধ্যে থেকে ব্রিগেডিয়ারকে উদ্ধার করে নিয়ে আসা সত্যিই অসম্ভব ব্যাপার। সাবধান হয়ে গেছে পাকিস্তান আর্মি ইন্টেলিজেন্স। সূচ ঢুকবার রাস্তাও রাখবে না ওরা। হয়তো জেলখানার কোন সেলে রেখে দিয়েছে, কে জানে! আজই বিকেলে প্রেস কনফারেন্স। ওকে কি ব্যবহার করবে আর ওরা এত কাণ্ডের পরও? সারা পৃথিবীর নামজাদা করেসপণ্ডেন্টরা আসবে। বেফাঁস কথা যদি বলে বসেন, এই ভয়ে হয়তো ওকে ব্যবহার করতে আর সাহস পাবে না। কিন্তু বাঁচিয়ে রেখেছে তো?

খুব সম্ভব এত সহজে মারবে না ওরা ব্রিগেডিয়ারকে। নায়লার মুক্তি পাওয়া দেখে ওরা হয়তো ধারণা করবে বিরাট একটা দল কাজ করছে গোপনে লাহোরে বসে। পুরো দলটাকে ধরার জন্যে টোপ হিসেবে ব্যবহার করার চেষ্টা করবে ওরা ব্রিগেডিয়ারকে। তাছাড়া মস্ত বড় একটা কাৎলা মাছ, মেজর জেনারেল রাহাত খান, বেরিয়ে গেছে জাল কেটে। তাঁকে ধরতেই হবে ওদের যে করে হোক। সহজে মারবে না ওরা ব্রিগেডিয়ারকে, কিন্তু এমন এক জায়গায় রাখবে, সেখান থেকে বের



করা এক কথায় অসম্ভব।

অসহায় বন্দী ব্রিগেডিয়ারকে শত্রু-শিবিরে এভাবে ফেলে পালাবার কথা চিন্তাও করা যায় না। প্রথম কাজ এটাই। তারপর দেখতে হবে ওজরানওয়ালার ক্যাম্প থেকে মেয়েদেরকে উদ্ধার করবার কি প্ল্যান এঁটেছে দুই বুড়ো। এখন অপেক্ষা করা ছাড়া আর কোন উপায় নেই। খবরের জন্যে অপেক্ষা করতে হবে। বিশ্রাম নিয়ে শরীরটা ভাল করে নিতে হবে।

চিন্তাটা ওখানেই বন্ধ করে আবার ঘুমিয়ে পড়ল রানা।

বেলা দশটায় আবার ঘুম ভাঙল। প্রায় সাথে সাথেই ঘরে ঢুকল নায়লা নাস্তা নিয়ে। বলল, 'জলদি খেয়ে নাও, এক্ষুণি ডাক্তার এসে যাবে।'

অনেক কষ্টে বিছানা ছেড়ে উঠে লাঠির সাহায্যে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে গিয়ে বাথরুম থেকে ঘুরে এল রানা। পিঠটা গত রাত্রেই একবার পরীক্ষা করে দেখেছে নায়লা, আজ আবার দেখে চমকে উঠল। লাল, নীল, বেগুনি, কালচে—সব রঙই নাকি দেখা যাচ্ছে পিঠের উপর দুই ইঞ্চি চওড়া, চার ইঞ্চি লম্বা চৌকোণ ভুখণ্ডে।

নাস্তা শেষ হতেই মেজর জেনারেলের সাথে ঢুকল ঘরে ডাক্তার। প্রকাণ্ড চেহারা, কিন্তু দেহের উপর আর নিচের ভাগে কোন সামঞ্জস্য নেই। কেমন যেন বেখাপ্পা কিসিমের। জোব্বা-জাব্বা পরা পাঠান একজন। থ্যাবড়া নাকের মত একজোড়া বাটার জুতো—বোধহয় উনিশশো চল্লিশ সালে কেনা। ডাক্তারসুলভ অভয়দানে অভ্যস্ত, আত্মবিশ্বাসী অমায়িক কণ্ঠস্বর। হাসিখুশি একটা ভাব—যেটা দেখলেই রোগীর অন্তরাত্মা শুকিয়ে যায়। ভাবে, নিশ্চয়ই সাংঘাতিক কিছু হয়েছে, নইলে 'কিছু হয়নি, কিছু হয়নি' করছে কেন?

কানে স্টেথোস্কোপ লাগিয়ে পরীক্ষা করল রানাকে ডাক্তার বেশ কিছুক্ষণ, পিঠটা দেখল। খানিকক্ষণ চিন্তা ভাবনা করে বলল, 'ভয় নেই, আপনি বাঁচবেন। সামান্য ইন্টারন্যাল হেমোরেজ।'

'অ্যাঁ?' অন্তরাত্মা খাঁচাছাড়া হবার জোগাড় হলো রানার।

'কিছু না, তবে খানিক ব্যথা সহ্য করতে হবে। পারবেন না? ব্যথার চোটে আপনার মনে হবে ছাত ফুঁড়ে বেরিয়ে যাচ্ছেন, কিন্তু দেখবেন, কালই সেরে গেছেন অর্ধেকের বেশি। একটা রুমাল দাও দেখি, লাড্ডা আম্মু।'

ছোট্ট একটুকরো তোয়ালের মত একটা রুমাল নিয়ে এলো নায়লা। ব্যাগ খুলে একটা কৌটা বের করল ডাক্তার। একটা স্প্যাচুলা দিয়ে অনেকখানি মলম পুরু করে লাগাল রুমালের উপর। রানাকে ভয়ে ভয়ে ওদিকে চাইতে দেখে বলল, 'দেশীয় গাছ-গাছড়া থেকে তৈরি ওষুধ। পাহাড়ী অঞ্চলে পাওয়া যায়। হাজার হাজার বছর ধরে চলে আসছে এই মহৌষধ। আমি কিছু কেমিক্যালস মিশিয়ে ইমপ্রুভ করে নিয়েছি। সবখানেই ব্যবহার করি এটাকে আমি, প্রায় সব রোগেই। হরে দরে গঙ্গারাম—সবাই ভাল হয়ে যায়। এ ধরনের ওষুধে সাধারণ লোকের অটল
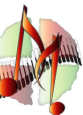
বিশ্বাস—যে ডাক্তার দেশী ওষুধ ব্যবহার করে তার ওপর মানুষের রীতিমত ভক্তি এসে যায়। তাছাড়া আজকালকার মেডিকেল সাইন্সের নিত্য নতুন আবিষ্কারের খবর রাখার ঝামেলা আর বিভিন্ন কোম্পানীর মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভের ডিটেইলিং-এর অত্যাচার থেকে বেঁচে যাই।'

কথা বলতে বলতেই কৌটার মুখটা বন্ধ করে দিয়ে রুমালটা চেপে বসিয়ে দিয়েছে ডাক্তার রানার পিঠের উপর। প্রায় সাথে সাথেই জ্বলুনি আরম্ভ হয়ে গেল। দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে পড়ে থাকল রানা উপুড় হয়ে। অসহ্য জ্বলুনি। এক মিনিটের মধ্যেই ঘাম দেখা দিল কপালে। মনে হলো সত্যিই ছাল খুঁড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে সে।

খুব খুশি হয়ে উঠল ডাক্তার রানার অবস্থা দেখে। বলল, 'কিচ্ছু চিন্তা নেই। কালকেই ইচ্ছে করলে হাডুডু খেলতে পারবেন। এই সাদা ট্যাবলেট দুটো গিলে ফেলুন তো? গুড, এই তো! ভেতর থেকে ব্যথাটা কমিয়ে দেবে। এবার এই নীল ট্যাবলেট। দশ মিনিটের মধ্যে ঘুম না এলে টান দিয়ে ফেলে দেবেন এই পুল্টিশ। ঘুম আসবে না মানে? আসতেই হবে। বাহ, এই তো লক্ষী ছেলে।' রানাকে ওষুধ খাইয়েই উঠে দাঁড়াল বেধড়ক ডাক্তার। বলছে, 'এবার তাহলে যাই, লায়লা আম্মু। কাল পর্যন্ত আছি এইখানে। এর মধ্যে কোন অসুবিধে দেখা দিলে ডেকো আমাকে।'

একটানা এগারো ঘন্টা পর ঘুম ভাঙল রানার লায়লার ঝাঁকুনিতে।

'কেবল যে ঘুমিয়েই চলেছ, ঘুমিয়েই চলেছ—বলি, খেতে টেতে হবে না কিছু?'

ঘড়ি দেখল রানা। দেখেই লাফিয়ে উঠে বসল। পরমুহূর্তেই অবাক হয়ে গেল পিঠে একটুও ব্যথা লাগল না বলে।

'কোন খবর আছে? তোমার আব্বার?'

'না।'

আবার শুয়ে পড়ল রানা বিছানায়। এবারও ব্যথা লাগল না একটুও!

'কেমন বোধ করছ এখন?' জিজ্ঞেস করল লায়লা।

'তাজ্জব কাণ্ড, লায়লা! এক ফোঁটা ব্যথা নেই!'

'এতে অবাক হওয়ার কি আছে? ডাক্তার চাচা তো বলেই ছিলেন সেরে যাবে।'

'কেবল ডাক্তারের কথাতেই যদি অসুখ সারত! কিন্তু আশ্চর্য, একজন গ্রাম্য ডাক্তার...'

'গ্রাম্য ডাক্তার! ওহ্-হো, তুমি বোধ হয় জানো না। উনি এম.আর.সি.পি.—বিলেত ফেরত ডাক্তার। মাথায় ছিট আছে। পাখতুনিস্তান আন্দোলন করে বেড়াচ্ছেন চিকিৎসার ফাঁকে ফাঁকে। আব্বার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। গ্রামে গ্রামে ঘুরে গোপন সংগঠন তৈরি করে বেড়ানোই ওঁর কাজ। কপাল ভাল, পেয়ে গিয়েছিলাম ওঁকে। নাও, এবার খেয়ে নাও দেখি।'

কিছুক্ষণ উসখুস করে বলল লায়লা, 'আব্বার খবর পেলে সত্যি যাবে তুমি



বিপদের মধ্যে?'

'যাব। কেন, হঠাৎ এই প্রশ্ন?'

'ভয় করবে না?'

'করবে। ভয়ানক ভয় করবে। কিন্তু ভয়কে জয় করব।'

'অচেনা, অজানা এক বুড়ো ব্রিগেডিয়ারের জন্যে নিজের জীবন বিপন্ন করবে? যদি ওঁকে উদ্ধার করতে গিয়ে ধরা পড়ে যাও, নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করা হবে তোমাকেও। মরতে খারাপ লাগবে না তখন?'

'লাগবে। খুব খারাপ লাগবে। মরতে আমার সব সময় খারাপ লাগে—সেই ছোটকাল থেকে। এই বদভ্যাস...'

'না, ঠাট্টা নয়, রানা। আমি চাই না, তুমি আমার জন্যে প্রাণ বিসর্জন দিয়ে আমাকে চিরঋণী করে রাখো।'

'চিরঋণী তুমি থাকতে পারবে না, লায়লা! একদিন তোমাকেও পটল তুলতে হবে।'

'একদিন তো সবাইকেই মরতে হবে।'

'সেইজন্যেই যেটা যাবেই সেটা ধরে রাখবার অতিরিক্ত আগ্রহ আমার নেই। মহাকালের পটভূমিতে ভেবে দেখো, তিরিশ-চল্লিশটা বছর বেশি বা কম বাঁচলে কি এসে যায়? জীবনটা মূল্যবান ঠিকই, কিন্তু সর্বক্ষণ ভয়ে ভয়ে আগলে রাখার মত মহামূল্যবান কিছুই নয়। তাই সহজ ভাবে গ্রহণ করেছি আমি জীবনটাকে। যা ভাল লাগবে, যেটা উচিত বলে মনে হবে, তাই করব। যদি মরি, তাও সই। ভয় লাগবে—ওটা বায়োলজিক্যাল সেল্ফ্ প্রোটেকটিং রিঅ্যাকশন। কিন্তু মরতে যতটা না খারাপ লাগবে তার চাইতে বেশি খারাপ লাগবে যা করতে চেয়েছি সেটা করতে পারিনি বলে।'

'তার মানে সুখী হয়ে মরতে পারবে না তুমি কোনদিন।'

'কে পারে?' হাসল রানা। 'শুধু শুধু ভেবে নিজেকে ভারাক্রান্ত কোরো না, লায়লা। তোমার প্রশ্নের সরাসরি উত্তরই দিচ্ছি। তুমি জানতে চাও, তোমার জন্যে মৃত্যুর ঝুঁকি নিতে যাচ্ছি কিনা। উত্তর হচ্ছে, হ্যাঁ। আংশিক সত্য হলেও কথাটা সত্য। তোমার মুখে হাসি দেখলে আমি সুখী হব। কিন্তু তোমাকে কোনভাবে ঋণগ্রস্ত করতে চাই না, তাই একটা কথা বলে রাখছি, তুমি লায়লা না হয়ে চমনআরা কিংবা লুৎফুন্নেসা হলেও তোমার বাবাকে উদ্ধার করার প্রাণপণ চেষ্টা করতাম।'

'এই নিয়ে দ্বিতীয়বার এই উদাহরণ দিলে। তুমি অপমান করছ আমাকে। আমাকে আর দশটা মেয়ের সাথে সমান সারিতে দাঁড় করিয়ে...'

'ভুল বুঝেছ লায়লা। আমি যেটা বোঝাতে চাই, সেটা হচ্ছে, তোমার উপর আমার কোন রকমের কোন দাবি নেই। কৃতজ্ঞতা স্বীকারের দাবিও নয়। তুমি মুক্ত। আমার প্রতি কোন কর্তব্য নেই তোমার। কৃতজ্ঞতা পছন্দ করি না আমি।'

'ভালবাসা? প্রেম সম্বন্ধে তোমার কি ধারণা?'

চোখে চোখে চেয়ে হাসল রানা। হাসিটা মলিন। খাবারে মনোনিবেশ করল। এক মিনিট পর বলল: 'দুই রকম প্রেম আছে। একটা বন্ধন, একটা মুক্তি। আমি শেষেরটার প্রেমিক।'

রানার খাওয়া হয়ে গেলে এঁটো থালা-বাটি নিয়ে চলে গেল লায়লা। সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে বাড়ির। কিছুক্ষণ পরেই ফিরে এল সে গ্লাসটা ফেলে গেছে এই ছুতোয়। কথায় কথায় রাত হয়ে গেল অনেক। কিন্তু যে কথাটা বলতে এসেছিল, বলা হলো না। অদ্ভুত আকর্ষণ এই মহৎ বাঙালী যুবকটির। মনটা বিশাল এক সমুদ্রের মত—থৈ পায় না লায়লা। পাঞ্জাবী দৃষ্টিভঙ্গিতে বোঝা যায় না একে। ও কি প্রেমে পড়েছে এই নিষ্ঠুর লোকটার?

পরদিন সকালে ফিরে এল আবদু খবর নিয়ে।

ব্রিগেডিয়ারকে সরিয়ে ফেলা হয়েছে স্পেশাল অফিসারস কোয়ার্টার থেকে। কিন্তু কোথায় রাখা হয়েছে জানা যায়নি এখনও। গুজব ছড়ানো শুরু হয়ে গেছে যে ব্রিগেডিয়ার জামান অসুস্থ হয়ে পড়েছেন—হয়তো প্রেস কনফারেন্সে যোগ দিতে পারবেন না। আর্মি ইন্টেলিজেন্সের হেডকোয়ার্টারে নেই তিনি। আলম চেষ্টা করছে এখনও ওঁর খবর বের করবার জন্যে। আর সর্বশেষ সংবাদ—আবার রক্ত পড়তে আরম্ভ হয়েছে আলমের নাক মুখ থেকে। নিজ চোখে দেখে এসেছে আবদু।

সারাটা দিন ছটফট করে কাটাল রানা। খাঁচায় বন্দী বাঘের মত পায়চারি করে বেড়াল সারা বাড়ি অস্থির পায়ে। গুণার সাথে খেলার চেষ্টা করল, কিন্তু জমল না। মেজর জেনারেল ইজি চেয়ারে শুয়ে চুরুট ফুঁকছেন সারাদিন, কারও সাথে কথা বলছেন না। কায়েস-আলী রান্নাঘরে সাহায্য করছে লায়লাকে। কিছুতেই সময় কাটতে চাইছে না।

বিকেলের দিকে সাইলেন্সার পাইপ খুলে রাখা একখানা থ্রী-ফিফটি সি. সি. হারলি ডেভিডসন মোটর সাইকেলে দুনিয়া কাঁপিয়ে চলে গেল আবদু লাহোর। উগ্র হিপ্পি বেশভূষার সাথে চমৎকার মানিয়েছে এই বিকট আওয়াজের মোটর সাইকেল। আলমের সাথে দেখা করে দশটা এগারোটার মধ্যেই ফিরে আসবে সে।

'চলো রানা, নদীর ধার থেকে বেড়িয়ে আসি।'

ডাকল লায়লা। ঘন্টা দুয়েক হলো আকাশটা একটু পরিষ্কার হয়েছে। বন্ধ হয়েছে বৃষ্টি। মাঝে মাঝে হাসি হাসি মুখ দেখা যাচ্ছে সূর্যের। বিরক্ত হয়ে উঠেছিল রানা সারাদিন ঘরে থেকে। বেরিয়ে পড়ল দু'জন।

'কারও চোখে পড়বার ভয় নেই তো?'

'নাহ। আশে পাশে দু'মাইলের মধ্যে একটি প্রাণীও খুঁজে পাবে না তুমি।'



সামনের কয়েকটা টিলা আর জঙ্গল পার হলেই নদী। রাভী। হাঁটতে হাঁটতে অনেকদূর চলে গেল ওরা। অনর্গল গল্প করছে লায়লা, শুনে যাচ্ছে রানা। বর্ষাকাল। কানায় কানায় ভরা রাভী এখন উচ্ছল যৌবনবতী খরস্রোতা। ভেজা ভেজা হাওয়া।

নদীর ধারে দাঁড়িয়ে গোধূলির আকাশ দেখল দু'জন। দেখল নদীর বুকে অসংখ্য ঢেউ, জলের বিস্তার। একটা গাছের গুঁড়িতে বসল ওরা।

পশ্চিম আকাশে গোধূলির লাল। কথা বলছে লায়লা। লাল রঙ এসে পড়েছে লায়লার গালে। অদ্ভুত সুন্দর লাগছে রানার। মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখছে রানা ওর চিবুকের তিল, জুলফির উড়ু উড়ু চুল। হেসে ফেলল লায়লা।

'কি, তুমি কথা শুনছ, না আমাকে দেখছ?'

'দুটোই।'

চোখ নামাল লায়লা। আলগোছে তুলে নিল রানার একটা হাত। বলল, 'খবর পেলেই তুমি ছুটবে আমারই আব্বাকে উদ্ধার করে আনতে। তোমাকে এই বিপদের মধ্যে ঠেলে দিতে পারলে আমার খুশি হওয়ার কথা। কিন্তু, জানো, খারাপ লাগছে আমার।'

'কেন?'

'ভয় হচ্ছে, তোমাকে হারাব আমি। তোমার ক্ষমতার প্রতি অনাস্থা প্রকাশ করছি না। আমি জানি যদি কারও পক্ষে আব্বাকে রক্ষা করা সম্ভব হয়, সে হচ্ছ তুমি। এবং এ-ও জানি, অন্তর থেকে উপলব্ধি করছি, জয়ী তুমি হবেই। কিন্তু সেইসাথে কেমন যেন ভয় হচ্ছে, কাজ শেষ হলেই হাজার লোকের ভিড়ে মিশে হারিয়ে যাবে তুমি। আর খুঁজে পাব না শত মাথা কুটলেও। ভাবছি, কোনদিন তোমার সাথে পরিচয় না হলেই বোধহয় ভাল হত।' ভারি হয়ে এল লায়লার কণ্ঠস্বর।

একদৃষ্টে চেয়ে রইল রানা লায়লার চোখে।

'তোমার-আমার কারোরই হাত ছিল না এতে লায়লা। এটা অদৃষ্টের লিখন। এটাকে স্বীকার করে নিতে হবে।'

'অর্থাৎ হারিয়ে তুমি যাবেই? বাঁধনে ধরা দাও না তুমি কোনদিন?'

'আমার ইচ্ছের উপর নির্ভর করে না লায়লা। আমি আসলে একটা পথ।'

'তার মানে?'

'একটা ধাঁধার উত্তর দাও দেখি—হারালে মানুষ খোঁজে, কিন্তু পেলে নেয় না—কি সেই জিনিস?'

'পথ।'

'হ্যাঁ, পথ। আমি সেই পথ। সেইজন্যেই একাকী।'

বড় করুণ শোনাল রানার কথাগুলো। কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইল দু'জন। ছোট ছোট ঢেউগুলো কালচে হয়ে আসছে সাঁঝের 'রেশ পেয়ে। আবছা হয়ে আসছে
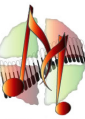
মেঘের গায়ের লাল রঙ।

হঠাৎ কথা নেই বার্তা নেই ঝুপঝুপিয়ে বৃষ্টি নেমে এল। উঠে দাঁড়াতে যাচ্ছিল রানা, হাত ধরে টেনে বসিয়ে দিল লায়লা। অবাক হয়ে চাইল রানা ওর মুখের দিকে। মৃদু হাসল লায়লা।

'পথটা যখন পেয়েছি, হারিয়ে যাবার আগে এসো ভাল করে চিনে নিই।'

'হারিয়ে গেলে কাঁদবে না তো?'

'না। খুঁজব।'

অনেক কাছে সরে এল লায়লা। দু'হাতে জড়িয়ে ধরল রানার গলা। চোখে চোখে চেয়ে রইল ওরা, আদিম মানব-মানবী। ধীরে ধীরে নেমে এল তৃষ্ণার্ত একজোড়া ঠোঁট লায়লার অপেক্ষমাণ অধরে।

ঝম ঝম পড়েই চলেছে বৃষ্টি।

## ষোলো

রাত এগারোটা।

চেন খুলে ছেড়ে দেয়া হয়েছে গুণ্ডাকে। অন্ধকারে মিশে ঘুরে বেড়াচ্ছে সে বাড়িটার চারপাশে।

মেজর জেনারেল বুঝিয়ে দিচ্ছেন রানাকে গুজরানওয়ালা ক্যাম্প আক্রমণের পরিকল্পনা। জীবনে বহুবার অবাক হয়েছে রানা বৃদ্ধের ক্ষুরধার বুদ্ধির পরিচয় পেয়ে, আজও শ্রদ্ধায় মাথা হেঁট করল সে, মনে মনে বুড়োর পা ছুঁয়ে কপালে ঠেকাল হাতটা। শুধু শুধুই মন জয় করেনি বুড়ো রানার, শুধু শুধুই বশ্যতা স্বীকার করেনি রানা এঁর কাছে; মাথার মধ্যে গোটা দশেক কম্পিউটার কাজ করে বুড়োর। যেমন তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, তেমনি দুর্জয় সাহস; যেমন কঠোর নীতিপরায়ণ, তেমনি কোমল। অদ্ভুত এক সংমিশ্রণ। একটাই ত্রুটি বুড়োর—কঠোর চাউনি আর কড়া কথার ফাঁকে ফাঁকে নিজের অজান্তেই প্রকাশ হয়ে যায় রানার প্রতি তাঁর অসীম স্নেহ। রানা টের পায়, হাসে মনে মনে, বুড়োর দুর্বলতম জায়গা চিনে ফেলেছে সে। শুধু সে কেন, দুদিনেই টের পেয়ে গেছে এ বাড়ির প্রত্যেকে।

একটা কাগজের ওপর পেন্সিল দিয়ে নক্সা আঁকছেন মেজর জেনারেল, এমনি সময়ে দড়াম করে দু'পাটি দরজা খুলে ঘরের সবাইকে চমকে দিয়ে বীরদর্পে ঘরে প্রবেশ করল শ্রীমান আবদুল্লাহ—মানে, আবলু। সুসংবাদ-দুঃসংবাদ দুটোই আছে। সুসংবাদ হচ্ছে ব্রিগেডিয়ার জামানকে কোথায় রাখা হয়েছে অতি সহজেই জানতে পেরেছে আলম। আর্মি ইন্টেলিজেন্সের চীফ ব্রিগেডিয়ার গুলজার খান নিজের মুখে



বলেছেন আলমকে কথায় কথায়। আর দুঃসংবাদ হচ্ছে, ব্রিগেডিয়ার জামানকে রাখা হয়েছে পাকিস্তানের সবচেয়ে দুর্ভেদ্য কারাগারে। লাহোর থেকে পঁচাত্তর মাইল পশ্চিমে শাহকোট জেলখানায়। ওখান থেকে আজ পর্যন্ত একটি বন্দীও পালিয়ে যেতে পারেনি, চেষ্টা করে মারা পড়েছে যদিও অনেকেই।

আলমকে কর্নেল মুজাফফর খান একটা বিশেষ কাজে শহর থেকে বাইরে পাঠাচ্ছে বলে সে নিজে কোন রকম সাহায্য করতে পারবে না ওদের। কিন্তু সব ব্যবস্থাই করে দিয়েছে সে। একটা মস্ত ঠগবাজির ব্যবস্থা করেছে সে কৌশলে। রানা এবং মেজর জেনারেলের জন্যে পাকিস্তান আর্মি ইন্টেলিজেন্সের আইডেন্টিটি কার্ড জোগাড় করে পাঠিয়েছে—সেই সাথে একজোড়া ইউনিফরম। কিন্তু তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে গুলজার খানের চিঠি। পাকিস্তান আর্মি ইন্টেলিজেন্সের চীফ ব্রিগেডিয়ার গুলজার খান এবং হোম মিনিস্টারের সই আছে, সীল আছে। জাল বলে ধরবার কোন উপায় নেই। শাহকোটের সিকিউরিটি প্রিজনের জেলারের কাছে লেখা—চিঠি পাওয়া মাত্রই যেন ব্রিগেডিয়ার জামানকে পত্র বাহকদের হাতে তুলে দেয়া হয়। এ চিঠিকে অস্বীকার করবার সাধ্য জেলারের নেই। চিঠির কাগজটা পর্যন্ত সরকারী জলছাপ দেয়া।

কাম্রেন আর আবলুকেও সাথে নেবার পরামর্শ দিয়েছে আলম। জেলখানার মাইল পাঁচেক দূরে টেলিফোন পোলের কাছে রয়ে যাবে ওরা। তাহলে দলের সবাই যোগাযোগ রক্ষা করতে পারবে পরস্পরের সঙ্গে, প্রয়োজন হলে সাহায্য করতে পারবে।

এবং সর্বোপরি শাহকোটে যাবার জন্যে একখানা গাড়ি সংগ্রহ করে দিয়েছে আলম। কোথা থেকে কিভাবে সংগ্রহ করেছে বলেনি। গাড়ির কথা শুনেই মনে পড়ল রানার যে আবলুর সাইলেন্সার পাইপ খুলে রাখা মোটর সাইকেলের দুনিয়া কাঁপানো আওয়াজ পায়নি বলে হঠাৎ দরজা খোলায় চমকে উঠেছিল সবাই। গাড়ি নিয়ে এসেছে আবলু।

আরও একটি দুঃসংবাদ আছে। আলমের aortic aneurism আরও বেড়েছে। নাক মুখ দিয়ে থেকে থেকে ভয়ঙ্কর রক্তস্রাব হচ্ছে। আবলুর ধারণা, এই ধাক্কাতেই শেষ হয়ে যাবে আলম ভাই। ডাক্তারও তাই বলেছিল। আর একটা বা দুটো স্ট্রোক সহ্য করতে পারবে সে—তার বেশি নয়।

'আশ্চর্য!' বলল রানা। 'লোকটা মানুষ, না কি! একদিনে এতকিছু ব্যবস্থা করল কি করে? তাজ্জব কারবার।'

'এই চিঠি নিয়ে তোমরা তাহলে ঢুকছ শাহকোট জেলখানায়?' জিজ্ঞেস করল লায়লা গম্ভীর মুখে।

'হ্যাঁ। ঢুকছি,' বললেন মেজর জেনারেল। 'এই শেষ চেষ্টা আমাদের। যে করে হোক ঢুকতেই হবে ওখানে।'
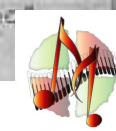
'কিন্তু, চাচা, আপনাকে তো বাদ রাখলে পারত অলম ভাই?'

'অনেক ভাবনা চিন্তা করেই সব ব্যবস্থা করেছে অলম। রানা একা গেলে নানান সন্দেহ আসতে পারে জেলারের মনে। আমারও থাকা দরকার সাথে। দু'জনের হাতে বন্দীকে তুলে দিতে দ্বিধা করবে না জেলার।'

'আমাকে নেবেন সাথে?'

'না।'

শাহকোটের কথায় সত্যিই ভয় পেয়েছে নায়লা। এই ভয়ঙ্কর কাজে ও গেলে পদে পদে বাধারই সৃষ্টি হবে, বুঝতে পারল সে। কিন্তু সবক'জন পুরুষ মানুষকে বিপদের মুখে পাঠিয়ে দিয়ে অনিশ্চয়তার মধ্যে পুরো একটা দিন কাটাবে কি করে সে? ধীর পায়ে চলে গেল সে ঘর ছেড়ে।

পরদিন বেলা ঠিক সাড়ে এগারোটায় পৌঁছল ওরা শাহকোট জেলখানার সামনে। জেলখানার উঁচু দেয়ালের উপর কয়েকটা তার দেখে বোঝা গেল কেন আজ পর্যন্ত কেউ পালাতে পারেনি এখান থেকে। কম পক্ষে দশ হাজার ভোল্টের ইলেট্রিক কারেন্ট আছে ওই তারে।

জোরে ব্রেক কষে থামল গাড়ি জেল গেটের কাছে। ছুটে এল গাড়ির কাছে একজন প্রহরী আইডেন্টিটি কার্ড দেখবার জন্যে। পাকিস্তান আর্মি ইন্টেলিজেন্সের পোশাকে ওদের নামতে দেখে একটু থমকে দাঁড়াল সে। কঠোর চাহনি দিয়ে ঠাণ্ডা করে দিল রানা প্রহরীর সব উৎসাহ। কড়া মেজাজ মেশাল সে কণ্ঠস্বরে, 'জেলারকে ডেকে আনো।'

অফিস কামরায় ওদের বসিয়ে খবর দেয়া হলো জেলারকে। হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এল জেলার। পঁয়ত্রিশ মত বয়স হবে—লম্বা, বিষণ্ণ দার্শনিকের চেহারা। একবিন্দু সন্দেহ করল না ওদের। কফির অর্ডার দিতে চাইল—ওরা অবজ্ঞার সাথে নিষেধ করায় বিনীত হাসল। মেজর জেনারেলের হাত থেকে নিল সে সীলমোহর করা চিঠিটা। মনোযোগ দিয়ে পড়ল।

'আমি জানতাম আপনারা আসবেন।' ছ্যাৎ করে উঠল রানার কলজেটা। 'ব্রিগেডিয়ার গুলজার খান আমাকে আগেই বলেছিলেন, ব্রিগেডিয়ার জামানের মেয়েকে পাওয়া গেলে ওকে নেবার জন্যে লোক পাঠাবেন। মেয়েটাকে পাওয়া গেছে তাহলে?'

ভ্রু কুঁচকে গিয়েছিল রানার কথা শুরু করবার ধরন দেখে। সামলে নিয়ে বলল, 'সে-সব কথা আমরা জানি না। বন্দীকে নিয়ে যাবার হুকুম হয়েছে আমাদের ওপর। বাস। আর কিছু বলার উপায় নেই।'

'আপনাদের আইডেন্টিটি কার্ড, কাগজপত্র সব সঙ্গেই আছে তো?' প্রশ্ন করল জেলার যথেষ্ট বিনয়ের সাথে।



'নিশ্চয়ই।' বের করে এগিয়ে দিল ওরা ওগুলো।

'কিছু মনে করবেন না, দেখার নিয়ম, তাই দেখছি।'

ওদের পরিচয় পত্রগুলো পরীক্ষা করল জেলার মন দিয়ে। তারপর টেলিফোনটার দিকে আঙুল তুলে দেখিয়ে বলল, 'আপনারা নিশ্চয়ই জানেন, আর্মি ইন্টেলিজেন্সের সাথে এই জেলখানার ডিরেক্ট টেলিফোন যোগাযোগ আছে। ব্রিগেডিয়ার জামানের মত একজন গুরুত্বপূর্ণ লোকের ব্যাপারে আরও নিশ্চিত হবার প্রয়োজন আছে। আপনারা নিশ্চয়ই কিছু মনে করবেন না, আমি যদি এই রিলিজ অর্ডার আর আপনাদের পরিচয়ের সত্যতা সম্পর্কে ব্রিগেডিয়ার গুলজার খানের সাথে একটু আলাপ করে নিই?'

অনেক কষ্টে মুখের চেহারাটা ঠিক রাখল রানা। এই সাধারণ কথাটা একবারও ভাবেনি কেন ওরা? টেলিফোন করলেই সব শেষ। অলক্ষে হাতটা চলে গেল পিস্তলের কাছে। মুখে বলল, 'নিশ্চয়ই। এত বড় একজন লোক! আপনার তো ফোন করে জেনে নেয়াই উচিত।' দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় রানার কণ্ঠে।

'না, থাক। তাহলে আর দরকার নেই। সন্দেহের কিছু থাকলে ফোন করতাম। শুধু শুধু ফোন করলে বিরক্ত হবেন হয়তো ব্রিগেডিয়ার। আমরা পেটি অফিসার, আমাদের তো সবদিকেই জ্বালা। বুঝলেন না?' হাসল জেলার। টেবিলের উপর রেখে ঠেলে দিল সে কার্ডগুলো ওদের দিকে। যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল রানার। বুকের ভিতর ধুকধুকানিটা দ্রুত স্বাভাবিক হয়ে আসছে আবার।

একটা কাগজ ছিঁড়ে নিল জেলার প্যাড থেকে। কিছু লিখল তার উপর। অফিশিয়াল সীল দিল সই করবার পর। একজন গার্ডকে ডেকে তার হাতে দিল চিঠিটা। কোন কথা না বলে হাত নেড়ে বিদায় দিল গার্ডকে। মেজর জেনারেলের দিকে চেয়ে বলল, 'পাঁচটা মিনিট অপেক্ষা করতে হবে দয়া করে। আনতে পাঠিয়েছি।'

পাঁচ মিনিট লাগল না। ঠিক এক মিনিট পর অফিস কামরার দুই দিকের দুটো দরজা খুলে গেল। আয়েস করে বসতে যাচ্ছিল রানা নড়েচড়ে। সোজা হয়ে ঘাড় ফিরাল। ব্রিগেডিয়ার জামান নয়, চার দু-গুণে আটজন সশস্ত্র প্রহরী ঢুকল ঘরের ভিতর দু'দিকের দরজা দিয়ে, এক সাথে। আটটা স্টেনগান লোলুপ দৃষ্টিতে চেয়ে আছে ওদের দু'জনের দিকে।

কিছু বুঝে উঠবার আগেই হাতকড়া পড়ল ওদের দু'জনের হাতে। বাধা দেয়ার প্রশ্নই ওঠে না।

বিষণ্ণ মুখে মাথা নাড়ল জেলার এদিক ওদিক।

'আপনারা দয়া করে নিজগুণে ক্ষমা করবেন আমাকে। এই অভিনয়টুকু না করলে আজই গোরস্থানের পথে রওনা হতে হত আমাকে। তাই একটু অভিনয় করতে হলো, যদিও অভিনয়টা আমার লাইন নয়। চিঠিটা যে লিখলাম, ওটা

ব্রিগেডিয়ার জামানকে রিলিজ করার জন্যে নয়, আপনাদের অ্যারেস্ট করার জন্যে।' যেন একঘেয়েমিতে ভুগছে এমনি ভাবে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল জেলার। 'মিস্টার শরাফ আলী, আপনি বড় নাছোড়বান্দা লোক!

## সতেরো

কিছু দেখতে পাচ্ছে না রানা চোখে। কয়েক সেকেণ্ড পর ধীরে ধীরে আবার ভেসে উঠল ওর চোখের সামনে জেলারের বিষণ্ণ মুখটা। আকস্মিক বিস্ময়ের ধাক্কাটা সহ্য হয়ে আসতেই স্পষ্ট বুঝতে পারল রানা, এতক্ষণ খেলানো হচ্ছিল ওদের। ওদের পরিচয় সম্পর্কে বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না জেলারের মনে গোড়া থেকেই। বোকার মত ধরা পড়েছে ওরা এদের সযত্নে পাতা ফাঁদে। নিষ্কৃতির একটি মাত্র উপায় আছে এখন—মৃত্যু!

কেবল হাতে হাতকড়া পরিয়েই নিরস্ত হয়নি ওরা, পায়েও বেড়ি পরিয়েছে। দক্ষ হাতে সার্চ করে রানার লুগার এবং মেজর জেনারেলের কোল্ট অটোমেটিক বের করে রাখা হলো টেবিলের উপর। বেরিয়ে গেল গার্ডগুলো নিপুণ হাতে কাজ সমাধা করেই।

'আপনি একজন ইন্টারন্যাশনাল ফিগার হয়ে যাবেন, মিস্টার শরাফ আলী। লাহোর এখন ছেয়ে গেছে বিদেশী সাংবাদিকে। আপনাকে ভারতীয় বলে চালাব আমরা। সুচেতগড় সামরিক কনফারেন্স কেন সফল হচ্ছে না, সিমলা কনফারেন্স কেন বিফল হতে চলেছে, গোলমালটা আমরা করছি না করছে ভারত, প্রমাণ হয়ে যাবে সবার সামনে। আগামী কালই লাহোরের পাবলিক কোর্টে বিচার হবে আপনার। কল্পনা করুন, লাহোরে ভারতীয় স্পাই! কত বড় আলোড়নটা হবে ভাবুন একবার?' একটা সিগারেট ধরিয়ে কিছুক্ষণ টানল সে আপন মনে। তারপর বলল, 'আপনাদের নিশ্চয়ই জানতে ইচ্ছে করছে, কথা নেই বার্তা নেই, ব্রিগেডিয়ারকে উদ্ধার করতে এসে হঠাৎ এই দুর্দশায় পড়লেন কি করে? কারণটা জানাতে আমার কোন আপত্তি নেই। আমি অত্যন্ত দুঃখের সাথে জানাচ্ছি, আপনাদের আশ্চর্য প্রতিভাবান এবং ভয়ঙ্কর দুঃসাহসী বন্ধু, যিনি পাকিস্তান আর্মি ইন্টেলিজেন্সের মেজর দেলওয়ার খান হিসেবে বিপুল সুনাম ও মর্যাদা অর্জন করেছেন, তিনিই শেষ পর্যন্ত ডুবিয়েছেন আপনাদের আঁথে জলে।'

অনেকক্ষণ কেউ কোন কথা বলল না। মেজর জেনারেলের মুখের দিকে চাইল রানা। কোন ভাব পরিবর্তন নেই বৃদ্ধের মুখে।

'সে তো হতেই পারে,' বললেন তিনি গম্ভীর মুখে। 'ভুল-ত্রুটি সবারই হয়।'



'তাই হয়েছে। বেশ কিছুদিন যাবৎ কর্নেল মুজাফফর খানের মনে সন্দেহ উপস্থিত হয়েছিল। সন্দেহ ঠিক নয়, সন্দেহের ছায়া। কিন্তু গত পরশু রাতে সন্দেহটা ঘনীভূত হয়ে স্থির বিশ্বাসে পরিণত হতেই ব্রিগেডিয়ার গুলজার খানের সাথে মিলে একটা ফাঁদ পেতেছিলেন উনি দেলওয়ারের জন্যে। এই জেলখানার নাম কথায় কথায় বলা হয়েছে দেলওয়ারের সামনে। তার ওপর ব্রিগেডিয়ার গুলজার খানের অফিস কামরায় ঢুকে তাঁর কাগজপত্র আর নীলমোহর ব্যবহারেরও সুযোগ দেয়া হয়েছে তাকে। অসঙ্কোচে সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করেছে আপনাদের বন্ধু। এবং নিশ্চিন্তে পা দিয়েছে কর্নেল মুজাফফরের ফাঁদে। ঠিকই বলেছেন, যত চালু বা বুদ্ধিমানই হোক, মানুষ মাত্রেই ভুল হয়।'

'এতক্ষণে নিশ্চয়ই গুলি করে মারা হয়েছে ওকে?' প্রশ্ন করলেন মেজর জেনারেল।

'না, বেঁচে আছে। এবং সুখেই আছে। জানেও না, দাবার ছক পাল্টে গেছে সম্পূর্ণ। ওকে কি একটা কাজে শহরের বাইরে পাঠিয়ে দিয়েছেন কর্নেল মুজাফফর। বিকেল বেলা ফেরত এলে পরে এই সমস্ত প্রমাণ সহ নিজ হাতে তাকে অ্যারেস্ট করবার বাসনা পোষণ করেন তিনি। বিকেলে ধরা পড়বে দেলওয়ার খান, রাতেই কোর্ট মার্শাল হয়ে যাবে ওর হেডকোয়ার্টারে। কিন্তু আমার যতদূর ধারণা ওর মৃত্যুটা চরম নির্যাতনের মৃত্যু হবে।'

'তা তো হবেই,' বললেন মেজর জেনারেল। 'প্রত্যেকটি আর্মি ইন্টেলিজেন্স অফিসারের চোখের সামনে তিলে তিলে মারা হবে ওকে—যাতে আর কখনও কারও ওর পদাঙ্ক অনুসরণ করবার সাহস না হয়। তাই না?'

'হ্যাঁ। আপনাকে চিনলাম না। আপনার নাম?'

'নামটা কষ্ট করে বের করে নিতে হবে।'

'বেশ।' কয়েক সেকেণ্ড স্থির বিষণ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল জেলার বৃদ্ধের মুখের দিকে। তারপর হাসল। 'বের করে নেয়া যাবে। কিন্তু কারও পরিচয় জানতে চাওয়ার আগে নিজের পরিচয় দেয়াই ভদ্রতা। আমার নাম শাহেদ আলী ভুট্টো।' রানাকে একটু অবাক দৃষ্টিতে চাইতে দেখে বলল, 'হ্যাঁ। ওই একই ফ্যামিলির ছেলে আমি। প্রেসিডেন্টের ভাতিজা। শাহ কোটের বর্তমান অস্থায়ী জেলার। আসলে আমি কেমিস্ট্রির একজন রিসার্চ স্কলার—সম্প্রতি অক্সফোর্ড থেকে পি. এইচ. ডি. করেছি। রিসার্চের সূত্রেই কিছুদিনের জন্যে কাজ করছি আমি এখানে। আমার ওপর আদেশ দেয়া হয়েছে শরাফ আলী সাহেবের স্বীকৃতি আদায় করতে হবে। তাছাড়া আপনাদের দু'জনেরই সত্যিকার পরিচয় এবং দলের সামগ্রিক কার্যকলাপ, প্লান-প্রোগ্রাম, ঠিকানা, ইত্যাদি বের করার দায়িত্বও আমার। কিন্তু বিশ্বাস করুন, মধ্যযুগীয় শারীরিক নির্যাতন করে কথা বের করবার আমি ঘোর বিরোধী। তাছাড়া দৈহিক নির্যাতন করে যে আপনাদের দু'জনের কারও কাছ থেকেই কোন কথা

আদায় করা যাবে না, তা আমি আপনাদের মুখ দেখেই বুঝতে পারছি। বিংশ শতাব্দীতে ইন্টারোগেশনের যে সব চমৎকার কৌশল বেরিয়েছে, আমরা অতি যত্নের সাথে সে সব ব্যবহার করতে আরম্ভ করেছি। একটি চিহ্নও থাকবে না আপনাদের শরীরে, অথচ সব কথা জানতে পারব আমরা। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই। একেবারে অমোঘ অস্ত্র।'

'ব্রেন ওয়াশিং?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'হ্যাঁ। এখুনি কফি এসে যাবে আপনাদের জন্যে। ওটা দিয়েই শুরু হবে।'

কথাটা শেষ হওয়ার আগেই একটা ট্রে-র উপর সাজানো দু'কাপ কফি নিয়ে ঘরে প্রবেশ করল একজন কয়েদী পোশাক পরা বেয়ারা।

'কফিটুকু খেয়ে নিতে হবে,' বলল শাহেদ আলী ভুট্টো। 'না খেলে নাকে টিউব ভরে খাওয়ানো হবে। কাজেই আশা করি ছেলেমানুষী করবেন না।'

ছেলেমানুষী করতে চেয়েছিল রানা, কিন্তু দেখল একটা কাপ তুলে নিয়ে চকচক করে খেয়ে নিলেন মেজর জেনারেল। রানাও বিনা বাক্য ব্যয়ে খেয়ে নিল কফিটুকু।

'বাহ্, চমৎকার! বুদ্ধিমান মানুষ পছন্দ করি আমি। অ্যাক্টেড্রিন বলে একটা কেমিক্যাল মেশানো আছে এই কফিতে। প্রথম কয়েক মিনিট বেশ উদ্দীপ্ত হয়ে উঠবে আপনাদের নার্ভগুলো, তার পরেই আসবে অসম্ভব মাথার যন্ত্রণা, ঘুম-ঘুম ভাব, আলস্য—কিন্তু নার্ভগুলোর টেনশন বাড়তেই থাকবে। ধীরে ধীরে মানসিক ধৈর্য হারাতে থাকবেন আপনারা। দু'ঘণ্টা পর আবার দেয়া হবে এই ডোজটা। আর ফাঁকে-ফাঁকে চলতে থাকবে ইঞ্জেকশন।' দরজার দিকে চেয়ে বলল, 'এবার একটা ইঞ্জেকশন দেয়া হবে আপনাদের।' সিরিঞ্জ হাতে ঘরে ঢুকল অ্যাপ্রন পরা একজন বেঁটেখাটো লোক। 'মেসক্যালিন ইঞ্জেকশন,' প্রফেসারী ভঙ্গিতে বলেই চলল জেলার। 'স্কিযোফ্রেনিয়ার (Schizophrenea) মত অবস্থা হবে অ্যাকটেড্রিনের সাথে মেসক্যালিন পড়লে। এর আধ ঘণ্টা পর আমার নিজস্ব আবিষ্কৃত একটা ওষুধ ইনজেক্ট করা হবে আপনাদের শরীরে। অল্পদিন হলো আবিষ্কার করেছি ওষুধটা, তাই নাম-করণ হয়নি এখনও। এই তিনটে ওষুধ বার দুই রিপিট করলে ইচ্ছাশক্তি বলে কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না আপনাদের মধ্যে—অবসাদে সম্পূর্ণ ভেঙে পড়বে মনের জোর। তখন কথার খৈ ফুটবে আপনাদের মুখে। সত্যি কথা তো বেরোবেই, আমরা আমাদের ইচ্ছেমত কিছু কথাও ঢুকিয়ে দেব আপনাদের মাথায়—সেটাই তখন আপনাদের কাছে সত্য হবে। যাক, মোটামুটি ব্যাপারটা শুনলেন, এবার আপনাদের কামরায় গিয়ে বিশ্রাম করতে পারেন। আমার হাতে কয়েকটা জরুরী কাজ রয়েছে। চলুন, আপনাদের পৌঁছে দিয়ে আসি।'

একটা বেল বাজাতেই কয়েকজন গার্ড এসে পায়ের বাঁধন খুলে দিয়ে দাঁড় করাল ওদের। নিজেই পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল শাহেদ আলী ভুট্টো। দুই পাশে দুইজন, এবং পিছনে স্টেনগান হাতে একজন প্রহরী চলল সাথে। পালাবার কথা তো



দূরে থাক, এদের হাত থেকে উদ্ধার পাওয়ার কোন চিন্তাই এল না রানার মনে। নিয়তির মতই অমোঘ যেন এদের নাগপাশ। এদের হাত থেকে নিস্তার নেই। শেষ বারের মত এই পৃথিবীর আলো, বাতাস আর সবুজ দেখে নিতে ইচ্ছে করল রানার। কিন্তু আলোও নেই, বাতাসও নেই, সবুজও আড়াল রয়েছে কারাগারের দেয়াল দিয়ে। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে এগিয়ে চলল সে পিছনের ধাক্কায়। একটা দরজার তালা খুলল জেলার।

'শেষ দেখা দেখিয়ে নিয়ে যাই। আসুন।'

ব্রিগেডিয়ার জামান। কিন্তু চিনতে পারা কঠিন। একটা নোংরা বিছানায় শুয়ে ছিলেন তিনি। এই তিন দিনেই আরও কয়েক বছর বেড়ে গেছে যেন ওঁর বয়স। মুখের কয়েক জায়গায় কাটা দাগ—শারীরিক নির্যাতন হয়েছে ওঁর উপর। দুঃখ হলো রানার।

পায়ের শব্দে চমকে উঠে বসলেন ব্রিগেডিয়ার। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে জেলারের দিকে চেয়ে বললেন, 'আমি তোমাকে ঘৃণা করি। কিন্তু যত অত্যাচার করো, রাজি করাতে পারবে না আমাকে। তোমাদের হয়ে একটি কথাও বলব না আমি। এর চেয়ে মৃত্যুই হোক আমার।' হঠাৎ রানার দিকে চোখ পড়তেই বিস্ময় ফুটে উঠল ব্রিগেডিয়ারের দুই চোখে। 'তোমাকেও ধরে এনেছে তাহলে শয়তানরা। লায়লা? লায়লা কোথায়?' থেমে গেলেন ব্রিগেডিয়ার। হাঁ হয়ে গেল মুখটা। ধড়মড় করে উঠে দাঁড়ালেন বিছানা ছেড়ে। 'আপনি! আপনি স্যার এখানে কেন?' মুখটা কালো হয়ে গেল ব্রিগেডিয়ারের। 'আপনাকেও ধরে এনেছে! তাহলে···তাহলে আর সবাই···'

মেজর জেনারেল কোন জবাব দিলেন না। রানাও না। কথা বলল জেলার। বন্দী বৃদ্ধের প্রতি ব্রিগেডিয়ারের এই সম্মান প্রদর্শনে ভয়ানক বিস্মিত হয়েছে সে। কিন্তু সামলে নিল।

'আমরা ওঁদের ধরে আনিনি, ব্রিগেডিয়ার জামান। ওঁরা নিজেরাই এসে ধরা দিয়েছেন। ভাঁওতা দিয়ে আপনাকে উদ্ধার করতে এসেছিলেন ওঁরা শাহকোট কারাগারে।' হাসল জেলার তাচ্ছিল্যের হাসি।

রানার কাঁধে একটা হাত রাখলেন ব্রিগেডিয়ার। 'তোমার জন্যে আমি দুঃখিত, মিস্টার শরাফ আলী। আমাকে রক্ষা করতে এসেই তোমাকে এই অকালে মৃত্যুবরণ করতে হচ্ছে। কিন্তু মরার আগে একটা কথা জেনে রাখো যুবক—আমি তোমার জন্যে গর্বিত।' মেজর জেনারেলের দিকে ফিরলেন ব্রিগেডিয়ার, বললেন, 'আপনাকে আমার কিছুই বলার নেই, স্যার। শুধু বুঝতে পারছি, আমি আপনার কতখানি স্নেহের পাত্র। নিজেকে ধন্য মনে হচ্ছে, স্যার।' হঠাৎ আবার মনে পড়ল ছেলেমেয়ের কথা। বললেন, 'ওরাও কি···?'

'না,' এতক্ষণে কথা বললেন মেজর জেনারেল। 'আমরা ছাড়া সবাই মুক্ত।'

মস্ত একটা হাঁফ ছাড়লেন ব্রিগেডিয়ার। 'উফ্! বাঁচলাম! এখন মরতে আর

আমার কষ্ট হবে না, স্যার।'

'মরার কথা ভাবছ কেন, জামান?' মেজর জেনারেলের জলদ গম্ভীর কণ্ঠে ভর্ৎসনা। 'মৃত্যুর এখনও অনেক দেরি আছে তোমার। সেটা যখন হবার হবে যথা সময়ে। খুব অল্প সময়েই মুক্ত হবে তুমি। দেখা পাবে পরিবারের সবার।'"

কথাগুলো অদ্ভুত শোনাল হাতকড়া পরা বন্দী মেজর জেনারেলের মুখে। কিন্তু কণ্ঠস্বরে এমনি একটা দৃঢ় প্রত্যয় ফুটে উঠল যে জেলার পর্যন্ত চমকে উঠল। সামলে নিয়ে টিটকারির সুরে বলল, 'আপনি নিশ্চয়ই পরকালে দেখা হওয়ার কথা বলছেন?'

'না। ইহকালেই।'

'নিয়ে চলো হে···' বলল জেলার গার্ডদের। 'একনি খারাপ হয়ে গেছে মাথাটা!'

## আঠারো

এই নির্যাতনের কোন তুলনা হয় না। স্নায়ুতন্ত্রীগুলো যেন কেউ ধারাল নখ দিয়ে আঁচড়াচ্ছে। পেটের ভিতর পাকস্থলীতে বিড়ালের লোম দিয়ে সুড়সুড়ি দিচ্ছে যেন কেউ। খিচুনি মত হচ্ছে। দেহের সমস্ত পেশীগুলোতে টান পড়ছে, আবার ঢিল হচ্ছে। নিজেকে ভেঙে-চুরে মাটির সাথে মিশিয়ে ফেলতে ইচ্ছে করছে রানার। অস্বস্তি! অস্বস্তিটা যাচ্ছে না কিছুতেই, ক্রমেই বাড়ছে। ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্নেও কল্পনা করতে পারবে না কেউ এই নির্যাতনটা ঠিক কি রকম।

কেউ যেন অসংখ্য মাকড়সা ছেড়ে দিয়েছে রানার গায়ে। শির-শির করে অবাধে হেঁটে বেড়াচ্ছে সেগুলো সারা শরীরে। কোথাও যেন বাতাস নেই। শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। মাথার পিছন দিকটা যেন কেউ চেপে ধরেছে সাঁড়াশী দিয়ে—চোখ দুটোয় অসম্ভব ব্যথা। সবকিছু অন্ধকার হয়ে এল ওর কাছে। মনে হলো অনেক দূর থেকে কে যেন নাম ধরে ডাকছে ওকে। বার বার ডাকছে। কি যেন বলতে চাইছে। কিন্তু শুনতে ইচ্ছে করছে না ওর। ক্রমেই দূরে সরে যাচ্ছে সে, হারিয়ে যাচ্ছে, হারিয়ে যাচ্ছে।

অনেকক্ষণ পর, যেন কত যুগ পর, চিনতে পারল রানা গলাটা। মেজর জেনারেল রাহাত খান।

'মাথাটা উঁচু রাখো, রানা। রানা! রানা! মাথাটা উঁচু রাখো!'

বারবার কথাটা বলছেন মেজর জেনারেল। বারবার।

যেন মস্ত ভার তুলছে, এমনি ভাবে ধীরে ধীরে মাথাটা তুলল রানা। তারপর আবার ঝুলে পড়তে আরম্ভ করল সেটা সামনের দিকে।

'আবার ঝুলে পড়ছে, রানা, তুলে ধরো। মাথা উঁচু করো!'



গমগম করে উঠল মেজর জেনারেল রাহাত খানের কণ্ঠস্বর। নিজের ইচ্ছেশক্তি ধার দিচ্ছেন তিনি রানাকে। ওঁর কণ্ঠে জাদুকরের সম্মোহন। একই সুরে একই আদেশ দিয়ে চলেছেন উনি বারবার। আদেশটা রানার অবচেতন মনের প্রতি, চেতন মন আর আদেশ গ্রহণ করতে পারছে না। ঝুলে পড়া মাথাটা আবার সোজা করল রানা।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, হয়েছে। এই তো, গুড বয়। এইবার চোখ মেলে চাও। সোজা আমার চোখের দিকে চাও, রানা।'

চোখ খুলে ফেলল রানা, তারই মত বাঁধা রয়েছেন মেজর জেনারেল চেয়ারের সাথে। অসম্ভব লাল হয়ে গেছে ওঁর চোখ দুটো। কেমন যেন পাগলাটে দেখাচ্ছে। কপালের উপর ফুলে উঠেছে অসংখ্য শিরা। কাঁচা-পাকা ভুরু জোড়া কুঁচকে চেয়ে রয়েছেন তিনি রানার দিকে ঋজু ভঙ্গিতে সোজা হয়ে বসে।

'মাথাটা কিছুতেই নিচে নামতে দিয়ো না, রানা। চোখ খুলে রাখো। ধীরে ধীরে কেটে যাবে। কিছুক্ষণের মধ্যেই কমে যাবে কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন। নিজেকে শক্ত করে রাখো, ঢিল দিলেই আর ফিরে আসতে পারবে না।

রানাকে ব্যস্ত রাখার জন্যে অনর্গল কথা বলে যাচ্ছেন মেজর জেনারেল, নিজের জীবনের অদ্ভুত, আশ্চর্য সব ঘটনা, ব্রিগেডিয়ার জামানের, শামসুল আলমের দেশপ্রেমের কথা, লায়লা, আব্লু, কায়েসের কথা। মাথা ঝুলে পড়তে চাইলেই সাবধান করছেন। জীবনে এত কথা শোনেনি কখনও রানা স্বভাব-গম্ভীর বৃদ্ধের মুখে। আশ্চর্য হয়ে শুনল রানা, একাত্তরের পঁচিশে মার্চ কিভাবে ধরে নিয়ে এল ওঁকে ক্যান্টনমেন্টে, তারপর থেকে কি অসম্ভব শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করা হয়েছে তাঁর উপর আটকের বন্দীশালায়। শুনতে শুনতে নিজেকে অত্যন্ত ক্ষুদ্র মনে হলো রানার। এই মহৎ প্রাণ লোকটা কেবল বয়সে নয়, সবদিক থেকে ওর চেয়ে অনেক বড়। শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে আসতে চাইছে, কিন্তু অমনি আসছে কখনও সাবধান বাণী, কখনও ধমক—মাথা সোজা করো, রানা! জ্বালা মুসিবৎ, ভাবল রানা, একটু সম্মান দেখানোরও উপায় নেই।

মিনিট পনেরো পরই ধীরে ধীরে কমে যেতে থাকল অস্বস্তিটা। নষ্ট হয়ে যাচ্ছে ওষুধের গুণ। ধীরে ধীরে আবার স্বাভাবিক হয়ে আসছে নার্ভগুলো। শেষে অপরিসীম ক্লান্তি ছাড়া আর কোন অসুবিধে থাকল না রানার দেহে।

ঠিক এমনি সময়ে কয়েকজন প্রহরী এল। পায়ের শিকল খুলে দেয়া হলো ওদের। ডেকে পাঠিয়েছে জেলার শাহেদ আলী ভুট্টো। দ্বিতীয় ডোজ দেয়া হবে খুব সম্ভব। ভয়ে কুঁকড়ে এল রানার ভিতরটা, কিন্তু সে ভাব গোপন করে উঠে দাঁড়াল। ওরা উঠে দাঁড়াতেই সাহায্য করবার জন্যে এগিয়ে আসছিল দু'জন গার্ড—বিরক্ত ভঙ্গিতে সরিয়ে দিলেন মেজর জেনারেল। রানাও সাহায্য নিল না। মাথা সোজা রেখে হেঁটে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

অফিস কামরায় বসে আছে জেলার। ওদেরকে সোজা হেঁটে ঘরে ঢুকতে দেখে হাঁ হয়ে গেল ওর মুখ। দুই চোখের দৃষ্টিতে ঝরে পড়ল অবিশ্বাস। তাজ্জব হয়ে গেছে যেন সে। ঢোক গিলল একটা।

'অন্য কারও মুখ থেকে ব্যাপারটা শুনলে তাকে মিথ্যুক বলতাম, কিন্তু নিজের চোখকে অবিশ্বাস করি কি করে? আপনারা আশ্চর্য মানুষ। অদ্ভুত আপনাদের মনের জোর। প্রথম ডোজের পর আজ পর্যন্ত কাউকে হেঁটে এ অফিসে ঢুকতে দেখিনি আমি। দ্বিতীয় ডোজের পর আপনাদের কি অবস্থা হয় দেখবার অদম্য কৌতূহল হচ্ছে আমার। বিশেষ করে যখন কর্নেল মুজাফফরের কাছে শুনলাম আপনি হচ্ছেন সেই দুর্দান্ত বাঙালী মেজর জেনারেল রাহাত খান। আপনাকে বন্দী করতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছি আমি। কিন্তু…'

ঘরের একপাশে চাইল জেলার। রানাও চেয়ে দেখল আর্মি ইন্টেলিজেন্সের পোশাক পরা কয়েকজন লোক দাঁড়িয়ে আছে ওদের পিছনে। প্রথমেই চোখ পড়ল বাহাদুর খানের উপর। সবার মাথা ছাড়িয়ে হাতখানেক উপরে রয়েছে ওর মাথাটা। ভয়ঙ্কর একটা নিঃশব্দ হাসি দেখা দিল ওর মুখে। আর একজনকে চিনতে পারল রানা। সে-ও ছিল সেদিন ভ্যানের মধ্যে। তারপরই চোখ পড়ল ওর অপর একজনের উপর। একটু তফাতে দাঁড়িয়ে জানালা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে সিগারেট টানছে সে। ঘুরে দাঁড়াল লোকটা।

শামসুল আলম!

বুকের ভিতর লাফ দিয়ে উঠল রানার কলজেটা।

কিন্তু এটা আলম, না তার প্রেতাত্মা? চোখ দুটো বসে গেছে—কালি পড়েছে চোখের কোলে। কিন্তু কুছ-পরোয়া-নেই ভাবটার কিছুমাত্র পরিবর্তন নেই। তাচ্ছিল্যের সঙ্গে চাইল সে ওদের দিকে, তারপর এগিয়ে এল।

তাহলে? কেমন যেন গুলিয়ে গেল রানার মাথাটা। একটা বিশ্রী সন্দেহ উঁকি দিল ওর মনে। আলমের তো মুক্ত থাকবার কথা নয়! মুক্ত তো আছেই, নিশ্চিন্তে নিজের পোস্টেই আছে সে—এর মানে কি? এও কি সেই প্রেম সংক্রান্ত ঈর্ষা? শেষ পর্যন্ত আলমই কি ডুবিয়েছে ওদের?

কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল রানা, ঠাশ করে একটা চড় পড়ল ওর গালে। এমনিতেই দুর্বল হয়ে পড়েছে সে, তার উপর এই প্রচণ্ড চড়ে মাথাটা ঘুরে উঠল ওর। কোন মতে একটা চেয়ার আঁকড়ে ধরে খাড়া থাকল সে দু'পায়ের উপর। জ্বালা করছে গালটা।

'শিখে রাখো। প্রশ্ন করলে উত্তর দেবে। তার বেশি একটি কথাও শুনতে চাই না।' যেন ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করেছে, এমনি বিরক্ত দৃষ্টিতে নিজের হাতটার দিকে চাইল সে একবার, তারপর সেই একই দৃষ্টিতে চাইল জেলারের দিকে। 'এদের প্রথম ডোজ দেয়া হয়েছিল?'



'হ্যাঁ। প্রথম ডোজ পুরো দেয়া হয়েছে। আপনারা দ্বিতীয় থেকে আরম্ভ করবেন, ক্যাপ্টেন ফরহাদ। আমি সবকিছু এই ব্যাগে ভরে দিয়েছি ইনস্ট্রাকশন সহ। কোন অসুবিধে হবে না। দুঃখ এই, আমি নিজের হাতে…'

'দুঃখ করবেন না। ব্রিগেডিয়ারের কাজ শেষ হয়ে গেলেই আপনার লোক আপনাকে ফেরত দেয়া হবে। তবে আস্ত পাবেন কিনা বলতে পারি না।' মৃদু হাসল আলম। তারপর বাহাদুরের দিকে ফিরে বলল, 'কি হে, দৈত্যরাজ, বোকার মত দাঁড়িয়ে রইলে কেন? তোলো এগুলোকে গাড়িতে।'

বাহাদুরের প্রকাণ্ড থাবা মুঠি করে ধরল রানার চুল। তারপর প্রায় ঝুলাতে ঝুলাতে নিয়ে চলল অফিস কামরা থেকে বের করে। রিসার্চ স্কলার শাহেদ আলী ভুট্টো প্রায় আর্তনাদ করে উঠল, 'ক্যাপ্টেন ফরহাদ, দয়া করে একটু দেখবেন যেন যেমন নিয়ে যাচ্ছেন তেমনি ফেরত দিতে পারেন। আমার হয়ে একটু বলবেন ব্রিগেডিয়ার গুলজার খানকে…'

'কিন্তু কর্নেল মুজাফফর শুনলে তো! তবু বলে দেখব। আচ্ছা, আর দেরি করা যায় না, চলি এখন, স্লামালেকুম।'

হেঁচড়ে নিয়ে এসে তোলা হলো ওদের আর্মি ইন্টেলিজেন্সের পিকাপে। রানা দেখল, ব্রিগেডিয়ার জামানকে আগেই তোলা হয়েছে গাড়িতে। বাহাদুর এবং আরও দু'জনকে নিয়ে আলম উঠল পিছনে। গার্ডদের হাতের স্টেনগান তৈরি থাকল। ছেড়ে দিল পিকাপ।

একটা ম্যাপ বের করে খানিকক্ষণ কি যেন দেখল আলম। তারপর ড্রাইভারকে বলল, 'মানানওয়ালা ছাড়িয়ে দশ মাইল গিয়েই আমাকে বলবে।'

সবাই চুপচাপ। একটার পর একটা সিগারেট টেনে চলেছে আলম গুরুজনদের তোয়াক্কা না করেই। সামনে বসে রয়েছে ওর আপন চাচা, চাচার বন্ধু—পরোয়া নেই কোন।

ড্রাইভার বলল, 'এসে গেছি, স্যার।'

'হাতের ডাইনে একটা সরু রাস্তা পড়বে। সেই রাস্তায় ঢুকে চলতে থাকবে আমি থামতে না বলা পর্যন্ত।'

হাইওয়ে ছেড়ে ঢুকে পড়ল ওরা সরু রাস্তায়। উঁচু নিচু মোষের গাড়ি চলার রাস্তা। ঝাঁকি খেতে খেতে চলল গাড়ি। খানিক গিয়েই জঙ্গল শুরু হলো। থামতে বলল আলম। লাফিয়ে নামল রাস্তায়। পিছন পিছন নামল বাহাদুর খান এবং অন্যান্য গার্ডরা। পিস্তলের ইঙ্গিতে মেজর জেনারেল, ব্রিগেডিয়ার জামান আর রানাও নামল।

গাড়িটা ঘুরিয়ে রাখা হলো রাস্তার উপর এঞ্জিন স্টার্ট দেয়া অবস্থায়।

'সবাই চলো। জলদি। ড্রাইভারও এসো। বাহাদুর, তুমি পারবে না এই তিনটেকে সামলাতে? পিস্তল নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকো পিছনে। একটু নড়চড়া করলেই শেষ করে দেবে। দয়ামায়ার সময় নয় এটা।'

'নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, স্যার।' কিচমিচ করে উঠল বাহাদুরের মিকি মাউজ গলা। ভয়ঙ্কর নিঃশব্দ হাসি ওর মুখে।

প্রত্যেকের হাতে একটা করে কোদাল বা শাবল। জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল আলম ওদের নিয়ে। কি করছে, কেন করছে বুঝতে পারছে না কেউ। কিন্তু অর্ডার ইজ অর্ডার।

দুই ঘণ্টা নার্ভের উপর অকথ্য অত্যাচারের ফলে দুর্বল বোধ করছে রানা। হাঁটুতে জোর পাচ্ছে না। দাঁড়িয়ে থাকতে কষ্ট হচ্ছে। মনে হচ্ছে পা ভাঁজ হয়ে পড়ে যাবে এক্ষুণি। শরীরটা কাঁপছে মাঝে মাঝে থরথর করে।

ট্রিগার টেপার কোন ছুতো বের করা যায় কিনা দেখবার জন্যে সরু গলায় ধমকে উঠল বাহাদুর, 'অ্যাই হারামজাদা, কাঁপুনি বন্ধ কর।'

কেউ কোন জবাব দিল না। খানিকক্ষণ উসখুস করে আবার বলল, 'শয়তানের বাচ্চা! বাংগালী! মরণ দেখে কাঁপ উঠে গেছে—নিমকহারামী করার সময় মনে ছিল না? তিনজনকে একসাথে পুঁতবে। ভগোয়ানের নাম কর! মালাউন!'

কিছু বলতে যাচ্ছিল রানা, বাহাদুরকে আড়াল করে চোখ টিপলেন মেজর জেনারেল। এবারও কেউ কোন জবাব দিল না। একটু তেতে উঠেই গুলি করতে চাইছে বাহাদুর, কিন্তু সুযোগ পাওয়া যাচ্ছে না দেখে বিরক্ত হয়ে উঠল। বলল, 'আহি, শুয়োরের বাচ্চারা! কথা বলছিস না কেন?'

তবু জবাব দিল না কেউ। এটাকেই একটা ইশ্যু বানিয়ে খেপে ওঠার তাল করছিল বাহাদুর, এমনি সময় ফিরে এল আলম। একা।

'পুরোদমে কাজ চলছে,' বলল আলম। 'এরা কোন গোলমাল করেনি তো, বাহাদুর?'

'নাহ!' দুঃখের সঙ্গে জানাল বাহাদুর। 'কি গোলমাল করবে, ভয়েই কাঁপছে ঠকঠক করে।'

'দুঃখ কোরো না, বাহাদুর, তোমাকে প্রতিশোধ নেয়ার সুযোগ দেয়া হবে। ব্যথাটা কমেছে তোমার?'

'কমেছে স্যার, কিন্তু এখনও ফুলে আছে। উ—হ!'

অনেক কাছে চলে এসেছিল আলম। অতর্কিতে ওর রিভলভারের বাঁটটা পড়ল সশব্দে বাহাদুরের খুলির উপর, কানের পিছনে। পিস্তলটা ছিটকে পড়ল ওর হাত থেকে। উ—হ বলেই দড়াম করে আছড়ে পড়ল সে রাস্তার উপর। মুহূর্তেই জ্ঞান হারাল।

দশ সেকেন্ডের মধ্যেই খুলে গেল হাতকড়াগুলো। একলাফে ড্রাইভিং সীটে গিয়ে বসল আলম। তিনজন পিছনে উঠে বসতেই ছুটল পিকআপ যে পথে এসেছিল সেই পথে।



# উনিশ

মাইল কয়েক এসে থামল আলম। একটা ফ্লাস্ক নামাল কাঁধ থেকে। সবগুলো দাঁত বেরিয়ে গেছে ওর। আকর্ণ বিস্তৃত হাসি হেসে বলল, 'ব্র্যান্ডি। দুই ঢোক করে খেলে তিনজনেরই হয়ে যাবে।'

মেজর জেনারেল খেলেন না, ফলে তিন ঢোক করে পড়ল ব্রিগেডিয়ার জামান আর রানার কপালে। অবসাদে মুহ্যমান হয়ে গিয়েছিল রানা, ব্র্যান্ডিটুকু খেয়ে যেন প্রাণ ফিরে পেল সে।

'কিন্তু আপনাকে এমন বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে কেন, মিস্টার আলম? আপনার শরীর কেমন?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'শারীরিক কুশলাদি নিয়ে পরে আলাপ করা যাবে। এখন লেজ দাবিয়ে প্রাণপণে ভাগতে হবে আমাদের, মিস্টার রানা। চলতে চলতে গল্প করা যাবে।'

আবার ছুটল গাড়ি। মুখ খুলল আলম।

'আজকের প্রথম খবর, পাকিস্তান আর্মি ইন্টেলিজেন্স থেকে রিজাইন দিয়েছি আমি। দিতে হলো। অনিচ্ছাসত্ত্বেও।'

'তা তো বটেই,' বললেন মেজর জেনারেল। 'কেউ জানে এখনও?'

'গুলজার খান জানে। আমি অবশ্য লিখিত ভাবে কোন দরখাস্ত দিইনি, কিন্তু হাত-পা বেঁধে যখন ওকে ওর নিজেরই অফিস কামরার সংলগ্ন বাথরুমে ফেলে এসেছি, তখন এ বিষয়ে ওর নিশ্চয়ই আর কোন সন্দেহ নেই, স্যার।'

'গুলজার খান! মানে আপনার চীফ?' বলল রানা চোখ কপালে তুলে।

'এক্স চীফ। হ্যাঁ, ওকেই বেঁধে রেখে এসেছি। কিন্তু গোড়া থেকেই বলি, তাহলে বুঝতে সুবিধে হবে। কাল আব্দুকে দিয়ে খবর পাঠিয়েছিলাম যে আমাকে শারকপুর পাঠানো হচ্ছে একটা বড় রকমের সিকিউরিটি চেক-আপের জন্যে কর্নেল মুজাফফরের আদেশে। কর্নেল নিজেই যেত, কিন্তু ঝেলামে কি একটা জরুরী কাজ পড়ে যাওয়ায় আমাকে পাঠাচ্ছে। ক্যাপ্টেন ফরহাদ, আর জন দশেক সিপাইকে নিয়ে চলে গেলাম শারকপুর সকাল-সকাল। আমার মনটা খুব খারাপ হয়ে গিয়েছিল, কারণ সকাল বেলায় অফিস থেকে বেরোবার সময় হঠাৎ একটা আয়নায় চোখ পড়তেই দেখলাম ব্রিগেডিয়ার গুলজার খান অদ্ভুত এক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে আমার দিকে। গুলজার খানের পক্ষে এটা এমন কিছু অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়, ব্যাটা নিজের বউকে পর্যন্ত সন্দেহ করে ইণ্ডিয়ান এজেন্ট বলে। কিন্তু কেমন একটু দ্বন্দ্ব এল মনে। সন্দেহ হলো।'

'মানুষকে সন্দেহ করা আপনার একটা মহা বদভ্যাস,' মৃদু হেসে বলল রানা।

কথাটা শুনে হাসল আলম। বলল, 'এই একটি মাত্র বদভ্যাসের বলেই টিকে আছি আমি আজ পর্যন্ত। যাক, সন্দেহটা মন থেকে জোর করে তাড়িয়ে দিয়ে রওনা হয়ে গেলাম। কিন্তু যখন শারকপুরে প্রায় পৌঁছে গেছি এমন সময় একেবারে ভূত দেখানো চমকে দিল আমাকে ক্যাপ্টেন ফরহাদ সাধারণ একটা কথা বলে। কথায় কথায় বলল, কর্নেলের ড্রাইভারের সাথে কথা হচ্ছিল ওর আজ সকালে, শুনল খুব দৌড় দৌড়াতে হবে আজ বেচারাকে; কর্নেল যাচ্ছে শাহকোট কারাগারে, ওখান থেকে লাহোর ফিরে যাবে নারোয়ালের দিকে।'

হাসল আলম। 'এই এক কথায় সবকিছু পানির মত পরিষ্কার হয়ে গেল আমার কাছে। আমাকে শারকপুরে সরিয়ে দেয়া, গুলজার খানের বাঁকা দৃষ্টি, কর্নেল মুজাফফরের ঝেলাম যাওয়ার ব্যাপারে মিথ্যেকথা, কথায় কথায় আমাকে শাহকোট জেলখানার কথা বলা, চীফের অফিসে অতি সহজেই কাগজপত্র সংগ্রহ করবার সুযোগ লাভ—সবকিছুর মধ্যেই যোগসূত্র খুঁজে পেলাম। কিভাবে আমাকে সন্দেহ করল ওরা জানি না। এখনও সেটা আমার কাছে রহস্যই রয়ে গেছে।

'কিন্তু বুঝলাম, সর্বনাশ হয়ে গেছে। আমার পাঠানো কাগজপত্র নিয়ে সোজা গিয়ে ঢুকবেন আপনারা কর্নেল মুজাফফরের পেতে রাখা ফাঁদে। কিছুতেই ঠেকানোর উপায় নেই আপনাদের। প্ল্যান শুরু করলাম। যদ্দূর মনে হলো, হয়তো আমার ব্যাপারটা মুজাফফর আর গুলজার খানের বাইরে জানাজানি হয়নি। ক্যাপ্টেন ফরহাদ কর্নেলের অত্যন্ত বিশ্বস্ত প্রিয়পাত্র—সেও যখন কিছুই জানে না, তখন আশা করা যায় হেডকোয়ার্টারের আর সবাইও কিছুই জানবে না। আমাকে ভয়ঙ্কর ধূর্ত হিসেবে জানে ওরা, কাজেই গুলজার খান বা কর্নেল মুজাফফর আর কাউকে বলবার সাহস পাবে না জানাজানির ভয়ে।

'কাজেই শারকপুরে পৌঁছেই চারদিকে ত্রাসের সঞ্চার করবার ঢালাও হুকুম দিয়ে ছড়িয়ে দিলাম সিপাইগুলোকে। তারপর ক্যাপ্টেন ফরহাদকে নিয়ে ঢুকলাম একটা পোড়ো বাড়িতে।' একটু হাসল আলম। 'বেচারা এখনও বোধহয় সেই পোড়ো বাড়ির গুদাম ঘরে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে হাত-পা বাঁধা অবস্থায়। কিন্তু কি করব, উপায় ছিল না আর। ওর আইডেন্টিটি কার্ডটা ছিনিয়ে নিয়েই সোজা ছুটলাম লাহোরের দিকে। হেডকোয়ার্টারে পৌঁছেই সোজা গিয়ে ঢুকলাম গুলজার খানের অফিস কামরায়।

'তারপরের ঘটনাগুলো খুবই সহজ। ভূত দেখার মত চমকে উঠল গুলজার খান আমাকে দেখে। ওর হাঁ হয়ে যাওয়া মুখের ভিতর ঢুকিয়ে দিলাম পিস্তলের নলের অর্ধেকটা। ওকে দিয়ে লিখিয়ে নিলাম আপনাদের হ্যাণ্ডওভার করবার অর্ডার। প্রাণের ভয় বড় ভয়। পাঞ্জাবীদের আবার এ ভয়টা বেশি। সীল দিয়ে সই করল সে চিঠিটা। তারপর এমন ভাবে স্ট্র্যাপে-স্ট্র্যাপে বাঁধলাম ব্যাটাকে যে চোখ আর ভুরু জোড়া ছাড়া



সারা শরীরের আর কিছু নড়াবার উপায় রইল না ওর। মুখের মধ্যে আগেই ঠেসে দিয়েছি রুমাল। এবার শাহকোটের ডিরেক্ট টেলিফোনটা তুলে ব্রিগেডিয়ার গুলজার খানের কণ্ঠস্বর অবিকল নকল করে জেলারকে বললাম, ক্যাপ্টেন ফরহাদ বলে একজনকে পাঠাচ্ছি এই তিনজন বন্দীর জন্যে, সাথে নিজ হাতে লেখা চিঠি যাচ্ছে—বিনা দ্বিধায় যেন সে ফরহাদের হাতে দিয়ে দেয় বন্দীদের। কয়েকজন মিনিস্টার আসছেন হেডকোয়ার্টারে জরুরী বৈঠকে। গুলজার খানের চেহারাটা তখন দেখবার মত হয়েছিল।'

'কিন্তু কর্নেল মুজাফফর যদি থাকত সেই সময় অফিসে? কিংবা...'

রানার প্রশ্নটা শেষ করতে দিল না আলম। বলল, 'মুজাফফর এখন রয়েছে নারোয়াল থেকে ফেরার পথে। আপনারা যে গাড়িতে করে শাহকোট গিয়েছিলেন, কাঁচা রাস্তার ওপর সেটার চাকার দাগ ধরে ছুটেছিল সে আমাদের গোপন আস্তানা বের করবার আশায়।'

'লায়লা?' একসাথে প্রশ্ন করল রানা, ব্রিগেডিয়ার ও মেজর জেনারেল।

'আবলুকে পাঠিয়ে দিয়েছি অনেক আগেই শর্টকাট রাস্তায় গিয়ে লায়লাকে সরিয়ে ফেলার জন্যে। আমরা এখন চলেছি আমাদের আসল আস্তানায়। শাকরগড়ে। এতক্ষণে রওনা হয়ে গেছে ওরা। যাক, যা বলছিলাম, জেলারের সাথে কথা বলবার সময় বারবার হ্যাঁচ্চো দিচ্ছিলাম। জেলার জিজ্ঞেস করায় বললাম ভয়ঙ্কর সর্দির পূর্বাভাস। তার কারণটা বলছি পরে। ফোন সেরে ইন্টারকমে চীফের গলায় অফিসের সবাইকে ধমকে দিলাম। আগামী তিন ঘণ্টার মধ্যে যদি কেউ আমাকে কোনভাবে ডিসটার্ব করে তাহলে আস্ত চিবিয়ে খেয়ে ফেলব; প্রেসিডেন্টও যদি টেলিফোন করে তবু কানেকশন দেবে না। তারপর সেই একই কণ্ঠে মেজর দেলওয়ার খানের জন্যে একটা পিকাপের ব্যবস্থা করতে বললাম নিচে, সাথে চারজন গার্ডও যাবে। সবশেষে টেনে অ্যাটাচড্ বাথরুমে নিয়ে গেলাম গুলজার খানকে। ওর পিছন দিকটায় মাঝারি রকমের একটা লাথি লাগিয়ে দিয়ে বেরিয়ে এলাম ঘর থেকে। বাইরে থেকে তালা মেরে চাবিটা নিয়ে চলে এলাম শাহকোটে। ইশশ্। সব ব্যাটাকে ঘোল খাইয়ে দিয়ে সত্যিই আনন্দ হচ্ছে। আজ সারারাত ঘুমই আসবে না আমার।'

'গার্ডদের সামনেই জেলার আপনাকে ক্যাপ্টেন ফরহাদ বলে ডাকল, ওরা অবাক হলো না কেন এতে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'ওদের বলে রেখেছিলাম যেন শাহকোটে গিয়ে ভুলেও আমাকে মেজর সাব বলে না ডাকে। কারণ ব্যাখ্যা করবার প্রয়োজন ছিল না। অর্ডার ইজ অর্ডার।'

হাসল আলম। এই অদ্ভুত লোকটাকে প্রশংসা করবার ভাষা খুঁজে পেল না রানা। আশ্চর্য প্রতিভাবান মানুষ। কিন্তু ফুরিয়ে আসছে, শেষ হয়ে যাবে লোকটা আর কিছুদিনের মধ্যেই। কথাটা মনে আসতেই খচ্ করে কাঁটার মত কি বিঁধল

রানার মনে।

গাড়ি থামাল আলম আবার। বাইরের দিকে চাইতেই দেখতে পেল রানা কায়েস আলীকে। হাতে একটা ছোট্ট ব্যাগ। মৃত্যু গহ্বর-ফেরত ব্রিগেডিয়ার জামান, মেজর জেনারেল শাহাত খান আর রানাকে দেখে মিষ্টি হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল কায়েসের বীভৎস মুখটা। এই হাসিতে পরিষ্কার চিনে নেয়া যায় ওর সরল সাদাসিধে মন।

আবার ছুটল পিকাপ ঘণ্টায় আশি মাইল বেগে। কায়েসের হাতের ব্যাগটার কথা জিজ্ঞেস করায় আবার হেসে উঠল আলম। বলল, 'শাহকোট যাওয়ার সময় আবলুকে নারোয়ালে পাঠিয়ে কায়েসের কাছে দিয়ে গিয়েছিলাম এই ব্যাগ। টেলিফোন ট্যাপ্ করবার যন্ত্রপাতি আছে এতে। একটা টেলিফোন পোলে চড়ে বসেছিল ও এতক্ষণ লাইনম্যানের ভঙ্গিতে। জেনারেল যদি ক্যাপ্টেন ফরহাদের হাতে বন্দীদের তুলে দেওয়ার আগে গুলজার খানকে ফোন করত, তাহলে মুখে রুমাল চেপে হ্যাঁচ্চোর ফাঁকে ফাঁকে উত্তর দিত কায়েস আলী। জেনারেল বুঝত ব্রিগেডিয়ার গুলজার খানের সর্দি বেড়ে গেছে আরও, গলার স্বরটাও বদলে গেছে তাই, সন্দেহ করবার কিছুই নেই।'

'আশ্চর্য! একবিন্দু ফাঁক রাখেননি কোথাও!' বলল রানা।

এই প্রশংসা মাথা পেতে নিল আলম। বলল, 'ঠিক বলেছেন, আমার বুদ্ধির তুলনা হয় না। কিন্তু সব ভাল যার শেষ ভাল। শেষ কাজটাই বাকি রয়েছে এখনও। গুজরানওয়ালার মেয়েদের উদ্ধার। এবং এটাই সবচেয়ে কঠিন কাজ। আর অল্পক্ষণের মধ্যেই সমস্ত জায়গায় ইনফরমেশন চলে যাবে। সবাইকে সাবধান করে দেয়া হবে। একটা ছুঁচোও চলা-ফেরা করতে পারবে না 'ডিফিকার্ড' ছাড়া। সমস্ত বাধা অতিক্রম করে সবাইকে নিয়ে সহি সালামতে বর্ডার পেরোতে পারলেই বুঝব সত্যি সত্যি সফল হয়েছি আমরা।'

একটানা সাড়ে তিন ঘণ্টা চলবার পর ব্রিগেডিয়ারের দ্বিতীয় আস্তানার কাছে পৌঁছল ওরা। শাকরগড়। মাইল দুয়েক পুবের একটা ছোট্ট নদী পেরিয়ে দশ মাইল গেলেই রাভী। তার ওপারেই ভারতীয় এলাকা। গোপন আস্তানা হিসেবে চমৎকার নিরাপদ জায়গা। সড়ক ছেড়ে খোয়া বিছানো পথে নেমে গেল পিকাপ। দশ মিনিটের মধ্যেই এসে দাঁড়াল গোপন আস্তানায়।

ছুটে গাড়ির কাছে এল গুণ্ডা, তার পিছন পিছন আবলু। ওর চোখ মুখের চেহারা দেখেই চমকে উঠল আলম। 'কি হয়েছে, আবলু? লায়লা কোথায়?'

মাথা নিচু করে চুপ করে থাকল আবলু কিছুক্ষণ। তারপর বলল, 'ধরে নিয়ে গেছে কর্নেল মুজাফফর খান। আমি নারোয়াল পৌঁছবার আগেই।'



# বিশ

বজ্রাহতের মত বসে থাকল গাড়ির সবাই কয়েকটা অসহ্য মুহূর্ত। আলমই সবার আগে সামলে নিল। স্টার্ট বন্ধ করে দিয়ে নেমে গেল সে গাড়ি থেকে। একে একে নামল সবাই। নিঃশব্দে আলমের পিছু পিছু গিয়ে ঢুকল ছোট্ট একতলা বাড়িটায়। জানালা দরজা খুলে দিল আবলু আর কায়েস। ড্রইংরুমে বসে পড়ল সবাই।

গুণ্ডাকে কাছে ডেকে আদর করল রানা। সবাই নিজ নিজ চিন্তায় ডুবে আছে, ওর দিকে কেউ নজর দিচ্ছে না দেখে ছটফট করছিল বেচারা। অদ্ভুত এক দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে আলম—দেখছে বাঘা কুকুরটা কেমন ধন্য হয়ে যাচ্ছে রানার আদরে। এই ক'দিনেই ভাব হয়ে গেছে দু'জনের।

গভীর চিন্তায় মগ্ন ছিল রানা। মাথার মধ্যে একশো একটা প্ল্যান ঘুরপাক খাচ্ছে। ঠিক এমনি সময় বেজে উঠল টেলিফোন। চমকে উঠল সবাই। ব্রিগেডিয়ার জামান তুলে নিলেন রিসিভার। ফ্যাকাসে হয়ে গেল ওঁর মুখটা। কিছুক্ষণ চুপচাপ শুনলেন মন দিয়ে। তারপর বললেন, 'দিন ওকে।' আরও কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটল। ঘরের প্রত্যেকটি প্রাণী পাথরের মূর্তির মত স্থির হয়ে রইল। 'তুই আমাদের ঠিকানা বললি কেন, মা?' আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ। 'অসম্ভব! এটা কিছুতেই হতে পারে না, কর্নেল!' আবার চুপ। শেষে বললেন, 'আচ্ছা, আমি অপেক্ষা করছি।'

রিসিভার নামিয়ে রাখলেন ব্রিগেডিয়ার। রানা লক্ষ্য করল হাতটা অসম্ভব কাঁপছে ব্রিগেডিয়ারের। একবিন্দু রক্ত নেই মুখে। একটা সোফায় বসে দুই হাতে চোখ ঢেকে কিছুক্ষণ মনের সাথে যুদ্ধ করলেন তিনি। সবাই বুঝতে পেরেছে ব্যাপারটা। অসম্ভব কোন প্রস্তাব করেছে কর্নেল মুজাফফর লায়লার মুক্তির বিনিময়ে।

অল্পক্ষণেই সামলে নিলেন ব্রিগেডিয়ার। স্বাভাবিক মুখে সবার দিকে একবার চেয়ে নিয়ে বললেন, 'কর্নেল মুজাফফর খান ফোন করেছিল। লায়লাকেও দিয়েছিল টেলিফোনটা এক মিনিটের জন্যে, যাতে ওর কথার গুরুত্ব দিই আমরা। এই ঠিকানা জানত না সে। কিন্তু চালাকি করে বের করে নিয়েছে। খালি ঘরে টেলিফোনের সামনে লায়লাকে রেখে পাশের ঘরে গেছে কোন ছুতো ধরে। আমাদের সাবধান করবার জন্যে এই নম্বরে ডায়াল করেছে লায়লা। সাথে সাথেই ধরা পড়েছে ওদের টেলিফোন অপারেটারের কাছে।'

'কোথা থেকে ফোন করেছে মুজাফফর?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'লাহোর। আর্মি ইন্টেলিজেন্সের হেডকোয়ার্টার।'

'আমরা চললাম,' বলল রানা। 'এখানে থাকা নিরাপদ নয়, আপনারা সবাই
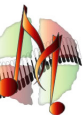
সীমান্ত পেরিয়ে চলে যান পাঠানকোট। আমি আর আলম যাব লাহোর। যে করে হোক ছুটিয়ে আনব লায়লাকে।'

'কারও সাধ্য থাকলে তোমাদের দু'জনেরই আছে,' বললেন ব্রিগেডিয়ার। 'আমি জানি তোমাদের কতখানি ক্ষমতা বা সাহস। কিন্তু এখন আর সেটা সম্ভব নয়, রানা। এখন তোমরাও আর পারবে না ওকে ছুটিয়ে আনতে।'

'কি চায় মুজাফ্ফর?' এবার প্রশ্ন করল আলম।

'বদলা-বদলি।'

'কার বদলে লায়লাকে ফেরত দিতে চায়? আমি, আপনি, না...'

'মেজর জেনারেল। কিন্তু এটা অসম্ভব,' বললেন ব্রিগেডিয়ার। 'মেজর জেনারেলকে...'

'সম্ভব।' এতক্ষণ পর ভেসে এল মেজর জেনারেলের জলদ গম্ভীর কণ্ঠস্বর। 'আমি ফিরে যাব।' ব্রিগেডিয়ারকে প্রবল ভাবে মাথা নাড়তে দেখে বললেন, 'আমার কোন ক্ষতি করবে না ওরা। কাজেই আমি স্বেচ্ছায় ধরা দেব।' রানার দিকে ফিরলেন বৃদ্ধ। 'আমাকে আটকে রাখার সাধ্য ওদের নেই। কথা দিচ্ছি, আগামী এক মাসের মধ্যে আমাকে পাবে তোমরা ঢাকার অফিসে, সাততলার সেই কামরায়। আর যদি না ফিরতে পারি, খুব একটা ক্ষতি হবে না। আমাকে ছাড়া চলবে না তা হতেই পারে না। আমি বুড়ো হয়ে গেছি। তোমরা যারা নতুন আছ, কাজ চালিয়ে নেবে তোমরাই, এবং আমার চেয়ে অনেক ভাল ভাবে পারবে।'

কোন উত্তর দিল না রানা। কিন্তু দৃঢ় কণ্ঠে প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিলেন ব্রিগেডিয়ার, 'কিন্তু, স্যার, এ প্রস্তাব মেনে নেয়া আমাদের পক্ষে...' থামিয়ে দিলেন মেজর জেনারেল একটা হাত তুলে।

'তোমরা ছেলেমানুষ...'

'আমিও?' অবাক হয়ে চাইলেন ব্রিগেডিয়ার রাহাত খানের মুখের দিকে।

'হ্যাঁ।' হাসলেন বৃদ্ধ। 'আমার কাছে তুমিও ছেলেমানুষ, জামান। বড়র কথা শুনতে হয়। আমি না গেলে তোমার মেয়ের কি অবস্থা হবে ভেবে দেখেছ? আমার স্বাধীনতার চেয়ে লায়লার প্রাণের দাম অনেক বেশি। একটা সাধারণ কথা বুঝতে পারছ না কেন, আমাকে আটকে রাখতে পারবে না—কিন্তু আমাকে ফেরত না পেলে লায়লার রক্ষা পাওয়ার কোন সম্ভাবনাই নেই। ও শুধু তোমার মেয়েই নয়, আমার ভাতিঝিও...আমি যাবই।'

'কোনদিন আপনার আদেশ অমান্য করিনি, স্যার। কিন্তু আজকে দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, আপনার এ আদেশ...' বেজে উঠল টেলিফোন। 'আমি কর্নেলকে জানিয়ে দিচ্ছি...'

'আমি বলছি,' বাধা দিয়ে বলল আলম। এগিয়ে গিয়ে প্রায় ছোবল দিয়ে তুলে নিল সে রিসিভারটা। 'আমার বিবেচনার ওপর ছেড়ে দিন আপনারা ব্যাপারটা।'

কানে লাগাল রিসিভার। 'হ্যালো, মুজাফ্ফর, মেজর দেলওয়ার খান বলছি।...আছি এক রকম, ভাল আর থাকতে দিলেন কই? যে রকম আদা জল খেয়ে লেগেছেন!...হ্যাঁ, হ্যাঁ, আপনার প্রস্তাব আমরা বিবেচনা করে দেখেছি। এখন আমাদের দিক থেকে একটা প্রস্তাব আছে, আপনারা একটু বিবেচনা করে দেখুন।...আমার মত একজন সুযোগ্য অফিসারকে হারিয়ে আপনারা নিশ্চয়ই যার-পর-নাই হৃদয়যন্ত্রণায় ভুগছেন। লায়লার বদলে মেজর জেনারেল একটু বেশি ভার-পাতলা হয়ে যায়, আমাদের প্রস্তাব হচ্ছে, আপনারা কি ওর বদলে আমার মত এই ক্ষুদ্র প্রাণীকে গ্রহণ করতে রাজি হবেন? একটা কথা ভেবে দেখবেন, আপনার প্রস্তাব নিয়ে বেশি চাপাচাপি করলে আমরা সীমান্ত পেরিয়ে হাত ফসকে যেতে পারি।...হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। আমি ধরে থাকব।'

ব্রিগেডিয়ার এবং মেজর জেনারেলের প্রবল আপত্তি গ্রাহ্য করল না আলম। এক হাতে রিসিভারের মুখটা চেপে ধরে বলল, 'অত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন, স্যার? আমি আত্মত্যাগ করতে যাচ্ছি না। মহত্ত্ব, উদারতা, আত্মদান, ইত্যাদি ভুয়ো কথায় আমার বিশ্বাস...হ্যাঁ, বলুন কর্নেল মুজাফ্ফর?...ওহ্, আমাকে একেবারে ফাটা বেলুনের মত চুপসে দিলেন, সাহেব। নিজের সম্পর্কে যেটুকু উঁচু ধারণা ছিল সব ধূলিসাৎ হয়ে গেল। তবে হ্যাঁ, প্রাণে বেঁচে গেলাম। মরতে আমার ভাল লাগে না। এই একটু বাহাদুরী দেখাচ্ছিলাম আর কি। আপনারা রাজি হয়ে গেলে বিপদে পড়তাম।...তাহলে মেজর জেনারেলকেই চাই?...হ্যাঁ, হ্যাঁ। উনি এক পায়ে খাড়া।... কি বললেন? লাহোর? হাঃ হাঃ হাঃ! হাসালেন দেখছি! উনি কক্ষনো লাহোর যাবেন না।...আপনি কি আমাদের পাগল ঠাউরেছেন? উনি লাহোর গেলে দু'জনেই চলে গেল আপনার হাতের মুঠোয়, একজনকে ফেরত দেয়ার প্রশ্নই ওঠে না। এই যদি আপনাদের সিদ্ধান্ত হয়, তাহলে এক্ষুণি বর্ডার পার হয়ে চলে যাচ্ছি আমরা।...এই তো এতক্ষণে বুঝতে পেরেছেন।... ঠিক আছে, দশ মিনিটের মধ্যে জানান। ততক্ষণে আমরা একটা প্ল্যান তৈরি করে ফেলি বদলাবদলির।'

চোখ বন্ধ করে মিনিট দশেক বসে রইল আলম। ভুরু জোড়া কুঁচকে আছে, এক নাগাড়ে পা নাচিয়ে চলেছে। ঠিক দশ মিনিট পর আবার বাজল টেলিফোন।

'হ্যাঁ।... ভেরি গুড। এবার মন দিয়ে শুনুন। এই বাড়ি থেকে দু'মাইল উত্তরে গিয়ে ডান দিকে একটা সরু রাস্তা আছে। চিনতে না পারলে লায়লাকে বলবেন, সে-ই চিনিয়ে দেবে। সেই রাস্তা ধরে মাইল আড়ায়েক গেলে একটা ছোট নদীর খেয়া ঘাটের সামনে পৌঁছবেন আপনারা। আমরা যাচ্ছি সোজা রাস্তায়। কাঠের ব্রিজটা পার হয়ে নদীর ওপারে চলে যাচ্ছি আমরা এক্ষুণি। ব্রিজটা অবশ্যই ভেঙে দেয়া হবে। আপনারা যেখানে পৌঁছবেন ঠিক তার মুখোমুখি নদীর অপর পারে অপেক্ষা করব আমরা। ওখানে একটা নৌকো আছে পারাপারের জন্যে। ওইখানেই আমাদের বন্দী বিনিময় হবে। সব কথা পরিষ্কার বুঝতে পেরেছেন?'
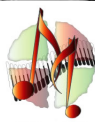
বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে কি যেন শুনল আলম। সবাই শ্বাসরুদ্ধ অবস্থায় অপেক্ষা করছে। আলম বলল, 'আচ্ছা, একটু ধরুন।' মাউথপিসটা হাতের তালুতে চেপে ধরে চাপা গলায় বলল, 'ব্যাটা বলছে ঘণ্টা খানেক সময় দিতে হবে। সরকারী অনুমতির ব্যাপার আছে। তা সত্যিই আছে অবশ্য। কিন্তু এই এক ঘণ্টা সময় পেয়ে ব্যাটারা আর্মড় ফোর্স দিয়ে বাড়িটা ঘেরাও করবার, কিংবা প্লেন পাঠিয়ে বম্বিং করবার ব্যবস্থা করবে কিনা কে জানে।'

'সেটা সম্ভব নয়,' বললেন মেজর জেনারেল। 'ওদের যে-কোন ঘাটি থেকেই এখানে পৌঁছতে দুই থেকে আড়াই ঘন্টা সময় লাগবে কমপক্ষে, আর এই জঙ্গলের মধ্যে এ বাড়ি খুঁজেই পাবে না এয়ারফোর্স।'

'তাহলে ঝুঁকিটা নেয়া যায়?'

'নেয়া যায়।'

'ঠিক আছে, ঘন্টা খানেক সময় দেয়া গেল আপনাকে কর্নেল মুজাফফর।' মাউথপিস থেকে হাত সরিয়ে বলল আলম। 'তার চেয়ে এক মিনিট বেশি দেরি হলে আর টেলিফোন করবার কষ্ট স্বীকার না করলেও চলবে। আমাদের পাবেন না এখানে। আরেকটা কথা। শাহজাদা নারোয়াল, এই রাস্তায় আসবেন। আমাদের দলটা কত বিরাট তা তো জানেনই। সমস্ত রাস্তায় আমাদের লোক থাকবে। যদি সৈন্যবহর নিয়ে আসেন, এসে দেখবেন আমরা চলে গেছি।··· ঠিক আছে, দেখা হবে ঘন্টা তিনেকের মধ্যে।'

রিসিভার নামিয়ে রাখল আলম, তারপর ফিরল সবার দিকে।

'মেজর জেনারেলকে যেতেই হচ্ছে। তিনঘন্টার মধ্যেই।'

আবদু ওর শখের পয়েন্ট টু-টু রাইফেলটা পরিষ্কার করতে বসল পুল-থ্রু আর মোবিল তেল নিয়ে। দশ রাউণ্ডের ম্যাগাজিন। সেমি-অটোমেটিক ব্রোনো। কাম্রেল আলী গম্ভীর মুখে পায়চারি করে বেড়াচ্ছে ব্রিগেডিয়ার জামানের সোফার পিছনে পাঁচ গজ জায়গায়। সোফায় হেলান দিয়ে চোখ বুজে বারবার মাথা নাড়ছেন ব্রিগেডিয়ার জামান। রানা বুঝতে পারছে মেজর জেনারেল রাহাত খানের বিনিময়ে নিজের কন্যাকে ফেরত পাওয়ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছেন তিনি মনে মনে। মেজর জেনারেল নির্বিকার চিত্তে মাস ছয়েক আগের একটা পত্রিকায় মনোনিবেশ করেছেন। এক বোতল হুইস্কি নিয়ে বাইরের বারান্দায় বসেছে আলম। অনেকক্ষণ ধরে অবিরাম মদ খাচ্ছে সে। গুজরানওয়ালার সেই আনিস আম্রাওয়ালার হুইস্কি—ফোক্সওয়াগেনের বুট থেকে উদ্ধার করে সযত্নে রক্ষা করেছে আলম বোতলটা। অর্ধেক হয়ে গেছে বোতল, তবু খেয়েই চলেছে। রানা এসে বসল আলমের পাশে।

'খুব বেশি মদ খাই, তাই না?' বলল আলম।



'হ্যাঁ, একটু অতিরিক্ত। বিশেষ করে···'

'কিন্তু কেন খাব না বলুন তো? জিনিসটা আমি পছন্দ করি।'

'পছন্দ আমিও করি। সময় বিশেষে মাঝে মাঝে আমিও খাই। কিন্তু ভাবছি, পছন্দ করেন বলেই যে আপনি মদ খান, তা নয়।'

'তাহলে কি? ভুলে থাকবার জন্যে?'

'আপনার কথা আমি সব জানি মিস্টার আলম।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল আলম। একটা সিগারেট ঠোঁটে লাগিয়ে প্যাকেটটা এগিয়ে দিল রানার দিকে। রানা নিল একটা। দুটো সিগারেটে আগুন ধরিয়ে দিয়ে চুপচাপ সিগারেট টানল সে এক মিনিট। তারপর হঠাৎ বলল, 'লায়লাকে বিয়ে করবে তুমি, মাসুদ ভাই?'

চমকে উঠল রানা। 'একথা জিজ্ঞেস করছ কেন, আলম?' কতদূর জানে আলম ওদের সম্পর্কে! 'হঠাৎ বিয়ের কথা কেন?'

'আমি চাই আমার বোনটা সুখী হোক। খুব ভাল মেয়ে। তুমি ওকে বিয়ে করো, মাসুদ ভাই। ও সুখী হবে, তোমাকেও সুখী করবে।'

'আমি চাইলেই কি ও বিয়ে করবে আমাকে? স্পাইয়ের জীবন সম্পর্কে তো ভাল করেই জানা আছে তোমার। শান্তিপূর্ণ বিবাহিত জীবনের সঙ্গে এর ঘোর বিরোধ। আমার মত একজন বাউণ্ডুলেকে বিয়ে করতে ও যাবেই বা কেন?'

'করবে। আমি মেয়েমানুষের মন জানি। মুগ্ধ অভিভূত হয়ে গেছে ও তোমার সংস্পর্শে এসে। আমি জানি প্রেমে পড়েছে ও তোমার।'

'হয়তো প্রেম, হয়তো সাময়িক মোহ,' বলল রানা। 'এ সম্পর্কে নিশ্চিত করে বলার সময় আসেনি। সময়ে সব পরিষ্কার হয়ে যাবে। কিন্তু তুমি কি করলে এতদিন? বসে বসে মাছিই মারলে, মুখ ফুটে বলতে পারলে না কিছুই? আমার ওপর হিংসে তো ওদিকে পুরোপুরিই আছে!'

কথাটা ঠাট্টার ছলে বলল রানা, কিন্তু চমকে উঠে চট করে রানার দিকে চাইল আলম। তারপর ম্লান হাসল।

'আমি জানতাম, তুমি ধরে ফেলেছ আমাকে, মাসুদ ভাই। আমি খুব অন্যায় করেছিলাম। সত্যিই, ক্ষমার অযোগ্য অন্যায় করেছিলাম। সন্দেহের পাত্র হিসেবে ছোট করে দেখাতে চেয়েছিলাম তোমাকে লায়লার কাছে, তোমাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করে নিজেকে বড় করতে চেয়েছিলাম লায়লার চোখে। এগারটন রোডের বাসায় তোমার ধরা পড়বার কোন দরকারই ছিল না। আমারই শয়তানি। শালিমার গার্ডেনের সামনে লায়লা চুমো খাচ্ছিল তোমাকে জড়িয়ে ধরে—তাই দেখে হিংসায় ছারখার হয়ে গিয়েছিল আমার অন্তরটা। জানি, কোনই মানে হয় না, তবু কিছুতেই সামলাতে পারলাম না নিজেকে। কিন্তু আমি হেরে গেছি তোমার কাছে মাসুদ ভাই। তুমিও যেমন স্পষ্ট বুঝেছিলে, লায়লাও বুঝেছিল তেমনি পরিষ্কার। কিন্তু তুমি

সব বুঝেও কিছুই বললে না, চুপচাপ সহ্য করে গেলে আমার এই কুৎসিত ব্যবহার। আর তাইতেই হেরে গেলাম। আমার চেয়ে কতখানি বড় তুমি, তখনি টের পেলাম অন্তর দিয়ে। সেজন্যেই তোমাকে মাসুদ ভাই বলে ডাকছি। আমাকে মাফ করবে না, মাসুদ ভাই?' রানার একটা হাত চেপে ধরল আলম। দুই চোখে মিনতি।

ধীরে হাতটা ছাড়িয়ে নিল রানা।

'কি পাগলের মত বকছ, আলম। তুমি প্রাণ বাঁচিয়েছ আমার। তোমার সব দোষ স্খালন হয়ে গেছে। মাফ করার প্রশ্নই ওঠে না। ওসব কথা ভুলে যাও।' কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'কিন্তু তুমি লায়লাকে কোনদিন মনের কথা বলোনি কেন?'

বুকের উপর দুটো টোকা দিল আলম। 'আমার মস্ত বড় একটা অসুখ আছে। আর একমাস আমার আয়ু—হয়তো আরও কম। বলা কি ঠিক হত?' হঠাৎ উঠে দাঁড়াল সে। 'এক ঘণ্টা প্রায় হয়ে এসেছে। চলো কর্নেল মুজাফফর খানের সাথে খানিক আলাপ করা যাক।'

রানা যে কথাটা জানতে বারান্দায় এসেছিল সেটা জিজ্ঞেস করল এতক্ষণে। 'মেজর জেনারেল রাহাত খানকে তাহলে ফেরত দিতেই হচ্ছে?'

'লায়লাকে পেতে হলে ফেরত দিতেই হবে। তাছাড়া উনি নিজেই যখন রাজি...'

টেলিফোন বেজে উঠল ঘরের ভিতর। দ্রুত পায়ে এগিয়ে গিয়ে রিসিভার তুলল আলম। পিছু পিছু ঘরে এসে ঢুকল রানা।

'দেলওয়ার খান স্পিকিং। কর্নেল মুজাফফর?'

সবাই উৎকর্ণ হয়ে রইল। কথা শেষ না হলে জানতে পারবে না কিছুই। আলমের মুখের ভাবভঙ্গি থেকে যতটুকু পারা যায় আঁচ করবার চেষ্টা করতে থাকল সবাই। সবার মনোযোগ এখন আলমের উপর।

দেয়ালে হেলান দিয়ে রিসিভার কানে ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে আলম, চোখ জোড়া ঘরের এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে, কিন্তু কিছুই দেখছে না। হঠাৎ সোজা হয়ে দাঁড়াল সে। ভুরু জোড়া কুঁচকে গেছে ওর।

'অসম্ভব! একঘণ্টা সময় দিয়েছিলাম, কর্নেল মুজাফফর। কিছুতেই আর অপেক্ষা করব না আমরা। সারাদিন বসে বসে আঙুল চুষি আর আপনি রয়ে সয়ে সব ক'জনকে এক সাথে অ্যারেস্ট করুন। মাথা আমাদের খারাপ হয়ে যায়নি, কর্নেল।'

অল্পক্ষণ চুপচাপ শুনল সে মুজাফফরের কথা। বলল, 'ঠিক আছে, অপেক্ষা যদি করতেই হয়, করব—কিন্তু আধ ঘণ্টার বেশি নয়।' হঠাৎ ওপাশ থেকে রিসিভার নামিয়ে রাখার শব্দ শুনেই সাংঘাতিক রকম চমকে উঠল। হাতে ধরা বোবা রিসিভারটার দিকে চাইল সে একবার, তারপর নামিয়ে রাখল সেটা। নিচের ঠোঁটটা কামড়ে ধরে কয়েক সেকেণ্ড কি যেন চিন্তা করল সে।

'কি হলো?' জিজ্ঞেস করলেন মেজর জেনারেল।



'মুজাফফর বলছে পিণ্ডির সাথে কণ্ট্যাক্ট করেছিল, কিন্তু প্রেসিডেন্ট এখন ক্যাবিনেট মীটিং-এ রয়েছে...আধ ঘণ্টা পর ভাঙবে মীটিং। আধঘণ্টা সময় চাইছে সে। ইশ্‌শ...গর্দভ আমি একটা!'

'ভেঙে বলো আলম,' মেজর জেনারেলের কণ্ঠে উদ্বেগ প্রকাশ পেল।

'আমি একটা ছাগল! আবলু, পিকাপটায় স্টার্ট দে। এক্ষুণি। কায়েস, গোটা কয়েক গ্রেনেড আর ওই সামনের ব্রিজটা ওড়াবার পক্ষে যথেষ্ট পরিমাণে অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট, আর সেই সাথে ফিল্ড টেলিফোনটা নাও। জলদি! শিগগির বেরোও সবাই বাড়ি থেকে! কথা বলার সময় নেই!'

কেউ কোন প্রশ্ন করল না। ছুটে বেরোল সবাই বাড়ি থেকে। আধ মিনিটের মধ্যেই সব মালপত্র উঠে গেল পিকাপে। সবশেষে এল আলম। থমকে দাঁড়াল গেটের সামনে। গলগল করে রক্ত বেরিয়ে এল ওর নাক-মুখ দিয়ে। অনেক রক্ত। ছুটে গিয়ে ধরল ওকে রানা। সরিয়ে দিল সে রানাকে একপাশে। পকেট থেকে রুমাল বের করে নাক মুখের রক্ত মুছে ফেলে দিল রুমালটা। কারও সাহায্য ছাড়াই হেঁটে এসে গাড়িতে উঠে বসল সে। ছেড়ে দিল গাড়ি।

'মারাত্মক ভুল হয়ে গেছে, স্যার,' বলল আলম মেজর জেনারেলকে। 'কর্নেল মুজাফফর ফোন করছে পাবলিক টেলিফোন থেকে। আগেই বোঝা উচিত ছিল আমার। হেডকোয়ার্টারে বসে কর্নেল পাবলিক ফোন ব্যবহার করছে! কারণ? লাহোরে নেই সে এখন। এর আগেরবারও নিশ্চয়ই সে লাহোর থেকে ফোন করেনি, করেছিল সিধানওয়া বা পাসরুর থেকে। ধূর্ত, ধড়িবাজ মুজাফফর খান লাহোর থেকে রওনা হয়ে গেছে অনেক আগে। ক্রমেই এগিয়ে আসছে সে দলবল নিয়ে। আমাদের দেরি করাবার জন্যে পথে থেমে থেমে ভুয়ো টেলিফোন করছে। গভর্নমেন্ট পারমিশন ক্যাবিনেট মীটিং, সব মিথ্যে কথা। এই কথাটা জানবার জন্যে একঘণ্টা সময় লাগার কথা নয়। কয়েক ঘণ্টা আগেই রওনা হয়ে গেছে সে লাহোর থেকে। আমরা এখানে পৌঁছবার আগেই। ছিঃ, ছিঃ, এই সাধারণ চালে ঠকে গেলাম আমি! খুব সম্ভব আর পাঁচ মাইলও দূরে নেই ওরা এখন। দশ মিনিটের মধ্যে এসে পৌঁছবে এখানে।

## একুশ

অপেক্ষা করছে ওরা। বাড়ি থেকে দুশো গজের মধ্যে।

ব্রিজটা পার হয়ে জঙ্গলের আড়ালে বেশ অনেকটা দূরে পিকাপ রেখে সরে এসেছে ওরা বাড়ির কাছে। টেলিফোন পোস্টের কাছে জঙ্গলের মধ্যে দাঁড়িয়ে

অপেক্ষা করছে ওরা। ব্রিজের গোড়ায় অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট বসিয়েছে আলম আর কায়েস আলী। পিকাপের চাকার দাগ মুছে ফেলেছে ওরা সবাই মিলে। অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট থেকে প্লাঞ্জার পর্যন্ত সরু তারটা ঢেকে দেয়া হয়েছে ধুলো দিয়ে। ঝোপের আড়ালে প্লাঞ্জার নিয়ে লুকিয়ে বসে আছে কায়েস।

এরই মধ্যে বাঁদরের মত স্বচ্ছন্দে পোস্ট বেয়ে উঠে কানেকশন দিয়ে দিয়েছে আবলু ফিল্ড টেলিফোনের সাথে। দশ মিনিটের মধ্যেই প্রস্তুত হয়ে নিয়েছে ওরা।

আরও দশ মিনিট কেটে গেল। হিসেব করেই সময় চেয়েছিল কর্নেল মুজাফফর। টেলিফোনের ঠিক পঁচিশ মিনিট পর মোড়ের উপর দেখা গেল শত্রু পক্ষকে। সামনের প্রকাণ্ড ট্রাকের মধ্যে পরিষ্কার দেখতে পাওয়া গেল কর্নেল মুজাফফরকে। ওটা ওর ট্রাক-কাম-অফিস। পিছন পিছন এল একটা খাকি রঙের ট্রাক, সৈন্য ভর্তি। তৃতীয় গাড়িটা দেখেই চমকে উঠল সবাই। বিরাট একখানা আর্মার্ড হাফ-ট্রাক, অ্যান্টি ট্যাঙ্ক গান ফিট্ করা আছে। যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হয়েই এসেছে কর্নেল মুজাফফর খান।

একশো গজ থাকতেই হাফ-ট্রাকটাকে পিছনে ফেলে দ্রুত এগিয়ে গেল সামনের ট্রাক দুটো বাড়ির কাছে। ঝপাঝপ্ লাফিয়ে নামল জনা বিশেক পাঞ্জাবী সৈন্য, ঘিরে ফেলল পুরো বাড়িটা।

'বুমম!'

পঞ্চাশ গজ এসেই থেমে গেয়েছিল হাফ-ট্রাক। বাড়ির দেয়াল লক্ষ্য করে কামান ছুঁড়তে আরম্ভ করল। নিচে থেকে শুরু করেছে। কয়েক সেকেণ্ড পরপর ধসে পড়ছে দেয়ালের একেক অংশ। বিরাট গর্ত হয়ে গেছে বাড়িটার গায়ে। অল্পক্ষণেই গোটা বাড়ির ছাত ধসে পড়বে।

'হারামজাদারা মনে করেছে আমরা আতঙ্কিত মুরগীর বাচ্চার মত ছুটোছুটি করছি এখন সারা বাড়িময়। কর্নেল মুজাফফরকে ভয়ঙ্কর লোক বলে জানতাম...' প্রচণ্ড 'বুমম্' শব্দের জন্য একটু থামল আলম। '... কিন্তু কতখানি ভয়ঙ্কর আজ টের পেলাম। একটি প্রাণীকেও আস্ত রাখবে না সে।'

'ওরা মনে করেছে, আমরা ওই বাড়ির মধ্যেই আছি,' বলল আবলু নিচু গলায়। 'আমাদের সবাইকে খুন করতে চাইছে ওরা!'

'তাহলে মেজর জেনারেলকে জ্যান্ত না পেলেও চলবে ওদের। শেষ করে দিতে চাইছে,' বলল রানা।

'না। আসলে চাইছে, আমরা বেরিয়ে আসি। এই ভয়ঙ্কর কামানের গোলার মুখে রেযিস্ট্যান্সের বিন্দুমাত্র ইচ্ছেও যেন আমাদের না থাকে, তাই এ ব্যবস্থা। বেরিয়ে এলেই গ্রেপ্তার করতে চায়,' বলল আলম।

রানা বুঝল, ইচ্ছে করেই বাজে কথা বলছে আলম। এরা এসেছে আসলে দেশের শত্রুকে এলিমিনেট করতে। বদলাবদলির ব্যাপারটা সম্পূর্ণ ভাওতা। কর্নেল



মুজাফফরের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ অন্য রকম। একটা গোপন সংকল্পে বদ্ধপরিকর হলো রানা।

'সর্বনাশ! এরা মানুষ, না পিশাচ!' ধ্বংসলীলার দিকে চেয়ে মৃদুকণ্ঠে বললেন মেজর জেনারেল। 'এদেরই সাথে ধর্মের ভাই পাতিয়েছিলাম আমরা বাঙালীরা।'

'ওকে কেউ দেখতে পেয়েছ? লায়লাকে?' জিজ্ঞেস করলেন ব্রিগেডিয়ার। সবাই মাথা নাড়ল। কেউ দেখেনি। 'তাহলে এখন একবার ফোন করে দেখা যাক কি বলে মুজাফফর।'

বাড়ির ভিতর ফোন বেজে উঠল ক্রিং-ক্রিং। এখান থেকেও স্পষ্ট শুনতে পেল ওরা। চিৎকার করে কিছু বলল কর্নেল মুজাফফর। হাতের ইশারায় হাফ-ট্রাকের গোলাবর্ষণ বন্ধ করার ইঙ্গিত করল। ওর আদেশ পেয়ে চারদিক থেকে বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়ল সৈনিকেরা হৈ-হৈ করে। সবচেয়ে আগে আগে চলেছে বাহাদুর খান। দুই মিনিটের মধ্যেই সারা বাড়ি খুঁজে কাউকে না পেয়ে খবর দিল বাহাদুর কর্নেলকে। বাড়ির মধ্যে ঢুকল এবার কর্নেল মুজাফফর।

'মেজর দেলওয়ার খান বলছেন নিশ্চয়ই?' পরিষ্কার ভেসে এল কর্নেল মুজাফফরের খনখনে কর্কশ কণ্ঠস্বর। রিসিভার ছাড়াও একটা ছোট্ট স্পীকারে কানেকশন দেয়া আছে। সবাই শুনতে পেল কথাগুলো।

'হ্যাঁ। আপনাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষার নমুনা দেখলাম। এইটাই কি রীতি নাকি পাঞ্জাবী কুত্তাদের?'

'গ্লাল-মন্দ করবেন না। আর ছেলেমানুষী প্রশ্ন করে লজ্জা দেয়ার বৃথা চেষ্টা করবেন না। কোথা থেকে বলছেন আপনি জানতে পারি?'

'আপনার প্রশ্নটা ছেলেমানুষী নয়, জ্যাঠামি মনে হচ্ছে আমার কাছে। কাজের কথায় আসা যাক। লায়লাকে এনেছেন সাথে?'

'নিশ্চয়ই। আমি বলেছিলাম নিয়ে আসছি। এটা আবার কি রকম প্রশ্ন?'

'কথার খেলাপ করেছেন আপনি। আপনার উদ্দেশ্য বদলাবদলি নয়, অন্য কিছু। সেজন্যেই এ প্রশ্ন করতে বাধ্য হচ্ছি। লায়লাকে সত্যিই এনেছেন?'

'নিশ্চয়ই।'

'দেখাতে পারবেন?'

'আমাকে বিশ্বাস করছেন না?'

'বাজে কথা রাখুন, আমরা দেখতে চাই ওকে।'

'একটু ধরুন।' মাউথপিসটা হাতের তালুতে চেপে কিছু অর্ডার দিল কর্নেল ওর লোকদের। কি বলল বোঝা গেল না। তারপর আবার স্পষ্ট ভেসে এল ওর খনখনে কণ্ঠস্বর। 'গোলাগুলি ছোঁড়া হচ্ছিল আপনাদের মেরে ফেলার জন্যে নয়, ভয় দেখাবার জন্যে। একটা চান্স নিয়ে দেখলাম সব ক'জনকে একসাথে পাওয়া যায় কিনা। সেটা যখন হলো না, আমি আবার ফিরে যাচ্ছি আমার প্রথম প্রস্তাবে।

নায়লাকে ফেরত…'

হঠাৎ খপ করে আলমের কাঁধ ধরল রানা। 'আবার বোকার মত ওর ফাঁদে পা দিয়েছ, আলম। সময় নিচ্ছে ও, আর কিছু না। আজেবাজে কথা বলে আমাদের ব্যস্ত রাখার চেষ্টা করছে। তোমার কথা থেকেই বুঝতে পেরেছে ও, আমরা কাছাকাছি এমন এক জায়গায় আছি যেখান থেকে দেখতে পাব নায়লাকে। তাহলে ওরাও কেন চেষ্টা করলে দেখতে পাবে না আমাদেরকে? নায়লাকে দেখাবার অর্ডার দেয়নি ও, আমাদের অবস্থানটা খুঁজে বের করার অর্ডার দিয়েছে।'

গড়-গড় করে টেলিফোনে বাজেয় কথা বলে যাচ্ছে কর্নেল মুজাফফর। এরই ফাঁকে দূর থেকে সরু গলায় একটা আদেশ কানে এল ওদের। চিৎকার করে কেউ কিছু বলল। হাফ-ট্রাকটা ঘুরল ওদের দিকে।

'টেক কাভার!' চিৎকার করে উঠল রানা। দেখে ফেলেছে ওরা এদের পরিষ্কার। 'হাফ ট্রাকটা ঘুরে পিছন দিক থেকে আক্রমণ করার চেষ্টা করবে—জঙ্গলের মধ্যে কামান দেগে কোন লাভ হবে না। কিন্তু ওদের সৈনারা এখনি ফায়ারিং শুরু করে দেবে। সবাই সাবধান।'

এই তরফ থেকে কোন জবাব না পেয়ে বকর বকর থামিয়ে দিয়েছে কর্নেল।

'ফায়ার!' দূর থেকে কর্নেলের তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

সাথে সাথেই গর্জে উঠল দশ বারোটা চাইনিজ স্টেন, দুটো এল. এম. জি. এবং একটা হেভি মেশিনগান। অসংখ্য বুলেট ছুটে এল উন্মত্ত মৌমাছির ঝাঁকের মত। কোনটা হাতুড়ির আঘাতের মত ঠক করে এসে লাগল গাছের গায়ে, কোনটা গাছের গায়ে পিছলে 'বিঙ্‌ঙ্‌' শব্দ তুলে বেরিয়ে গেল ওদের কানের পাশ দিয়ে, কোন কোনটা আবার গাছের ছোট ছোট শাখা ভেঙে ফেলল ওদের মাথার উপর।

সতর্ক হবার আগেই গুলি খেলেন ব্রিগেডিয়ার। ধড়াস করে আছড়ে পড়লেন মাটিতে। মোটা গাছটার আড়াল থেকে বেরিয়ে এগোল রানা। ধমকে উঠল আলম।

'তুমিও গুলি খেয়ে মরতে চাও নাকি, মাসুদ ভাই?'

'মারা যায়নি,' বলল রানা। 'পা নড়ছে অল্প অল্প। সরিয়ে না আনলে যে কোন মুহূর্তে আরেকটা গুলি খেয়ে শেষ হয়ে যাবেন।'

'তুমি থাকো, আমি যাই।'

'না। এক্ষুণি নিয়ে আসছি। রিসিভারটার কাছাকাছি থাকো তুমি।' বুকে হেঁটে এগিয়ে গেল রানা। গুলি চলেছে অবিশ্রাম। মাথার আধ হাত উপর দিয়ে চলে যাচ্ছে সাঁই-সাঁই। রানা পৌঁছে গেল ব্রিগেডিয়ারের পাশে। প্রথমে বুকের উপর কান চেপে পরীক্ষা করল বেঁচে আছেন কিনা, তারপর টেনে নিয়ে সরে এল গাছের আড়ালে। কোথায় গুলি লেগেছে দেখল না রানা। জখমের পরিমাণও বোঝার চেষ্টা করল না। সময় নেই। ব্রিগেডিয়ারকে নিরাপদ জায়গায় শুইয়ে দিয়েই ছুটল সে কায়েস আলীর উদ্দেশে। ব্রিগেডিয়ারের কাছ থেকে সিগন্যাল পাওয়া মাত্র ওর প্লাঞ্জারে চাপ দেয়ার



কথা। যদি সিগন্যালের অপেক্ষায় চুপচাপ বসে থাকে তাহলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। নিভে যাওয়া চুরুটটা দাঁতে চেপে বিরক্ত মুখে বসেছিলেন মেজর জেনারেল একটা গাছের গুঁড়িতে, রানাকে ছুটে চলে যেতে দেখে এগোলেন তাঁর ছেলেমানুষ জামানের দিকে।

কিন্তু কায়েস আলীকে বলা গেল না কিছুই। বলবার সময় নেই আর। ত্রিশ গজ গিয়েই দেখতে পেল রানা, ব্রিজের গোড়ায় এসে গেছে প্রকাণ্ড হাফ-ট্রাক। এবার উঠে আসছে। কামানটা আকাশের দিকে তাক করা। এখনও কিছু বলছে না কেন কায়েস? মাঝামাঝি চলে এসেছে এবার হাফ-ট্রাক। রীতিমত ধড়ফড়ানি শুরু হয়ে গেল রানার বুকের মধ্যে। আর মাত্র দশ গজ এগিয়ে এলেই শেষ হয়ে যাবে ওরা। কি করছে কায়েস? হাঁ করে বসে আছে ব্রিগেডিয়ারের অর্ডারের প্রতীক্ষায়? অস্থিরভাবে হাত মুঠি করে নিজেই প্লাঞ্জারে চাপ দেয়ার ভঙ্গি করল রানা। উদ্বেগ, আতঙ্ক, আর উৎকণ্ঠায় গলা শুকিয়ে গেছে ওর। এইবার ব্রিজের ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করল যন্ত্রদানবটা। বিস্ফারিত চোখে দেখছে রানা, আর মাত্র পাঁচ গজ…চার গজ…তিন গজ…দুই গজ…উহ্! কী করছে কায়েস আলী?

ঠিক এমনি সময় তীব্র আলোর ঝলকানিতে চোখ ধাঁধিয়ে গেল রানার। বজ্রপাতের মত প্রচণ্ড বিস্ফোরণের কড়াৎ শব্দে কানে তালা লাগবার উপক্রম হলো। চৌচির হয়ে ছিটকে গেল চারদিকে মস্ত বড় বড় সিমেন্টের চাঁই। ধসে পড়ল ব্রিজের একাংশে। সাথে সাথেই নাকটা নিচের দিকে করে অদৃশ্য হয়ে গেল হাফ-ট্রাক দৃষ্টিপথ থেকে। ধাতব আওয়াজ এল কানে, তারপরই কেঁপে উঠল যন্ত্রদানবটা নিচে গিয়ে পড়তেই। হাঁপ ছেড়ে রওনা হলো রানা টেলিফোনের দিকে।

ফায়ারিং বন্ধ করে ভয়ার্ত দৃষ্টিতে দেখছে সৈনারা হাফ-ট্রাকের পরিণতি। রিসিভার তুলে নিয়ে রিং করল আলম।

'মুজাফফর? দেলওয়ার বলছি। মাথা খারাপ, বৃদ্ধ তুমি। জানো কাকে গুলি করেছ?'

'কি করে জানব? আর জানলেই বা কি হবে?'

'বলছি কি হবে। ব্রিগেডিয়ার জামানকে গুলি করেছ তোমরা। বেঁচে আছেন কিনা জানি না। যদি মরে গিয়ে থাকেন তা হলে ভাল চাও তো আমাদের সঙ্গে তুমিও বর্ডার পার হয়ে ভেগে পড়ো আজই সন্ধ্যায়।'

'তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে নাকি দেলওয়ার?'

'শোনো। শুনলেই বুঝতে পারবে কার মাথা খারাপ হয়েছে, আমার, না তোমার। ব্রিগেডিয়ারের খাতিরেই নায়লার বদলে মেজর জেনারেল রাহাত খানকে ফেরত দিতে চেয়েছিলাম আমরা। এখনও পরীক্ষা করে দেখিনি, যদি উনি মরে গিয়ে থাকেন, তাহলে তাঁর মেয়ের ব্যাপারে আর আমাদের বিন্দুমাত্রও উৎসাহ থাকবে না। যা ইচ্ছে তাই করতে পারো ওকে নিয়ে। চাই কি শাদী করে নিতে পারো ইচ্ছে
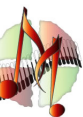
করলে। হাজার হাজার বাঙালী মেয়ের ইজ্জত নষ্ট করেছ তোমরা, আরও একটি মেয়ের না হয় সর্বনাশ হবে। খুব একটা কিছু এসে যাবে না তাতে আমাদের। ব্রিগেডিয়ারের মৃত্যুর পর লায়লার সাথে সাধারণ আর দশটা মেয়ের কোন পার্থক্য থাকবে না আর আমাদের কাছে। আমাদের আত্মীয়া নয় সে। ওর বদলে মেজর জেনারেলকে ফেরত দেয়ার আর প্রশ্নই উঠবে না। এক্ষুণি রওনা হয়ে যাব আমরা ব্রিগেডিয়ারের লাশ নিয়ে। আজই সন্ধ্যায় বর্ডার পেরিয়ে চলে যাব, তোমাদের বাপেরও সাধ্য নেই যে ঠেকাবে—অমৃতসর পৌঁছেই ডাকব প্রেস কনফারেন্স। তোমাদের সমস্ত শয়তানি প্রকাশ হয়ে যাবে। ছি-ছি পড়ে যাবে সারা দুনিয়ায় তোমাদের নীচতা দেখে। লাহোরের মিথ্যা, সাজানো প্রেস কনফারেন্সের ব্যাপারেও চোখ খুলে যাবে সবার। লায়লা সম্পর্কেও স্পষ্ট জবাবদিহি করতে হবে তোমাদের বিশ্বের কাছে। সেই সাথে তোমার অবস্থাটা কি হবে চিন্তা করে দেখো একবার। স্কেপ-গোট খুঁজবে পাকিস্তান সরকার, এবং সমস্ত কোপ গিয়ে পড়বে তোমার ওপর। তোমাকে লাইম লাইটে তুলে ধরার ব্যবস্থা করব আমরা অমৃতসরের প্রেস কনফারেন্সে। কাজেই, বুঝতেই পারছ, যদি ব্রিগেডিয়ার জামান মারা যায়—তুমিও মরবে। বোঝা গেল ব্যাপারটা?'

কিছুক্ষণ চুপ করে রইল কর্নেল। ভাবছে। তারপর নরম গলায় বলল, 'মারা গেছে কিনা দেখুন না, মেজর দেলওয়ার?'

'দেখছি। তুমি যে কটা সুরা মুখস্থ আছে, আওড়াতে থাকো। খোদার কাছে প্রার্থনা করো যেন বেঁচে থাকে। আর তোমার ওই কুত্তাগুলোকে গুলি ছুঁড়তে বারণ করো।'

'আমি এক্ষুণি গুলি বন্ধ করে দিচ্ছি।'

'তোমার প্ল্যানটা আমি এখনও বুঝতে পারছি না আলম। ব্রিগেডিয়ার মারা গিয়ে থাকলে লায়লাকে ছেড়ে দিচ্ছ ওদের হাতে?' বলল রানা। এখন অ্যাকশনের সময় নিজেদের মধ্যে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব বা ভুল বুঝাবুঝি থাকলে কাজে বিঘ্ন ঘটবে। সেজন্যে খোলাখুলি আলাপ করে বুঝে নিতে চায় সে আলমের মতলব—তার আগে কোন সিদ্ধান্ত নিতে বাধো বাধো ঠেকছে ওর। প্রয়োজন হলে আলমের বিরুদ্ধে যেতে হবে ওকে। মেজর জেনারেলকে কোন অবস্থাতেই শত্রুর হাতে তুলে দেবে না সে, এ ব্যাপারে রানা স্থির নিশ্চিত। কিন্তু চতুর আলম কি প্ল্যান আঁটছে জানতে না পারলে সেমসাইড হয়ে যাওয়ার ভয় আছে। কিন্তু কিছুতেই ওর পেট থেকে কোন কথা বের করা যাচ্ছে না। এবারও এড়িয়ে গেল আলম।

'পাগল নাকি? ব্লাফ দিলাম। চলো, মাসুদ ভাই, গুলি বন্ধ হয়ে গেছে, সরিয়ে নিয়ে যাই ওকে।'

গাছের আড়াল থেকে এবার নির্ভয়ে বেরিয়ে এল ওরা। ব্রিগেডিয়ারের পাশে



হাঁটু গেড়ে বসল আলম। শ্বাসক্রিয়া চলছে। কোট খুলে জখমটা পরীক্ষা করে খুশি হয়ে উঠল সে। 'ভয়ের কিছুই নেই। ঘাড়ের কাছ দিয়ে আঁচড় কেটে বেরিয়ে গেছে গুলিটা।'

ধীর পায়ে এসে দাঁড়াল কায়েস আলী। অনায়াসে কোলে তুলে নিল ব্রিগেডিয়ারের জ্ঞানহীন দোহারা শরীরটা। যেন দু'মাস বয়সের কোন শিশুকে কোলে তুলছে। বলল, 'চোট্টা কিমুন? বাচবো তো স্যারে? কুনহানে লাগসে?'

'আরে না, সামান্য আঁচড় লেগেছে ঘাড়ে,' বলল আলম। 'আধঘণ্টার মধ্যেই হেঁটে বেড়াতে পারবেন। হঠাৎ ঝটকা লাগাতেই আসলে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছেন, জখমের জন্যে না। তোমার ব্রিজ ওড়ানোর টাইমিংটা বড় ফাসক্লাশ হয়েছে, কায়েস। আবলু, তুই প্লায়ার্স নিয়ে তৈরি থাক। যেই বলব ওমনি ঘ্যাচ করে তারটা কেটে দিয়ে ছুটে গিয়ে গাড়ির ড্রাইভিং সীটে উঠবি।'

ফোনটা তুলে নিল আলম। 'মুজাফফর? দেলওয়ার বলছি। মরেনি ব্রিগেডিয়ার। ঘাড়ে গুরুতর আঘাত লেগেছে, কিন্তু বাঁচবে।'

'তাহলে বন্দী বিনিময়টা হয়ে যাক।'

'উঁহুঁ। তোমাকে আমি একটা পাই পয়সা দিয়েও বিশ্বাস করি না। বন্দী বিনিময় এখানে হবে না। সেই ফেরীর কাছে চলে যাও। আমরা আধঘণ্টার মধ্যে পৌঁছব সেখানে। চিনতে না পারলে লায়লাকে বলবে, দশ বছর আগে যে ফেরীতে উঠতে চাইছিল না বলে ওকে চড় মেরেছিল ওর আলম ভাই, সেই ফেরীতে যেন নিয়ে যায় পথ দেখিয়ে। এক ঘণ্টার মধ্যে পৌঁছানো চাই। বোঝা গেছে?'

'ঠিক আছে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পৌঁছব আমরা ওখানে। এক ঘণ্টার আগেই পৌঁছে যাব। সন্ধের আগেই সারতে হবে আমাদের সব কাজ।'

'আরেকটা কথা। আমাদের অনুসরণ করে লাভ নেই, বরং মস্ত ক্ষতি হয়ে যাবে তোমার। আর এই টেলিফোনে লাহোর বা শিয়ালকোটের সাথে যাতে যোগাযোগ না করতে পারো, সেজন্যে লাইনটা কেটে দিয়ে যাচ্ছি। যদি এক ঘণ্টার মধ্যে নদীর তীরে না পৌঁছাও, গিয়ে দেখবে চলে গেছি আমরা। গুড বাই।'

পাঁচ মিনিটের মধ্যেই জঙ্গলের আড়াল থেকে রাস্তায় উঠে এল পিকাপটা। ছুটল সোজা পুব দিকে।

সন্ধে হয়ে আসছে। একটা ঝোপের আড়ালে পিকাপটা রেখে হেঁটে ফিরে এল সবাই চারশো গজ। কাদা দিয়ে গাঁথা ইটের একটা ঘর। ফেরী পারাপারের মাঝির জন্যে। দুই ধমকে মাঝিকে ভাগিয়ে দিল আলম। একটা ছেঁড়া চপ্পল পায়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল সে ঘর থেকে—তিন ঘণ্টা পর ফিরবে।

বেশ বড়সড় একটা ঘর। পাশে একটা ছোট ঘর, কিচেন-কাম-স্টোররুম। ব্রিগেডিয়ারকে শোয়ানো হলো মাঝির খাটিয়াতে তেল চটচটে বিছানার উপর। জ্ঞান

ফিরে আসছে ওঁর—বড় বড় নিঃশ্বাস ফেলছেন মাঝে মাঝে। ওরা পাহারা দিচ্ছে পায়ের কাছে বসে।

ছোট ছোট পাথর ফেলে খরস্রোতা এই নদীর দুই পাড় রক্ষার ব্যবস্থা হয়েছে ভাঙন থেকে। একটা নৌকো বাঁধা আছে এপারে। নেমে গেল রানা ও আলম পাড় বেয়ে। রশি দিয়ে চালানো হয় এই ফেরী, দাঁড় বা লগি নেই। দুই গলুইয়ের মধ্যে দুটো ফুটো আছে—তার ভিতর দিয়ে একটা শক্ত রশি ঢুকিয়ে নদীর দুই পারে দুটো গাছের গুঁড়ির সাথে শক্ত করে টেনে বাঁধা। রশি ধরে টান দিলেই সামনে এগোবে নৌকো। চমৎকার ব্যবস্থা। স্রোতে ভেসে যাবার ভয় নেই।

নদীর অপর পারে বেশ অনেকটা জায়গা ফাঁকা। তারপর জঙ্গল, ঝোপঝাড়।

আলো থাকতে থাকতে চারপাশ ভাল করে দেখে নিল ওরা। সাথে সাথে চলেছে ওরা। ফেন খুলে দেয়ায় খুব খুশি হয়েছে সে। আধ মাইল দক্ষিণে নদীর বাঁকটার কাছে অগভীর পানি দেখে একটু উদ্বিগ্ন হলো রানা। তাছাড়া আর সবই ঠিক আছে। ফিরে এল ওরা মাঝির ঘরে। চোখ মেলে চেয়েছেন ব্রিগেডিয়ার, কিন্তু ঘোরটা কাটেনি এখনও। গুরুজনদের এড়িয়ে সবেমাত্র দুটো সিগারেট ধরিয়েছে রানা ও আলম, এমনি সময় ছুটে এল আব্লু। পিঠে স্লিং-এ ঝুলানো পয়েন্ট টু-টু রাইফেল।

'কি ব্যাপার আব্লুস্? এত ব্যস্ততা কিসের?' জিজ্ঞেস করল আলম।

'এসে গেছে কর্নেল মুজাফফর। নদীর ওপারে জমা হয়েছে, আলম ভাই। বলো তো শুরু করে দিই, লাইন ধরে ফেলে দিই গোটা দশেক।' আকর্ণ হাসল আব্লু। চঞ্চল হয়ে উঠেছে ওর তরুণ রক্ত। আজকে কিছু রক্ত ঝরবেই—বুঝতে পেরেছে সে।

ম্যাচের কাঠিটা ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে মাটিতে ফেলল আলম। সিগারেটে লম্বা একটা টান দিয়ে ফুসফুস ভর্তি করে ধোঁয়া নিল, তারপর বলল, 'চল্, দেখি।'

## বাইশ

দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসছিলেন মেজর জেনারেল, হঠাৎ থেমে দাঁড়িয়ে একটা হাত তুলে বাধা দিল আলম।

'আপনি ঘরের ভিতরেই থাকুন স্যার, বাইরে আসবেন না।'

'আমি? ভেতরে থাকব? তুমি ভুলে যাচ্ছ আলম, আমিই একমাত্র লোক যে এখানে থাকছি না।'

'তা ঠিক, স্যার। কিন্তু আপাতত থাকতে হবে আপনাকে ভিতরেই। ওদের



কোন বিশ্বাস নেই। আগে কথা বলে আসি আমরা, তারপর যা হয় করা যাবে।'

নদীর তীরে গিয়ে দাঁড়াল আলম। পিছু পিছু রানা। ওপারে নদীর একেবারে ধার ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে কর্নেলের লোকজন। ছায়ামূর্তির মত মনে হচ্ছে ওদের। চেনা যাচ্ছে না বাহাদুর ছাড়া আর কাউকে। ওর মাথাটা সবার মাথার উপরে। সবচেয়ে আগে, ঢাল বেয়ে নেমে একেবারে পানির ধার ঘেঁষে যে লোকটা দাঁড়িয়ে আছে, তার উদ্দেশে হাঁক ছাড়ল আলম, 'কর্নেল মুজাফফর?'

'বলুন, মেজর দেলওয়ার খান।'

'রাত হয়ে যাচ্ছে, কাজেই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কাজ সেরে ফেলতে হবে। দিনের বেলাই তুমি যে রকম হারামীপনা করলে, রাতের অন্ধকারে না জানি কি করবে। কাজেই ঝটপট বদলাবদলি সেরে নিতে চাই আমরা।'

'আমি আমার কথা রক্ষা করব।'

'যে শব্দের মানে জানো না, সে শব্দ ব্যবহার কোরো না, কর্নেল। 'কথা রক্ষা'র তুমি কি বোঝো? ধূর্ত শেয়ালের আবার কথার দাম! থাক, তোমার ট্রাক এবং লোকজনকে দুশো গজ দূরের ওই জঙ্গলের ধারে সরে যেতে বলো। অত দূর থেকে তাক করে এই সন্ধ্যায় আমাদের গায়ে গুলি লাগাতে পারবে না।'

কর্নেলের আদেশে সবাই সরে গেল নদীর তীর থেকে। ও বলল, 'এবার?'

'এবার এখান থেকে ট্রাকে ফিরেই তুমি ছেড়ে দেবে ব্রিগেডিয়ারের মেয়েকে। ফেরীর দিকে হাঁটতে থাকবে লায়লা, আর ঠিক সেই সময় এখান থেকে মেজর জেনারেল নৌকোয় চড়ে পার হতে শুরু করবেন নদী। নৌকো থেকে নেমে তীরে উঠে দাঁড়িয়ে থাকবেন মেজর জেনারেল। তোমাদের মেশিনগানের রেঞ্জের মধ্যেই থাকছে দু'জন। কাজেই তোমার ভয় নেই—মেজর জেনারেল কোন গোলমাল করতে পারবেন না। লায়লা নৌকোর কাছাকাছি এসে গেলেই উনি ধীরে ধীরে হাঁটতে থাকবেন তোমাদের দিকে। মেজর জেনারেল তোমাদের কাছে পৌঁছবার আগেই লায়লা পৌঁছে যাবে এপারে। অন্ধকারে আন্দাজে গুলি ছুঁড়ে কোন সুবিধা করতে পারবে না। কাজেই নো শুটিং। অলরাইট?'

'অলরাইট।' ঘুরে দাঁড়িয়ে রওনা হলো কর্নেল মুজাফফর জঙ্গলের দিকে।

চিন্তান্বিত মুখে কিছুক্ষণ গাল ঘষল আলম হাতের তালু দিয়ে।

'একটু যেন বেশি বাধ্য ভাব দেখাচ্ছে! নট লাইক কর্নেল মুজাফফর। একটু যেন···নাহ্। অতিরিক্ত সন্দেহ-প্রবণ মন আমার। কী করতে পারে সে? কিছু না। শেষ সময়ে আর সন্দেহ করব না কাউকে।' গলা উঁচু করে ডাকল সে। 'কায়েস! আব্লু!'

ঘর থেকে বেরিয়ে এল ওরা। কাছাকাছি আসতেই জিজ্ঞেস করল আলম, 'চাচাজী কেমন আছেন এখন?'

'জ্ঞান ফিরেছে, কিন্তু শুয়ে থাকতে বলেছি। চোখ বুজে বিশ্রাম নিচ্ছেন।'
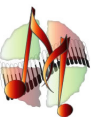
'ঠিক করেছ। এখন নৌকোটা একটু টেনে পানিতে নামাবে তোমরা?' রানার দিকে ফিরল আলম। 'মেজর জেনারেলকে দুই একটা কথা বলতে চাই আমি। একা। দুই মিনিটের বেশি লাগবে না। কিছু মনে করলে না তো, মাসুদ ভাই?'

'না না, কি মনে করব? মনে করার কিছুই নেই, যদি এক্ষুণি আমার দু'একটা প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দাও চটপট,' হাসল রানা। 'এতক্ষণ পর্যন্ত তোমার কার্যকলাপের কোন কৈফিয়ৎ চাইনি। যা খুশি তাই করেছ। তোমার কি মনে হয় না, আমার কৌতূহল নিবৃত্ত না করলে অসুবিধা হতে পারে তোমার? তোমার সব সিদ্ধান্ত আমি সমর্থন না-ও তো করতে পারি? বন্ধু হঠাৎ শত্রু হয়ে যায়, এমন ঘটনা ঘটে না পৃথিবীতে?' পকেট থেকে হাতটা বের করল রানা। ওর হাতে চকচক করছে একটা রিভলভার।

'ওরেব্বাপরে বাপ! এ যে দেখছি আগেই খুন করতে চায়! তুমি যে কত ভয়ঙ্কর লোক সেকথা ভুলেই গিয়েছিলাম, মাসুদ ভাই। দোহাই তোমার, মেরে বোসো না আবার, তাহলে সব ভণ্ডুল হয়ে যাবে। বলছি, সব বলছি। একটু ওদিকে চলো।'

কয়েক কদম সরে গেল ওরা। মৃদু কণ্ঠে এক মিনিট কথা বলল আলম, তারপর দৃঢ় পায়ে চলে গেল মাঝির ঘরের দিকে। হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইল রানা। বোকার মত ফ্যালফ্যাল করে চাইল হাতে ধরা রিভলভারটার দিকে। পকেটে রেখে দিল সে ওটা। ধীর পায়ে ফিরে এল নদীর ধারে। ভ্রু জোড়া কুঁচকানো। বাম হাতে চিমটে ধরেছে নিজের গাল। কালচে দেখাচ্ছে নদীর জল। একদৃষ্টে চেয়ে রইল রানা কালো স্রোতের দিকে। কেমন যেন শূন্যতা অনুভব করছে সে বুকের ভিতর।

নৌকোটা টেনে পানিতে নামিয়ে দিয়ে চলে গেল কায়েস আর আবলু বাড়িটার দিকে। নদীর তীরে দাঁড়িয়ে রইল রানা। একা। সময় ফুরিয়ে আসছে। কি করবে সে? খোদা, বলে দাও, কোনটা করা উচিত। কিন্তু অন্তর থেকে অনুভব করছে সে, যা ঘটতে যাচ্ছে, তার চাইতে ভাল সমাধান আর কিছুই হতে পারে না। কিন্তু তবু এ সমাধানকে স্বীকার করে নিতে চাইছে না মন।

ঠিক তিন মিনিটের মধ্যেই কাঁধের উপর হাত পড়ল। চমকে পিছন ফিরে দেখল, মেজর জেনারেল রাহাত খান দাঁড়িয়ে। হাসছেন ওর দিকে চেয়ে। পরমুহূর্তে ভুল ভাঙল। আলম। পরনে মেজর জেনারেলের পোশাক। দাঁড়ানোর ভঙ্গিটা পর্যন্ত অবিকল নকল করেছে আলম।

'উনি কোথায়?' জানা আছে, তবু বোকার মত প্রশ্ন করল রানা।

'অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছেন রান্নাঘরের মেঝেতে। যাবার সময় কুড়িয়ে নিয়ে যেয়ো। অবশ্য দশ মিনিটের মধ্যেই জ্ঞান ফিরে আসবে। জীবনে এই প্রথম মেজর জেনারেলের আদেশ লঙ্ঘন করলাম—আমার হয়ে তুমি মাফ চেয়ে নিয়ো, মাসুদ ভাই।'

রানাকে পাশ কাটিয়ে ঋজু ভঙ্গিতে হেঁটে নৌকোয় উঠতে যাচ্ছিল আলম, চট



করে ওর হাত ধরল রানা। 'এছাড়া আর কোন উপায় নেই, আলম? চলো না, আমরা দু'জন গিয়ে চেষ্টা করে দেখি লায়লাকে উদ্ধার করা যায় কিনা?'

'অসম্ভব! এখন আর সেটা হয় না, মাসুদ ভাই। দেখো, ট্রাক থেকে বের করা হয়েছে লায়লাকে। এখন কোন রকম কথার খেলাপ করলেই গুলি চালাবে কর্নেল মুজাফফর। যেতেই হচ্ছে আমাকে।'

'কিন্তু এ যে নিশ্চিত মৃত্যু!'

'মৃত্যু? আমি তো মরা মানুষই, মাসুদ ভাই। বছর খানেক আগেই আমাকে প্রায়-মরা বলে ডিক্লেয়ার করে দিয়েছে বড় বড় ডাক্তারেরা। বাঁচবার কোন আশাই নেই। আমি দেখলাম, বেহুদা মারা না গিয়ে কিছু একটা করে মরা উচিত। তাই দয়া করে বেঁচে আছি আজ পর্যন্ত। ভাল মওকা পাওয়া গেছে—এ সুযোগটা আর হাতছাড়া করা উচিত নয়।'

'কিন্তু...'

'এর মধ্যে আর কিন্তু-টিন্তু নেই, মাসুদ ভাই। দেখো, ইচ্ছে করলেই আবলু আর কায়েসের মত তোমাকেও অভিনয় করে বোকা বানিয়ে রেখে যেতে পারতাম। কিন্তু তা করিনি। কারণ, আমি জানি, ওদের মত আবেগপ্রবণ হয়ে আমাকে তুমি বাধা দেয়ার চেষ্টা করবে না। তাছাড়া তোমাকে দুই-একটা কথা বলবার আছে আমার। কিন্তু আগের কথা আগে। আমার মৃত্যুতে দুঃখ করবার কিছুই নেই। আমি বড় জোর আর এক সপ্তাহ বাঁচতাম—না হয় এক সপ্তাহ আগেই গেলাম। মেজর জেনারেল রাহাত খানও থাকলেন, লায়লাও থাকল, যে এমনিতেই যেত সে-ই কেবল গেল। যাবার সময় একটা কঠিন সমস্যার সহজ সমাধান করে দিয়ে গেল। বোঝা গেছে?'

কোন কথা বেরোল না রানার মুখ দিয়ে। স্তব্ধ হয়ে চেয়ে রয়েছে সে নদীর কালো স্রোতের দিকে। ওর কাঁধের উপর একটা হাত রাখল আলম।

'মাসুদ ভাই, কি এত ভাবছ? ভাবনা চিন্তার ভারটা যোগ্য লোকের উপর ছেড়ে দাও। ওসব তোমার কর্ম নয়।' হাসল আলম। 'আমার যে তীক্ষ্ণ বুদ্ধির অকুণ্ঠ প্রশংসা করছিলে আজ দুপুরে, বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা আসতেই কি সেই বুদ্ধি ভোঁতা হয়ে গেল? ভেবে দেখো, আমাকে বাধা দেয়ার কোন অধিকার নেই তোমার।'

'সত্যিই। কোন অধিকার নেই। যোগ্যতাও নেই।' করুণ শোনাল রানার উদাস কণ্ঠস্বর। 'বেশ, যাচ্ছ, যাও।'

'এই তো বুঝেছ। ভেরি গুড বয়।' একগাল হাসল আলম। 'আসলে আমার কিন্তু রীতিমত আনন্দ হচ্ছে মাসুদ ভাই। জন্তু-জানোয়ারের মত উদ্দেশ্যহীন মৃত্যু হচ্ছে না আমার। আমি মরছি লায়লার জন্যে। ওর জন্যে মরবার সুযোগ পেয়ে ধন্য হয়ে গেছি আসলে আমি।' একটু চুপ করে থেকে বলল, 'ও. কে., মাই ফ্রেণ্ড। প্রচুর ভেবেো ভাববার বয়স ও সময় আছে তোমার। যতদিন না পটল তোলার সময় হয়,
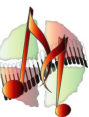
ভাজতে থাকো। আমার ডাক এসে গেছে। আমি চললাম।'

নৌকোয় উঠে বসল আলম। চিৎকার করে সিগন্যাল দিল কর্নেলকে। তারপর রশি বহে টান দিল।

'দুই-একটা কথা কি বলবার ছিল তোমার?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'ওহ্-হো! আসল কথাটা না বলেই চলে যাচ্ছিলাম।' হাত পাঁচেক গিয়ে থামল আলম। 'দুটো জিনিস সবচেয়ে প্রিয় ছিল আমার কাছে। গুড্‌ডু, আর লায়লা। দু'জনকেই বশ করেছ তুমি, মাসুদ ভাই। ওদের ভার তোমাকেই দিয়ে গেলাম।'

শিস দিতে দিতে চলে গেল আলম রশি টেনে টেনে। আবছা ছায়ামূর্তিটার দিকে চেয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলল রানা। কেমন যেন চু-চু করছে বুকের ভিতরটা।

পাথর বিছানো পাড় বেয়ে উঠে এল রানা উপরে। চলল কুঠুরির দিকে। দরজা দিয়ে মুখ বাড়ালেন ব্রিগেডিয়ার জামান। রানাকে দেখে বললেন, 'কি ব্যাপার, রানা? মেজর জেনারেল রান্নাঘরের মেঝেতে শুয়ে কেন? বাইরে চিৎকার করল কে?'

'চিৎকার করেছে আলম। লায়লাকে নদীর দিকে এগোতে দেবার সংকেত। ছাড়া পেয়ে লায়লা এগিয়ে আসছে এদিকে, আর মেজর জেনারেল যাবেন এদিক থেকে ওদিকে।'

'কিন্তু উনি তো ঘুমাচ্ছেন…'

'অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছেন। আলম চলে গেছে ওঁকে অজ্ঞান করে রান্নাঘরে ফেলে রেখে ওঁর কোট পরে ওঁর বদলে।'

'কি বললে?' চমকে উঠলেন ব্রিগেডিয়ার। পরমুহূর্তেই সব পরিষ্কার বুঝতে পারলেন। রানার পিছু পিছু এসে দাঁড়ালেন রান্নাঘরের সামনে। মেজর জেনারেল উঠে বসবার চেষ্টা করছেন। হাত ধরে সাহায্য করল রানা।

'আলম কোথায়? আমার কোট?' উঠে দাঁড়ালেন বৃদ্ধ।

একটা চেয়ারের হাতা থেকে আলমের কোটটা তুলে এগিয়ে দিল রানা। 'এই কোটটা পরে নিন স্যার, আপনারটা আলম ধার নিয়েছে।'

'ধার নিয়েছে!' অবাক হয়ে গেলেন মেজর জেনারেল। 'কিন্তু হ্যাণ্ড গ্রেনেড? আমাকে বলেছিল গ্রেনেড দুটো ছুঁড়ে মারতে হবে ট্রাকের ওপর। ওগুলো কোথায় গেল? কিছুই তো বুঝতে পারছি না আমি, রানা!'

রানা বুঝল, দূরদর্শী আলম ওদের নিরাপত্তার কথাও চিন্তা করেছে যাবার আগে। বর্ডারে পৌঁছবার আগেই যাতে ওদের পিকাপকে কর্নেল ট্রাক নিয়ে তাড়া না করতে পারে, সেজন্য গ্রেনেড নিয়ে গেছে সাথে করে। অকেজো করে দেবে ওদের ট্রাক। দু'এক কথায় বুঝিয়ে দিল রানা।

বেরিয়ে এল ওরা বাইরে। ওপারে পৌঁছে গেছে নৌকোটা। আবছা মত দেখা যাচ্ছে লায়লাকে। ধীর পায়ে এগিয়ে আসছে নদীর দিকে। কিন্তু এত ধীরে হাঁটছে



কেন সে? যেন রাজ্যের দ্বিধা আর দ্বন্দ্ব নিয়ে এগোচ্ছে লায়লা অনিশ্চিত পদক্ষেপে
অনেকটা কাছে না আসা পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকল আলম লায়লার জন্যে। পিছন ফিরে
একবার হাত নাড়ল এদের দিকে। তারপর ধীরে ধীরে এগোল।

লায়লার পাশ দিয়ে এগোতে গিয়েও থমকে দাঁড়াল আলম। খুব সম্ভব চি
ফেলেছে ওকে লায়লা। কি যেন কথা হলো ওদের মধ্যে। দু'জনই দাঁড়িয়ে পড়েছে
যে কোন মুহূর্তে গুলি ছুঁড়তে পারে এখন সৈন্যরা। এগোচ্ছে না কেন!

চলতে শুরু করল আবার আলম। কিন্তু থমকে দাঁড়িয়ে আছে লায়লা। প্রমা
গুনল রানা।

ঝপাং করে লাফিয়ে পড়ল কায়েস নদীতে। বিপদটা টের পেয়েছে সে
টর্পেডোর মত এগিয়ে যাচ্ছে সে পানিতে একরাশ ফেনা তুলে।

নদীর তীরে এসে দাঁড়াল রানা, মেজর জেনারেল, আর ব্রিগেডিয়ার জামান
কায়েস আলী পৌঁছে গেছে ওপারে। তিন লাফে উঠে গেল ঢালু পাড় বেয়ে
লায়লার কাছাকাছি চলে গেছে সে। কিন্তু চমকে গিয়ে থমকে দাঁড়াল কেন? কি যে
বলছে সে লায়লাকে।

ঠিক এমনি সময় ফাটল প্রথম গ্রেনেডটা। বিস্ফোরণের প্রতিধ্বনি মিলিয়ে যাবা
আগেই শোনা গেল দ্বিতীয় গ্রেনেডের শব্দ। পাঁচ সেকেণ্ড চুপচাপ। তারপরই কা
এল কয়েকজনের মরণ চিৎকার। সেই সাথে ভেসে এল এল্. এম. জি.র তীক্ষ্ণ কর্ক
শব্দ। একটানা সাত সেকেণ্ড চলল মেশিনগান। থেমে গেল। সব চুপ।

রানা আশা করেছিল, আর্তনাদ শুনতে পাবে। গান দুটো কুঁচকে অপেক্ষা কর
সে আলমের অন্তিম চিৎকারের। কিন্তু কিছুই শোনা গেল না। নিস্তব্ধ চারদিক
অন্ধকারে ব্রিগেডিয়ারের মুখের ভাব বোঝা গেল না, বিড় বিড় করে একটা সু
পড়ছেন উনি। শেষে বললেন, 'ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন!'

মারা গেল মহৎপ্রাণ শামসুল আলম।

লায়লাকে খেলনা পুতুলের মত তুলে নিল কায়েস আলী। ছুটে চলে আসছে
নদীর পারে। পিছন ফিরেই আবলুকে দেখতে পেল রানা। 'বিপদ হতে পারে
আবলু। তুমি গিয়ে ওই ঘরের জানালায় রেডি থাকো রাইফেল নিয়ে। কায়ে
নৌকোয় না ওঠা পর্যন্ত গুলি ছুঁড়ো না…'

কথা শেষ হবার আগেই অদৃশ্য হয়ে গেছে আবলু। রানা দেখল, তীরে পৌঁছ
কায়েস আলীর আরও ত্রিশ গজ বাকি আছে,…পঁচিশ,…বিশ,…তাও গুলি ছুঁড়ছে
কেউ ওদিক থেকে।

এমন সময় কয়েকজন লোকের চিৎকার শোনা গেল। কেউ আদেশ করল তী
কণ্ঠে। আরম্ভ হলো ফায়ারিং। একটা এল. এম. জি. আর তিনটে চায়নি
অটোমেটিক। রানার কানের পাশ দিয়ে বাতাসে গুঞ্জন তুলে চলে গেল একটা গুলি
সবাই শুয়ে পড়ল মাটিতে। মাথার উপর দিয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে যেতে থাকল গুলি
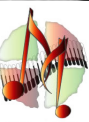
একটু অবাক হলো রানা, কেবল তিন চারজন গুলি ছুঁড়ছে কেন? আর সবাই গেল কোথায়? মারা পড়ল ট্রাকের মধ্যে?

তীরে এসে গেছে কায়েস আলী। দুই লাফে নেমে এল পাড় বেয়ে। সাথে সাথেই গুলি আরম্ভ করল আবলু। তিনটে গুলির পরই থেমে গেল মেশিনগান। অন্ধকারে দেখা যাচ্ছে না শত্রুকে, কিন্তু আগ্নেয়াস্ত্রের মুখ থেকে যে সামান্য আগুনের ফুলকি দেখা যাচ্ছে সেটাই আবলুর পক্ষে যথেষ্ট। আরও চারটে গুলি করল আবলু। নীরব হয়ে গেল দুটো চায়নিজ অটোমেটিক। একটা তীক্ষ্ণ আর্তনাদ ভেসে এল ওপার থেকে।

হঠাৎ হিশশ করে একটা শব্দ হলো, পর মুহূর্তে ফট শব্দ তুলে ফাটল একটা ম্যাগনেশিয়াম ফ্লেয়ার ঠিক ওদের মাথা থেকে একশো ফুট উপরে। ধীরে ধীরে নামছে নিচে। পিস্তল থেকে ছোঁড়া হয়েছে ফ্লেয়ারটা। উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত হয়ে গেল চারপাশ। সঙ্গে সঙ্গে ওপার থেকে একটা মেশিনগান এবং কয়েকটা রাইফেল গর্জে উঠল আবার একসাথে। গাছের আড়াল থেকে গুলি ছুঁড়ছে, কিন্তু অনেকটা দক্ষিণে সরে গেছে ওরা এখন।

নৌকোয় উঠে পড়েছে কায়েস আলী। রশি ধরে টানছে প্রাণপণে। ওর শক্তিশালী হাতের জোর-টানে দু'পাশে উঁচু ঢেউ তুলে স্পীড বোটের মত ছুটে আসছে নৌকোটা। ফতুয়া কেবল মাথা নিচু করে রেখেছে ওরা।

'আলোটা নিভিয়ে দাও! আবলু!' চিৎকার করে বলল রানা। বুকে হেঁটে নেমে গেল পাড় বেয়ে পানির ধারে। নৌকোটা টেনে তুলতে হবে ডাঙায়।

পৌঁছে গেল নৌকো। কিন্তু কোথায় লায়লা? বিস্মিত দৃষ্টি মেলে দেখল রানা নৌকোয় বসে আছে সম্পূর্ণ অপরিচিত এক অল্প বয়সী মেয়ে। এমনি সময় দপ করে নিভে গেল উজ্জ্বল আলোটা যেমন হঠাৎ জ্বলে উঠেছিল, তেমনি হঠাৎ। অসতর্ক হয়ে পড়ায় হাঁটুতে গলুইয়ের বাড়ি লেগে পড়ে গেল রানা পাথরের উপর। বহু কষ্টে উঠে দাঁড়িয়ে সাহায্য করল সে কায়েস আলীকে নৌকোটা টেনে ডাঙায় তুলতে।

অন্ধকার হয়ে গেলেও ওপার থেকে থামল না গুলিবর্ষণ। অন্ধকারে কিছুই দেখতে পাচ্ছে না ওরা, স্মৃতির উপর নির্ভর করে গুলি চালাচ্ছে। আশপাশ দিয়ে ছুটে চলে যাচ্ছে বুলেটগুলো।

হাত ধরে নামাল মেয়েটাকে রানা নৌকো থেকে। বলল, 'কে তুমি? লায়লা কোথায়?'

'আমি দিলারা। বাঙালী। আজ দুপুরে জাসার আর্মি ক্যাম্প থেকে তুলে এনেছে আমাকে। লায়লা আমানকে পাঠিয়ে দিয়েছে গুজরানওয়ালা ক্যাম্পে।'

ধক করে উঠল রানার বুকের ভিতরটা। কার জন্যে প্রাণ দিল তাহলে আলম? ধিকি-ধিকি জ্বলছে কলজেটা। সারা শরীরের সমস্ত রক্ত উঠে আসতে চাইছে মাথায়।

নদীর পাড়ে ওঠার জন্যে এক পা বাড়িয়েই পড়ে গেল রানা। হাঁটুতে গলুইয়ের



আঘাত লেগে অবশ হয়ে গিয়েছিল পা। রশিটা ধরে ফেলল একহাতে। কায়েসের সাহায্যে পাড়ে উঠে গেল দিলারা, কয়েকটা পায়ের শব্দ শোনা গেল, ছুটে চলে গেল সবাই কুঠুরিটার দিকে।

নদীর তীরে পড়ে রইল রানা। তাহলে শেষ পর্যন্ত ঠকাল কর্নেল মুজাফফর। অবশ্য নিজেও ঠকেছে। কিন্তু মাঝখান থেকে প্রাণ দিতে হলো আলমকে। কিন্তু···সত্যিই কি লায়লা গুজরানওয়ালায়? নাকি মেরে ফেলেছে? ওপারেই ট্রাকের ভেতর নেই তো! হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ল। ট্রাক দুটো যদি অকেজো হয়ে গিয়ে থাকে তবে বেশিদূর নড়াচড়া সম্ভব হবে না এখন কর্নেল মুজাফফরের পক্ষে। অন্তত আজকের রাতটা থাকতেই হবে ওদের নদীর পাড়ে। সে কি যাবে একবার লায়লাকে খুঁজতে? কানের কাছে অস্পষ্ট 'ঘ্যাঃ-ঘ্যাঃ' শব্দ শুনে হাত বাড়িয়ে আদর করল রানা গুণ্ডাকে।

অল্পক্ষণেই ব্যথাটা কমে গেল, উঠে এল সে উপরে। কোটের আস্তীনে টান লাগল ওর। একটা বুলেট আস্তীন ফুটো করে বেরিয়ে গেছে। দ্রুত পায়ে চলে এল সে বাড়ির মধ্যে। ধাক্কা খেল আবলুর সাথে।

'তুমি জানালা থেকে সরে এলে কেন, আবলু?'

'আর দরকার নেই।' দুই কান পর্যন্ত বিস্তৃত হাসি হাসল আবলু। 'ফায়ারিং বন্ধ করে দিয়েছে ব্যাটারা। জঙ্গলের মধ্যে ওদের কথাবার্তা শুনতে পেয়েছি। ভাগবার তাল করছে এখন। মোট ছ'টাকে খতম করেছি মাসুদ ভাই। মাঝের দুটো ফ্লেয়ারের আলোতে পরিষ্কার দেখতে পেয়েছি। আপনি আলোটা নেভাতে না বললে আরও অন্তত চারটাকে ব্যাগে পুরতাম।'

'তা তুমি পারতে। দারুণ তোমার হাতের টিপ। কিন্তু আলোটা ঠিক সময় মত না নেভালে আমরা সব ক'টা ওদের ব্যাগে চলে যেতাম। ওয়েল ডান, ইয়াং ম্যান। আজ সবার প্রাণ বাঁচিয়েছ তুমি।' আবলুর কাঁধের উপর দুটো চাপড় দিল রানা। খুশিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল আবলুর মুখ। পরমুহূর্তে কালো হয়ে গেল মুখটা।

'লায়লা আপা···'

'কিচ্ছু ভেব না। তুমি আর আমি বেঁচে থাকতে কারও সাধ্য নেই ওর কোন ক্ষতি করে।' জেনে শুনেই মিথ্যে আশ্বাস দিল রানা।

ঘরে ঢুকল রানা। মেয়েটাকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে সবাই। সব শুনে সবাই গম্ভীর। মেয়েটা বলছে, 'আমি সত্যিই দুঃখিত···'

রানা বুঝল, অস্বস্তি বোধ করছে মেয়েটা। বুঝতে পারছে, লায়লাকে আশা করেছিল সবাই, তার বদলে ওকে পেয়ে নিরাশ হয়েছে। নিজেকে এদের কাছে অবাঞ্ছিত, অপ্রয়োজনীয়, বিরক্তিকর মনে হচ্ছে ওর কাছে। বুঝতে পারছে ওর উপস্থিতিটা বেখাপ্পা, বেমানান। কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল রানা, কথা বলে উঠলেন ব্রিগেডিয়ার।
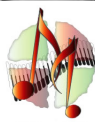
'শোনো, মা দিলারা: তোমার সঙ্কুচিত হওয়ার কিছু নেই। লায়লার মতই তুমিও আমার মেয়ে। তুমি যে ওদের হাত থেকে ছুটে আসতে পেরেছ সেটাও কম আনন্দের কথা নয়। তুমি অবাঞ্ছিতা হলে আলম, মানে নদীর ওপারে যার সাথে দেখা হয়েছিল তোমার, সামনে এগিয়ে যেত না। ও নিজের প্রাণ দিচ্ছে যাচ্ছিল লায়লার প্রাণের বিনিময়ে। কিন্তু যখন দেখল তুমি লায়লা নও, তক্ষুণি ফিরে না এসে এগিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল কেন ও? তার মানে, তোমার বিনিময়েও প্রাণ দেয়াটা সার্থক মনে করেছে সে। তাছাড়া এই যে কায়েস আলী, এ-ও তোমাকে চিনতে পারল, তবু নিজের জীবন বিপন্ন করে তোমাকে নিয়ে এল কেন এপারে? তুমি অবাঞ্ছিতা নও, তুমি বাঙালী মেয়ে, আমাদের মেয়ে। বসো, মা, বসো তুমি ওই চেয়ারটায়।'

কথাগুলো এত সুন্দরভাবে আবেগপূর্ণ গলায় বললেন ব্রিগেডিয়ার যে ওর মনের প্রসারতা বড় করে দিল সবার মন। একটা কেরোসিনের হ্যারিকেন জ্বলছে ঘরের এক কোণে। চেয়ারে বসল দিলারা, খাটের উপর বসলেন মেজর জেনারেল গম্ভীর মুখে।

'আপনিই ওর চাচা? মানে, আলম সাহেবের?' জিজ্ঞেস করল মেয়েটি ব্রিগেডিয়ারকে।

'হ্যাঁ। কেন?'

'উনি যাবার সময় আপনাকে বলতে বলেছেন: অনেক অন্যায় অত্যাচার করেছেন উনি আপনার ওপর সারাজীবন—যেন মাফ করে দেন।'

বাঘের চোখ দুটো ভিজে গেল এই কথা শুনে। চুপ করে থাকলেন খানিকক্ষণ, তারপর ধরা গলায় বললেন, 'বিশ বছর আগে মরার সময় আমার হাতে তুলে দিয়েছিল ওকে ওর বাপ—ধরে রাখতে পারলাম না...'

অনেকক্ষণ ধরে রানার বুকের মধ্যে থেকে থেকে গর্জন করে উঠছিল একটা ক্রুদ্ধ বাঘ। এবার হঠাৎ পৃথিবী কাঁপিয়ে হুঙ্কার দিয়ে উঠল। মনস্থির করে ফেলেছে সে। ওর কর্তব্যটুকু করতেই হবে ওকে।

'কায়েস আলী, পিকাপটা নিয়ে আসবে তুমি এখানে?'

'যাই, স্যার।' বেরিয়ে গেল কায়েস আলী ধীর পায়ে। ভেজা জামা কাপড় থেকে এখনও জল পড়ছে টপ-টপ।

আবলুকে আড়ালে ডেকে বলল রানা, 'তুমি চারদিকে নজর রেখো, আবলু। আমি আসছি কিছুক্ষণের মধ্যেই।'

বেরিয়ে এল রানা ঘর থেকে। ঠেলে নামাল নৌকোটাকে পানিতে। এক লাফে নৌকোয় উঠে এল আলমের প্রিয় ব্লাড হাউণ্ডের বাচ্চা—গুণা।



# তেইশ

প্রতিশোধ!

দাউ দাউ করে জ্বলছে রানার বুকের মধ্যে প্রতিশোধের আগুন। হত্যার নেশা পেয়ে বসেছে ওকে। আলমের হত্যার প্রতিশোধ নেবে সে। পারলে ঠেকাও, কর্নেল মুজাফফর।

ওপারে পৌঁছে সাবধানে উঠে এল রানা পাড় বেয়ে। সতর্ক দৃষ্টিতে চাইল সামনের দিকে। জীবনের কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। আবছা চাঁদের আলোয় কি দেখতে পাবে ওকে ওরা? সামনের দুশো গজ কি বুকে হেঁটে যাবে, না দৌড় দেবে? দ্রুততার প্রয়োজন আছে।

প্রাণপণে ছুটল রানা খোলা মাঠ দিয়ে জঙ্গলের দিকে। গুণাও ছুটল পিছন পিছন। ও মনে করেছে: খেলা হচ্ছে।

একটি বুলেটও বাধা দিল না ওদের। জঙ্গলে পৌঁছে দম নিল রানা কিছুক্ষণ। ট্রাক দুটো দাঁড়িয়ে রাস্তার শেষ মাথায়। শিকারী শার্দূলের মত নিঃশব্দে এগোল রানা গাছের আড়ালে আড়ালে।

তিন মিনিটে এসে দাঁড়াল রানা ট্রাক দুটোর কাছে। কোন সাড়াশব্দ নেই। সৈন্যদের কথাবার্তা, মৃদু গুঞ্জন, কিছু না। আশে পাশে তাঁবুও দেখা যাচ্ছে না। তিরপল ঢাকা ট্রাকের পিছন দিকটাও ঢাকা। বাইরে কাউকে দেখা গেল না কোথাও। গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে কর্নেলের মত ট্রাকের দিকে এগোচ্ছিল রানা, হঠাৎ বরফের মত জমে গেল। ট্রাকের পিছন থেকে স্টেনগান হাতে একজন গার্ড বেরিয়ে এল। সোজা হেঁটে আসছে ওর দিকে।

এক নজর চেয়েই রানা বুঝল, ওর উপস্থিতি টের পায়নি লোকটা—কারণ তাহলে স্টেনগানটা ওভাবে ঝুলিয়ে রাখত না বগলে চেপে। একহাতে জ্বলন্ত সিগারেট ধরা। নিশ্চিন্ত হলো রানা। কোন রকম সন্দেহ করেনি গার্ড, হাঁটাহাঁটি করে পায়ের ঝিঁঝি দূর করার চেষ্টা করছে মাত্র। রানার পাঁচ ফুট দূর দিয়ে চলে যাচ্ছে লোকটা, এক হাতে প্যান্টের বোতাম খুলছে। অর্থাৎ প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে চলেছে। চিতাবাঘের মত এগিয়ে গেল রানা।

লোকটা যখন টের পেল, তখন দেরি হয়ে গেছে। আঙুলগুলো সোজা রেখে সর্বশক্তি দিয়ে কারাতের কোপ মারল সে লোকটার ঘাড়ের উপর। মুখটা হাঁ হয়ে থাকল, আওয়াজ বেরোল না কোন, নিঃশব্দে ঢলে পড়ল সে মাটিতে। স্টেনটা মাটিতে পড়বার আগেই ধরে ফেলল রানা। লম্বা পা ফেলে এগিয়ে গেল সে ট্রাকের

কাছে। বিশ ফুট দূর থেকেই দেখতে পেল, এঞ্জিনটা বিধ্বস্ত হয়ে গেছে আলমের হ্যাণ্ড গ্রেনেডের বিস্ফোরণে। কর্নেলের ট্রাকের দিকে এগোতে গিয়েই হোঁচট খেল রানা।

একটা মৃতদেহ পড়ে আছে মাটিতে। এক নজরেই চিনতে পারল রানা। আলম। চিৎ হয়ে পড়ে আছে সে। হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল রানা মৃতদেহটার পাশে। মেশিনগানের গুলিতে সারাটা বুক জুড়ে অসংখ্য ছিদ্র হয়ে গেছে মেজর জেনারেলের কোটটা। কুকুরের মত গুলি করে মেরেছে ওরা আলমকে। স্থির, ঠাণ্ডা, মরা মুখটার দিকে চেয়ে থেকে বুকটা টনটন করে উঠল রানার। গন্ধ শুঁকে এগিয়ে এল গুণ্ডা লেজ নাড়তে নাড়তে। আলমের গায়ের গন্ধ চিনতে পেরে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছে সে। কিন্তু ঠিক দুই হাত তফাতে থমকে দাঁড়াল সে। সহজাত প্রবৃত্তির বলে টের পেয়েছে সে মৃত্যু। ভয় পেল সে, পিছিয়ে গেল দুই পা। নাকটা আকাশের দিকে তুলে কি যেন শুঁকছে সে। এবার মাথাটা নামিয়ে 'কুঁই কুঁই' করে কাঁদল কয়েক সেকেণ্ড। তারপর যেন ভুলে গেল সব দুঃখ—মৃতদেহটা একপাক ঘুরে চলে গেল সে জঙ্গলের দিকে।

আলমের পকেট থেকে রক্তে ভেজা একটা রুমাল বের করে ঢেকে দিল রানা ওর মুখ। রুমালের সাথে বেরিয়ে এল পকেট থেকে মেজর দেলওয়ার খানের আইডেন্টিটি কার্ড, আর সেই ফ্যামিলি ফটোগ্রাফটা। ওগুলো কুড়িয়ে নিজের পকেটে রাখল রানা। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে এগোল বড় ট্রাকটার দিকে—কর্নেল মুজাফ্ফরের ট্রাক-কাম-অফিস।

একটা চেয়ারে বসে আছে কর্নেল রানার দিকে পিছন ফিরে। সামনে টেবিলের উপর ওয়্যারলেস ট্রান্সমিটার। একটা হাতল কয়েক পাক ঘুরিয়ে বাম হাতে রিসিভার তুলল সে কানে। রানা বুঝল, ওটা ওয়্যারলেস ট্রান্সমিটার নয়, ওটা রেডিও টেলিফোন। নিশ্চয়ই শেষ চেষ্টা হিসেবে এয়ার ফোর্সকে ডাকার চেষ্টা করছে কর্নেল মুজাফ্ফর। আজ আর মেঘ নেই আকাশে। পিকাপে করে দশ মাইল রাস্তা যেতে হবে ওদের রাভী পেরিয়ে ভারতীয় এলাকায় পৌঁছতে হলে। নিশ্চয়ই হেড লাইট জ্বালাতে হবে। তাহলে এদের খুঁজে বের করতে অসুবিধে নেই। পিকাপ যখন, রাস্তার উপর দিয়েই চলতে হবে ওটাকে।

কানে রিসিভার থাকায় রানার প্রবেশ টের পেল না কর্নেল। দরজাটা বন্ধ করে এগিয়ে এল রানা নিঃশব্দ পায়ে। কথা বলতে আরম্ভ করেছে কর্নেল, ঠিক এমনি সময় স্টেনগানের ব্যারেলের আঘাতে পড়ে গেল রিসিভারটা ওর হাত থেকে। দুই টুকরো হয়ে গেছে।

স্তম্ভিত হয়ে গেল কর্নেল মুজাফ্ফর এই আকস্মিক আক্রমণে। কিন্তু সে কেবল দুই সেকেণ্ডের জন্যে, তারপরেই সাঁ করে রিভলভিং চেয়ার ঘুরিয়ে ফিরল সে রানার দিকে। ততক্ষণে দুই পা পিছিয়ে গেছে রানা। স্টেনগানের মুখটা কর্নেলের বুক লক্ষ্য করে ধরা। ভয়ে বিবর্ণ হয়ে গেল কর্নেল মুজাফ্ফরের মুখ। কি যেন বলবার চেষ্টা



করল, কিন্তু ঠোঁট নড়ল কেবল, আওয়াজ বেরোল না গলা দিয়ে। হঠাৎ রানার এই আবির্ভাবের কারণ কি, পরিষ্কার বুঝে নিয়েছে সে। বার কয়েক ঢোক গিলবার চেষ্টা করল—কিন্তু জিভও শুকিয়ে গেছে। বিস্ফারিত নেত্রে চেয়ে রইল সে রানার মুখের দিকে।

'অবাক লাগছে, কর্নেল মুজাফ্ফর?'

'তুমি খুন করতে এসেছ আমাকে!' রানার চোখে রক্ত পিপাসা দেখতে পেয়েছে সে স্পষ্ট। গলাটা শুকিয়ে যাওয়ায় আরও খনখনে শোনাল ওর কণ্ঠস্বর।

'খুন করতে?' মৃদু হাসল রানা। 'না। আমি তোমাকে শাস্তি দিতে এসেছি। একে খুন বলে না। মেজর দেলওয়ারকে তোমরা যা করেছ সেটাকে বলে খুন। উঠে দাঁড়াও মুজাফ্ফর।'

উঠে দাঁড়াল কর্নেল। আরও দুই পা পিছিয়ে গেল রানা।

'হাজার হাজার নিরীহ নিরপরাধ বাঙালী যুবককে চরম নির্যাতন করে নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করার অপরাধে মৃত্যু ঘটবে তোমার। তোমার চোখে আজ যে মৃত্যুভয় দেখছি আমি, তুমি তেমনি দেখেছ নির্যাতন-ক্লিষ্ট হাজার হাজার বাঙালী যুবকের চোখে। এখন মায়া হচ্ছে নিজের প্রাণের ওপর—হাজার হাজার মুক্তিযোদ্ধার কাঁচা তাজা প্রাণ নষ্ট করবার সময় একবারও মনে হয়নি, নিজের মৃত্যু সনদ নিজেই লিখছ তুমি ওদের তাজা রক্তে?'

'আমি আমার দেশের কাজ করেছি, মিস্টার শরাফ আলী।' কথা বলে দেরি করাতে চায় কর্নেল। রানা বুঝল। কিন্তু দেরি করতে রানার আপত্তি নেই।

'আমার নাম শরাফ আলী নয়। মৃত্যুকালে তোমার হত্যাকারীর সঠিক নাম জানার অধিকার তোমার আছে। আমার নাম মাসুদ রানা।'

'পাকিস্তান কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের?' নীল দুই চোখ কপালে উঠল কর্নেলের।

'হ্যাঁ। প্রাক্তন পি. সি. আই.। আমার পরিচয় জানা আছে তোমার। প্রয়োজন হলে কতখানি নিষ্ঠুর হতে পারি তাও নিশ্চয়ই জানা আছে। এবার আমার কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর দাও। লায়লা কোথায়?'

উত্তর দিল না কর্নেল। আতঙ্কিত দৃষ্টিতে চেয়ে রইল রানার মুখের দিকে।

'লায়লা কোথায়?'

'উত্তর দেব না।'

'তিন পর্যন্ত গুনব। তারপর হাতে গুলি করব। তারপর পায়ে। কষ্ট পেয়ে মরবে। এক···দুই··· তিন!' গুড়ুম!

বাম হাতের কব্জির ঠিক চার আঙুল উপরে লাগল গুলি। মুহূর্তে ঝুলে পড়ল হাতটা। ব্যথায় কুঁচকে গেল কর্নেলের মুখ। কিন্তু দাঁড়িয়ে রইল তেমনি। একবার হাতটার দিকে চাইল না পর্যন্ত। নীল দুই চোখে তীব্র বিদ্বেষ।

'লায়লা কোথায়?'

'উত্তর দেব না।'

'তিন পর্যন্ত গুণব। তারপর গুলি করব বাম পায়ে। এক—দুই—'

ধূর্ত মুজাফফর হয়তো আশা করল, গুলির আওয়াজ পেলে সাহায্যের জন্যে এগিয়ে আসবে বাইরের গার্ড। কাজেই দেরি করানোই স্থির করল। বলল, 'ওকে খরচের খাতায় লিখে রাখো। ওর কথা জেনে কোন লাভ হবে না।'

'নায়লা কোথায়?'

'গুজরানওয়ালা ক্যাম্পে। আখনুর সেক্টর পরিদর্শন করতে গিয়েছিলেন জেনারেল টিক্কা খান। সেখানকার সৈন্যদের বীরত্বের পুরস্কার হিসেবে সাড়ে তিনশো সৈন্য ও অফিসারকে নিয়ে তিনি আসছেন গুজরানওয়ালায় রাত্রি যাপনের জন্যে।' দরজার দিকে চাইল কর্নেল একবার আড় চোখে। 'কিন্তু জেনারেল টিক্কা খানকে উপহার দেয়ার মত তেমন সুন্দরী বাঙালী মেয়ে ছিল না গুজরানওয়ালা ক্যাম্পে। তাই পাঠাতে হলো ব্রিগেডিয়ার জামানের মেয়েকে। হাজার হোক, জেনারেল টিক্কা তো আর যার-তার ঘরে যেতে পারেন না। নায়লার ঘরে আসছেন তিনি রাত সাড়ে-আটটা-ন'টা নাগাদ।' বিদ্বেষের সাথে সাথে একটা জয়ের ভাব প্রকাশ পেল কর্নেলের দৃষ্টিতে। 'কিছুই করবার নেই তোমার মাসুদ রানা। ওখান থেকে নায়লাকে উদ্ধার করার সাধ্য কারও নেই। তোমার বাপেরও ক্ষমতা হবে না ওই ক্যাম্পে ঢোকার।'

বিশ সেকেণ্ড চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল রানা। বুঝল মিথ্যে বলছে না কর্নেল। আর কিছুই জানবার নেই এর কাছে।

'আর একটা কথা,' বলল রানা। 'তোমার ধারণা, বাঙালীদের ওপর অত্যাচার করে তুমি দেশের কাজ করেছ। দেশ বলতে সমগ্র পাকিস্তানকে ধরার কথা ছিল, তা না করে দেশ বলতে তুমি বুঝেছিলে পশ্চিম পাঞ্জাব। একেই বলে দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা। তুমি বিশ্বাসঘাতক। যুদ্ধাপরাধী। সেইজন্যেই শাস্তি পেতে হচ্ছে তোমাকে। ঘুরে দাঁড়াও কর্নেল মুজাফফর।'

আতঙ্কিত দৃষ্টিতে একবার রানার চোখের দিকে, একবার স্টেনগানটার দিকে চেয়ে ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়াচ্ছিল কর্নেল, হঠাৎ ডান হাতটা দ্রুত চলে গেল ওর ওয়েস্ট ব্যাণ্ডের হোলস্টারের কাছে, পরমুহূর্তে পিছনে না ফিরেই, রিভলভারটা হোলস্টার থেকে বের না করেই ট্রিগার টিপে দিল সে রিভলভারের মুখ রানার দিকে ফিরিয়ে।

'বুম!'

রানার ডান চোখের কিনার থেকে নিয়ে কানের পিছন পর্যন্ত জ্বালা করে উঠল। বুলেটের আঁচড়ে চামড়া ছড়ে গেছে। আর একটু বাঁ দিক দিয়ে গেলেই ওর মৃতদেহের মুখে লাথি মেরে বিজয়ীর হাসি হাসতে পারত কর্নেল মুজাফফর। কিন্তু সে সুযোগ হলো না। সামান্য একটু টলে উঠল রানা, পরমুহূর্তেই টিপে দিল ট্রিগার



অটোতে দিয়ে। যতক্ষণ পর্যন্ত স্টেনগানের ম্যাগাজিনটা সম্পূর্ণ খালি না হলো, থামল না রানা। ঝাঁঝরা হয়ে গেল কর্নেলের সারাটা পিঠ। হুমড়ি খেয়ে পড়ল রিভলভিং চেয়ারের উপর। ধোঁয়ায় ভরে গেল ট্রাকের অভ্যন্তর। তীব্র করডাইটের গন্ধ। ধোঁয়ার ফাঁক দিয়ে দেখল রানা চেয়ারের উপর উপুড় হয়ে পড়ে অল্প অল্প দুলছে কর্নেল মুজাফফরের প্রাণহীন দেহটা।

দরজা খুলে বেরিয়ে এল রানা বাইরে। রিভলভার হাতে। কিন্তু কেউ এগিয়ে আসছে না কেন? শুনতে পায়নি গুলির আওয়াজ? পাশের ট্রাক থেকেও সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না কেন? গেল কোথায় ওরা?

হঠাৎ বুঝতে পারল রানা এই নীরবতার কারণ। ছুটে গিয়ে তিরপল তুলল। দেখল, সত্যিই, একটি জীবিত প্রাণী নেই ট্রাকের মধ্যে। সার দিয়ে শোয়ানো আছে আট-দশটা লাশ।

ব্যাপারটা বুঝতে পেরেই বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল রানার। সর্বনাশ হয়ে গেছে। ছি, ছি! এমন ভুলটা করতে পারল সে! প্রতিভাবান আলমের উপর নির্ভর করতে করতে কি বুদ্ধিটা ভোঁতা হয়ে গেল? আগেই তো বোঝা উচিত ছিল ওর।

ওরা দক্ষিণ দিকে সরে গিয়েছিল অনেকক্ষণ আগেই। এতক্ষণে নিশ্চয়ই অগভীর নদীটা পার হয়ে পৌঁছে গেছে মাঝির কুঁড়েতে। একা বাচ্চা ছেলে আবলু কি করবে? কাসেম আলীকে পাঠিয়ে দিয়েছে সে পিকাপ আনতে।

বাহাদুর খানের চেহারাটা ভেসে উঠল রানার মনের পর্দায়। আর এক মুহূর্ত দেরি না করে ছুটল সে নৌকোর দিকে। এদিক ওদিক চাইল সে, কিন্তু ওকে দেখতে পেল না আশে পাশে কোথাও। হাঁপাতে হাঁপাতে উঠল রানা নৌকোয়। নদীর মাঝামাঝি আসতেই শুনল রানা প্রথম গুলি। পয়েন্ট টু-টু বোর। আবলু গুলি ছুঁড়তে আরম্ভ করেছে জানালা দিয়ে। সাথে সাথেই গর্জে উঠল কয়েকটা স্টেনগান। সেই সাথে একটা লাইট মেশিনগানের ঠাঠাঠাঠা কর্কশ শব্দ। আবলুর টু-টু বোরের লঙ-রাইফেল গুলির শব্দ খেলনা পিস্তলের আওয়াজের মত হাস্যকর লাগছে।

পাগলের মত টানতে থাকল রানা রশি ধরে। তীরে পৌঁছবার আগেই লাফিয়ে নামল সে নৌকো থেকে। গুলির শব্দ থেমে গেছে। চারদিক নিস্তব্ধ। ভিতরে কি অবস্থা, কে জানে? ছুটল রানা কুঁড়ের দিকে দ্রুত নিঃশব্দ পায়ে।

দরজার কাছে এসেই থমকে দাঁড়াল রানা। একজন আর্মি ইন্টেলিজেন্সের পোশাক পরা সেপাই দরজা দিয়ে বেরিয়ে রানার দিকে পিছন ফিরে আস্তে ভিড়িয়ে দিচ্ছে দরজাটা। পিছনে পায়ের শব্দে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল। ঠকাশ করে কাঠে কাঠে বাড়ি লাগল যেন। ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরিয়ে এল। কানের পিছনে রিভলভারের বাটের প্রচণ্ড আঘাত খেয়ে ঢলে পড়ল সেপাইটা। উদ্যত রিভলভার হাতে ঢুকল রানা দরজা খুলে ঘরের ভিতর।

দ্রুত এক নজর চোখ বুলিয়ে ঘরের অবস্থাটা বুঝে নিল রানা। হুজন সোলজার
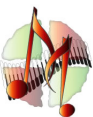
দেখতে পেল সে ঘরের ভিতর। চারজন তাদের মধ্যে বেঁচে আছে এখনও। মেজর জেনারেল পড়ে আছেন অজ্ঞান অবস্থায় চৌকির উপর। একটা স্টেনগান ধরা আছে ব্রিগেডিয়ার জামানের দিকে—আরেকজন ওর হাত বাঁধছে পিছমোড়া করে। জানালাটার ঠিক নিচেই মাটিতে আবলুর বুকের উপর চেপে বসে গলা টিপে ধরেছে একজন। ছটফট করছে আবলু ওর হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে—দুই চোখ ঠেলে বেরিয়ে এসেছে বাইরে। ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে দৈত্যের মত বাহাদুর খান। একহাতে জড়িয়ে ধরেছে সে দিলারাকে, আরেক হাতে খুলছে তার জামা কাপড়। দেহের উপরের অর্ধেক নগ্ন করে ফেলেছে সে ইতিমধ্যেই। হাসছে।

রানা বুঝল, 'হ্যাণ্ডস আপ'-এর সময় পার হয়ে গেছে। এখন ওতে কাজ হবে না কিছুই। যত্নের সাথে পর পর তিনটে গুলি করল সে দুই সেকেণ্ডের মধ্যে। প্রথম গুলিতে আবলুর উপর থেকে গড়িয়ে পড়ল দাড়িওয়ালা সেপাইটা। দ্বিতীয় গুলিতে বসে পড়ল ব্রিগেডিয়ার জামানের দিকে স্টেনগান ধরে থাকা লোকটা। আর তৃতীয় গুলিটা লাগল গিয়ে যে লোকটা ওর হাত বাঁধছিল তার দুই চোখের মাঝখানে ঠিক কপাল বরাবর। এবার বাহাদুরের কপাল লক্ষ্য করল রানা।

এক ঝটকায় মেয়েটাকে সামনে নিয়ে এল বাহাদুর, নিচু হয়ে লুকাল ওর পিছনে। এবং সাথে সাথেই মাটিতে ছিটকে পড়ল রিভলভারটা রানার হাত থেকে খসে। কব্জির উপর একটা স্টেনগানের বাঁট এসে পড়েছে প্রচণ্ড বেগে। এই সপ্তম লোকটিকে দেখতে পায়নি রানা আগে—দরজা খুলতেই কপাটের আড়ালে লুকিয়ে পড়েছিল।

'মেরো না, ওকে মেরো না!' চি চি করে চেঁচিয়ে উঠল বাহাদুর খান।

গুলি করতে গিয়েও থেমে ট্রিগারের উপর থেকে আঙুলের চাপ ঢিল করল সপ্তম সেপাই। ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল বাহাদুর মেয়েটাকে ওর সামনে থেকে। দুই হাত কোমরে রেখে পা থেকে মাথা পর্যন্ত বার কয়েক দেখল সে রানাকে। একটা অদ্ভুত হিংস্র হাসি ফুটে উঠল ওর নাক ভাঙা কুৎসিত মুখে।

'দেখো, ওর কাছে আর কোন অস্ত্র আছে কিনা। হাত দুটো পিছমোড়া করে বেঁধে ফেলো। আমি সামলাচ্ছি এদের,' আদেশ দিল বাহাদুর সেপাইটাকে।

পরীক্ষা করে দেখে মাথা নাড়ল সপ্তম লোকটা। শক্ত করে বাঁধল রানার দুই হাত পিছনে নিয়ে। মৃত গার্ডদের অস্ত্রগুলো ইতিমধ্যেই জড়ো করে ঘরের কোণে রেখেছে বাহাদুর।

'বহুত আচ্ছা! এবার ধরো এটা!' কোমরের হোলস্টার থেকে রিভলভার বের করে ছুঁড়ে দিল বাহাদুর সপ্তম ব্যক্তির দিকে। শূন্যে ধরে ফেলল সে রিভলভারটা। 'এটা পকেটে রেখে স্টেনটা নিয়ে তৈরি থাকো। এই ঘরের মধ্যে কোন শালা যদি একটু নড়ে, কিংবা চোখের পাতা ফেলে, গুলি করবে।' দুই হাতের তালু ঘষল বাহাদুর, হিংস্র দৃষ্টিতে চাইল রানার দিকে। 'তোমার একটা বিল পাওনা আছে



এখনও, শয়তান আলী। শোধ করা হয়নি। ভুলে যাওনি বোধ হয়? আজ তোমার পাওনা মিটিয়ে দেব কড়ায় গণ্ডায়।'

রানা বুঝল, খালি হাতে ওকে হত্যা করবে বাহাদুর খান। হাত-বাঁধা অবস্থায় কিছুতেই আত্মরক্ষা করতে পারবে না সে। হাত খোলা থাকলেও বাহাদুরের তুলনায় সে কিছুই নয়। এক হাতে রানাকে টিপে মেরে ফেলার মত শক্তি আছে ওর গায়ে। তবু আরও নিশ্চিত হবার জন্যে হাত দুটো বেঁধে নিয়েছে সে। রানা মনে মনে ভাবল, কাপুরুষ একেই বলে। কিন্তু কাপুরুষ হোক, আর যাই হোক, মনের গভীরে উপলব্ধি করতে পারল সে—আর কোন আশা নেই। দুই মিনিটও সে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না বাহাদুরকে। তবু চেষ্টা করে দেখতে হবে। এমনিতে পরাজয় স্বীকার করবে কেন সে?

দুই পা এগিয়েই লাফিয়ে শূন্যে উঠল রানা, এক সাথে জোড়া পায়ে লাথি মারল বাহাদুরের বুক লক্ষ্য করে। রানাকে মুষড়ে না পড়তে দেখে একটু অবাক হলো বাহাদুর, সেকেণ্ডের পাঁচ ভাগের এক ভাগ দেরি হয়ে গেল সরতে, কিন্তু তবু চট করে পিছিয়ে গেল সে। লাথিটা লাগল ওর বুকের উপর, কিন্তু পুরো ওজনে লাগল না। হুশ্‌শ্‌ করে একটা শব্দ হলো ওর মুখ থেকে। আরও দুই পা পিছিয়ে গেল সে। দড়াম করে পড়ল রানা শূন্য থেকে মেঝেতে। মাথাটা যতদূর সম্ভব উঁচু করে রেখেছিল সে, তবু ব্যথা পেল মাথায়, কিন্তু উঠে পড়ল আছড়ে-পাছড়ে। মাটিতে পড়ে থাকলে লাথি খেয়ে মরতে হবে।

এগিয়ে আসছে বাহাদুর। আরেকটা লাথি চালাল রানা বাহাদুরের হাঁটুর নিচে হাড়ের উপর। খটাশ করে লাগল লাথিটা জায়গা মতই, কিন্তু কিছুমাত্র পরোয়া করল না বাহাদুর। ডান হাতের আঙুলগুলো সোজা রেখে দড়াম করে সর্বশক্তি দিয়ে মারল সে রানার পেট বরাবর, ঠিক তলোয়ার চালিয়ে দেহটা দু'টুকরো করে দেয়ার ভঙ্গিতে। ব্যথায় কুঁকড়ে গেল রানার শরীর। এত প্রচণ্ড মার আর কখনও খায়নি সে। বন্য মহিষের শক্তি আছে বাহাদুরের গায়ে। ছিটকে গিয়ে পিছনের দেয়ালে ধাক্কা না খেলে পড়ে যেত রানা। শ্বাস নিতে পারছে না সে আর। ব্রিগেডিয়ার, আবলু আর দিলারার উৎকণ্ঠিত উদ্বিগ্ন চোখের দিকে চোখ পড়ল একবার, তারপর ঝাপসা হয়ে এল দুই চোখ। মনে হলো, ওর নাম ধরে চিৎকার করে কি যেন বলছেন ব্রিগেডিয়ার। কিন্তু শুনতে পাচ্ছে না সে। হঠাৎ যেন কানে কিছুই শুনতে পাচ্ছে না সে আর। ভোঁ-ভোঁ করছে কানের ভিতর। ঝাপসা ভাবে দেখতে পেল, ওর দিকে এগিয়ে আসছে বাহাদুর। হঠাৎ দেখল, কালো কি যেন ঝাঁপিয়ে পড়ল বাহাদুরের উপর। ভুখা! বাচ্চা হলে কি হবে, ব্লাড হাউণ্ডের বাচ্চা! টুপটুপে ভেজা সারা গা। লাফ দিয়েছিল বাহাদুরের কণ্ঠনালী লক্ষ্য করে, ধাঁই করে পাঁজরার উপর প্রচণ্ড এক ঘুসি খেয়ে ছিটকে বেরিয়ে গেল জানালা দিয়ে, এ ঘরের মাটিতে আর পা পড়ল না।

এগিয়ে আসছে বাহাদুর। টলতে টলতে ছুটে গেল রানা ওর দিকে। ওর দুরবস্থা

দেখে হেসে ফেলল বাহাদুর খিক-খিক করে। একপাশে সরে গিয়ে ধাই করে এক ঘুসি মারল রানার চোয়ালে। ছুটে গিয়ে খোলা কপাটের উপর আছড়ে পড়ল রানা। মাথাটা ঠুকে গেল জোরে। পড়ে গেল সে মাটিতে।

কয়েক সেকেণ্ডের জন্যে জ্ঞান হারাল রানা। আবার জ্ঞান ফিরে পেয়েই চোখ মিট-মিট করে পানি সরিয়ে দিয়ে আবছা হয়ে আসা দৃষ্টিটা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করল সে। মাথাটা ঝাঁড়া দিয়ে পরিষ্কার করবার চেষ্টা করল। দেখল, ঘরের মাঝখানটায় কোমরে হাত দিয়ে বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বাহাদুর খান। বিজয় গর্বে বীভৎস হাসি ওর মুখে। রানা বুঝল, বাহাদুর ওকে হত্যা করতে চায় ঠিকই, কিন্তু একবারে নয়, ধীরে ধীরে, রসিয়ে রসিয়ে।

দুর্বল ভাবে উঠে দাঁড়িয়ে টলতে থাকল রানা। সারাটা ঘর দুলছে চোখের সামনে। সমস্ত মনের জোর একত্রিত করবার চেষ্টা করল রানা। মারা সে একবারই যাবে, কিন্তু বাধা না দিয়ে মরবে না। যতক্ষণ একবিন্দু শক্তি অবশিষ্ট আছে গায়ে, হাল ছেড়ে দেবে না। এগোতে গিয়েই অবাক হয়ে গেল সে বাহাদুরের মুখ দেখে। হাসি মিলিয়ে গেছে ওর মুখ থেকে। ইস্পাত দিয়ে তৈরি একটা হাত রানাকে ধরে দরজার পাশে দাঁড় করিয়ে দিল। রানা দেখল, ধীর পায়ে ঘরে ঢুকল কায়েস আলী। পরনে সেই ভেজা শার্ট প্যান্ট।

দরজার পাশে দাঁড়ানো সপ্তম সেপাইটার মুখ হাঁ হয়ে গিয়েছিল এই আকস্মিক অনুপ্রবেশে। বিস্ময়ের ঘোরটা কাটিয়ে উঠেই স্টেনগানটা তুলতে গেল। কিন্তু দেরি হয়ে গিয়েছে তখন। ছোট্ট ছেলের হাত থেকে বড়রা যেভাবে লাঠি কেড়ে নেয়, তেমনি হেঁচকা টানে কেড়ে নিল কায়েস আলী ওর হাত থেকে স্টেনগানটা। অন্য হাতে চেপে ধরল ওকে দেয়ালের সাথে। কামড় দিয়ে হাতটা ছাড়াবার চেষ্টা করল লোকটা। স্টেনগানটা ছুঁড়ে দরজা দিয়ে বাইরে ফেলে দিয়ে মাথার উপর তুলে নিল কায়েস ওকে দুই হাতে। এক পাক ঘুরে অসম্ভব জোরে ছুঁড়ে মারল ওকে দেয়ালের গায়ে। দশ ফুট উপরে দেয়ালের সাথে সেঁটে থাকল সে দুই সেকেণ্ড, যেন আঠা দিয়ে সাঁটিয়ে দিয়েছে কেউ ওকে ওখানে, তারপর মেঝের উপর পড়ল উপুড় হয়ে।

বিপদ বুঝতে পেরে পিছন থেকে লাফিয়ে ধরেছিল দিলারা বাহাদুরের চুল। এখন কয়েক সেকেণ্ড দেরি করাতে পারলেও লাভ। কিন্তু এক ঝটকায় সরিয়ে দিল সে মেয়েটাকে পিঠের উপর থেকে। পরমুহূর্তে ঝাঁপিয়ে পড়ল ভারসাম্য হারিয়ে ফেলা কায়েসের উপর। সপ্তম সেপাইটাকে শূন্যে তুলে ছুঁড়ে ফেলতে গিয়ে দেহের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছিল কায়েস আলী, বাহাদুরের হাতের কয়েকটা আচমকা প্রচণ্ড ঘুসি খেয়ে পড়ে গেল সে মাটিতে। চিতাবাঘের মত লাফিয়ে পড়ল ওর উপর বাহাদুর খান। প্রকাণ্ড দুই হাতে কণ্ঠনালী চেপে ধরেছে সে কায়েসের বুকের উপর উঠে। বাহাদুরের মুখে হাসি নেই, বাহাদুরীর ভাব নেই, প্রাণ বাঁচাবার জন্যে যুদ্ধ করছে সে এখন। বুঝতে পেরেছে সে, একে এই মুহূর্তে কাহিল করতে না পারলে



মৃত্যু অনিবার্য। সর্বশক্তি প্রয়োগ করেছে সে কায়েসের কণ্ঠনালীর উপর। দাঁত বেরিয়ে পড়েছে ঠোঁট সরে গিয়ে।

পাঁচ সেকেণ্ড চুপচাপ শুয়ে থাকল কায়েস আলী। রানা পাগলের মত টানাটানি করছে হাতের বাঁধন খোলার জন্যে। নইলে শেষ হয়ে যাবে কায়েস আলী। বাহাদুরের লোহার মত আঙুলগুলো চেপে বসেছে ওর কণ্ঠনালীর উপর। প্রকাণ্ড কাঁধের পেশী দুটো পাহাড়ের মত ফুলে উঠেছে সর্বশক্তি প্রয়োগ করায়। বাইসেপ দুটো কাঁপছে থরথর করে। কায়েসের দুই হাত উঠে এসে ধরল এবার বাহাদুরের দুই কব্জি।

প্রথমে একটু অবাক হলো বাহাদুর। কায়েসের আঙুলের নখগুলো ক্রমেই ঢুকে যাচ্ছে ওর কব্জির মধ্যে। পরমুহূর্তেই ওর চোখে মুখে ফুটে উঠল অবিশ্বাস। তারপর ব্যথায় কুঁচকে গেল মুখটা। সবশেষে সেই মুখে ফুটে উঠল মৃত্যুভীতি। মড় মড় শব্দে ভেঙে যাচ্ছে ওর কব্জির হাড়!

ধীরে ধীরে খুলে গেল বাহাদুরের হাত, আলগা হয়ে সরে এল কায়েসের গলা থেকে। ধাক্কা দিয়ে নামিয়ে দিল কায়েস ওকে বুকের উপর থেকে।

মাটিতে পড়েই হামাগুড়ি দিয়ে ছুটে পালাচ্ছিল বাহাদুর। একটা ঠ্যাং ধরে হিড় হিড় করে টেনে আনল ওকে কায়েস ঘরের মধ্যে। দরজার চৌকাঠ ধরে আঁকড়ে থাকার চেষ্টা করল বাহাদুর—কিন্তু হ্যাঁচকা টানে ছুটে গেল হাত। ঘরের মাঝখানে নিয়ে এসে দু'হাত ধরে টেনে দাঁড় করাল কায়েস আলী বাহাদুরকে। কায়েসের মাথা ছাড়িয়ে দশ ইঞ্চি উঁচুতে উঠে গেল বাহাদুরের মাথা। সর্বশরীর ভয়ে কাঁপছে ওর থরথর করে। বাম হাতে প্রচণ্ড বেগে মারল কায়েস বাহাদুরের পেটে, ঠিক যেমন ভাবে বাহাদুর মেরেছিল রানাকে। কুঁকড়ে গেল বাহাদুরের প্রকাণ্ড দৈত্যের মত শরীরটা। গল গল করে রক্ত বেরিয়ে এল ওর নাক মুখ দিয়ে। পরমুহূর্তেই ভাঙা নাকের উপর একটা ভয়ঙ্কর থাবড়া খেয়ে চিৎ হয়ে পড়ে গেল বাহাদুর।

পা দিয়ে উপুড় করল কায়েস আলী বাহাদুরের প্রকাণ্ড ধড়। তারপর বসে পড়ল পিঠের কাছে। মেরুদণ্ডের উপর একটা হাঁটু দিয়ে চেপে ধরে বাম হাতে ধরল সে বাহাদুরের থুতনির নিচে, আর ডান হাত চালিয়ে দিল হাঁটুর নিচে। ব্যাপারটা আঁচ করতে পেরেই দুই হাতে চোখ ঢাকল দিলারা।

দুই হাত উপরে উঠছে কায়েস আলীর। গলা দিয়ে একটা অদ্ভুত বিকৃত গোঙানীর মত শব্দ বেরুচ্ছে বাহাদুরের। অসহায় ভাবে ছুঁড়ছে হাত-পা। দুই চোখ আতঙ্কে বিস্ফারিত। শিরা ফুলে উঠেছে কপালে, গলায়।

বাঙালী সুলভ শান্ত, সরল, নিরীহ চোখ মেলে চাইল একবার কায়েস আলী রানার দিকে। মুচকে হাসল একটু। পরমুহূর্তেই মড়াৎ করে ভেঙে গেল বাহাদুরের মেরুদণ্ড।
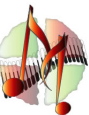
## চব্বিশ

মেজর দেলওয়ার খানের আইডেন্টিটি কার্ড দেখেই সোজা হয়ে গেল ক্যাপ্টেন সাঈদের শিরদাঁড়া। স্যালুট করে অ্যাটেনশন হয়ে দাঁড়াল সে।

'আপনিই ক্যাপ্টেন সাঈদ?'

'ইয়েস, স্যার।'

'জেনারেল টিক্কা খান আসছেন, জানেন তো?'

'ইয়েস, স্যার।'

'সেজন্যেই পাঠানো হয়েছে আমাকে। জেনারেলের সিকিউরিটির স্পেশাল ব্যবস্থা এবং তার তদারকের জন্যে। ভাল কথা, মিস মির্জার অবস্থা কি রকম এখন?'

'কিছুটা সুস্থ। কিন্তু চেহারা নাকি ভয়ঙ্কর হয়ে গিয়েছে।'

'ভেরি স্যাড। যাক, আপনার গার্ড ক'জন?'

'বারোজন, স্যার।'

'সবাইকে ডেকে পাঠান এখানে। স্পেশাল ইন্সট্রাকশন আছে।'

একজন বেয়ারা বেরিয়ে গেল ক্যাপ্টেনের আদেশ পেয়ে। ক্যাপ্টেন বলল, 'কিন্তু স্যার, জেনারেল তো এর আগেও এখানে এসে গেছেন বার কয়েক, তখন তো এরকম সিকিউরিটির প্রয়োজন পড়েনি?'

'প্রয়োজন সৃষ্টি করেছেন আপনারাই,' একটু কঠোর কণ্ঠে বলল রানা। 'এই ক্যাম্পে ঢুকে মেয়ে নিয়ে বেরিয়ে চলে গেল বাইরের লোক, আপনারা ঠেকাতে পারলেন না···এই তো আপনাদের প্রহরার নমুনা! আপনার কপাল ভাল যে কোর্ট মার্শাল হয়নি এখনও। লায়লার ব্যাপারটা চেপে দেয়া সম্ভব হয়েছে ওকে রিকাভার করা হয়েছে বলে। কিন্তু সেই বাঙালীদের দলটা এখনও ধরা পড়েনি। আমরা চাই না আবার এখানে অপ্রীতিকর কোন ঘটনা ঘটুক। এমনিতেই জেনারেল টিক্কার উপর খেপে আছে সাড়ে সাত কোটি বাঙালী। যাই হোক, লায়লাকে কত নম্বর রুমে রাখা হয়েছে?'

'তিন তলার এক নম্বর রুমে, স্যার। ওই ঘরটাই জেনারেলের পছন্দ।'

'বেশ। ওই ঘরটা পরীক্ষা করে দেখতে হবে। সময় বেশি নেই। আধ ঘণ্টার মধ্যেই এসে পড়বেন জেনারেল। কই, আপনার গার্ডরা কোথায়?'

ব্যস্ত সমস্ত হয়ে দরজার কাছে গেল ক্যাপ্টেন, 'এই তো এসে গেছে।'

সবাইকে লাইন করে দাঁড় করানো হলো ঘরের মধ্যে। মিনিট তিনেক বকর বকর করে গেল রানা সম্ভাব্য আক্রমণ সম্পর্কে, কিভাবে ঠেকাতে হবে সেই



আক্রমণ। এমনি সময় অফিস কক্ষের দুই দরজায় এসে দাঁড়াল চারজন লোক চাইনিজ স্টেন হাতে। আবলু আর কায়েস দাঁড়িয়েছে পশ্চিম দিকের দরজায়, মেজর জেনারেল আর ব্রিগেডিয়ার দাঁড়িয়েছেন দক্ষিণ দিকের দরজায়। স্টেনগানগুলো স্থির হয়ে আছে গার্ডদের দিকে। হাঁ হয়ে গেছে ওদের মুখ। মেজর দেলওয়ার খানের অর্ডারের অপেক্ষায় আছে ওরা।

'দুঃখের বিষয়, শত্রুপক্ষ আমাদের চেয়ে অনেক বেশি তৎপর। এখন বাধা দিতে গেলে গুলি খেয়ে মরতে হবে। কাজেই প্রত্যেকে যার-যার হাতের অস্ত্র ফেলে দাও মাটিতে,' বলল রানা পরাজিত ভঙ্গিতে।

খটাং-খটাং করে মেঝেতে পড়ল স্টেনগান, রাইফেল, স্টার্লিং কারবাইন এবং ক্যাপ্টেন সাঈদের রিভলভার। কায়েসের স্টেনটা হাতে নিল রানা। বলল, 'বেঁধে ফেলো সব ক'টাকে। মুখে কাপড় গুঁজে দিতে ভুলো না।'

দিলারা এসে দাঁড়াল দরজায়। 'মাসুদ ভাই, সব মেয়েকে খবর দেব কি করে? তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নিতে হবে।'

'এইটা নিয়ে মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে ডাকো সবাইকে।' টেবিলের উপর থেকে একটা ব্যাটারি ফিট করা লাউড হেইলারের চোঙা এগিয়ে দিল রানা। সেটা নিয়েই ছুটল দিলারা। পিছন পিছন ছুটল গুণ্ডা।

মেয়েটা একটা অ্যাসেট—ভাবল রানা। মেডিক্যাল কলেজের ফোর্থ ইয়ারের ছাত্রী। বাবা-মাকে মেরে ফেলা হয়েছে। ওকে ধরে নিয়ে রেখেছিল জাফার আর্মি ক্যাম্পে। এই মেয়েটা সাথে থাকায় গত একঘণ্টার মধ্যে চার-চারটে ডাকাতি করা সম্ভব হয়েছে ওদের পক্ষে। পেট্রল পাম্পের ডাকাতিটা করেছে আসলে আবলু, আর তিন তিনটে মেডিক্যাল স্টোরের ডাকাতি সংঘটিত হয়েছে মূলত দিলারার দ্বারা। স্টেনগান দেখিয়ে ভীতি প্রদর্শন করেছে রানা, আবলু আর কায়েস, কিন্তু টপাটপ প্রয়োজনীয় ওষুধগুলো খুঁজে বের করে ব্যাগে পুরেছে দিলারা। ও না থাকলে প্রচুর সময় ব্যয় হয়ে যেত শুধু ওষুধ খুঁজতেই।

কলেজ ভবনটা ইংরেজি 'G' অক্ষরটির মত। মাঝে মাঠ, রাস্তা, ফুলের বাগান। ঠিক মাঝখানটায় দাঁড়িয়ে ডাকছে দিলারা সমস্ত মেয়েকে নিচের হলরুমে জমায়েত হবার জন্যে। বলছে, 'আমরা সবাই পালিয়ে যাচ্ছি এখান থেকে। জলদি নিচে নেমে আসুন সবাই। গার্ডরা সবাই বন্দী, কাজেই ভয় নেই—চলে আসুন। কেউ অসুস্থ থাকলে তাকে সাহায্য করুন নামতে। হাতে সময় নেই। সবাই জমায়েত হন নিচের হলরুমে। জলদি।' বারবার বলছে কথাটা লাউড স্পীকারে।

ফটাফট সব দরজা খুলে গেছে প্রায় প্রত্যেকটি কামরার। বারান্দায় এসে চেয়ে রয়েছে সবাই মাঠের মধ্যখানে দাঁড়ানো চোঙা হাতে দিলারার দিকে। বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়েছে ওরা, নিজের কানকেও বিশ্বাস করতে পারছে না, এ-ওর দিকে চাইছে নির্বোধের মত। কেউ কেউ হয়তো পাগল মনে করছে দিলারাকে।
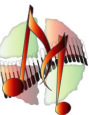
বাঁধা শেষ হতেই সব ক'টাকে অফিস সংলগ্ন ছোট একটা কুঠুরির মধ্যে ভরে দরজা লাগিয়ে বেরিয়ে এল রানা বাইরে। তিনটে ব্লকের তিন তিরিক্কে নয়টি তালার বারান্দায় এসে জমা হয়েছে মেয়েরা। কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় চেয়ে আছে দিলারার দিকে। হাত নেড়ে নেমে আসার ইঙ্গিত করল রানা, কায়েস আলী, আবলু। তবু নড়ছে না কেউ। দিলারার হাত থেকে চোঙটা নিল রানা। 'মেয়েরা মেয়েদের বিশ্বাস করে না। দাও আমার কাছে। চোঙটা ধরল সে মুখের সামনে।

'আপনারা সবাই নেমে আসুন। কিছুক্ষণের মধ্যে পালিয়ে যাচ্ছি আমরা সীমান্ত পেরিয়ে!' পরিষ্কার বাংলায় বলল রানা। 'সবাই চলে আসুন হলরুমে। ভয় নেই, আমরা বাঙালী।'

'জাদুমন্ত্রের কাজ হলো। হুড়মুড় করে ছুটল সবাই সিঁড়ির দিকে।'

ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল লাঞ্ছনা ব্রিগেডিয়ারের বুকে।

হলরুমে দুই মিনিটের একটা সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিলেন মেজর জেনারেল। সবাইকে বুঝিয়ে দিলেন কিভাবে কি করতে হবে। ত্রিরিশজন আগ্রহী ভলান্টিয়ার বাছাই হয়ে গেল তিন মিনিটে। মুক্তির সম্ভাবনায় আশায় আনন্দে পাঁচ মিনিটেই অন্য রকম হয়ে গেছে মেয়েগুলো। একে অপরকে জড়িয়ে ধরছে, চুমো খাচ্ছে। সে এক অদ্ভুত দৃশ্য। এতদিনের লাঞ্ছিত, অপমানিত, নির্যাতিত জীবনে এই প্রথম আশ্বাস পেল ওরা, বোনেদের ভুলে যায়নি বাঙালী ভাইয়েরা, ওদের রক্ষার জন্যে হানা দিয়েছে এখানে এসে নিজেদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে। ওরা তাহলে উচ্ছিষ্ট নয়, ওদের জন্যেও ভাবছে বাঙালীরা! গর্বে ভরে গেছে ওদের বুক, সমস্ত কালিমা ধুয়ে গেছে ভাইয়ের প্রীতির পরিচয় পেয়ে। সমস্ত ক্ষুদ্রতার ঊর্ধ্বে উঠে যাওয়া—এ এক অপূর্ব অনুভূতি।

পনেরো মিনিটের মধ্যেই সমস্ত প্রস্তুতি নিয়ে তৈরি হয়ে গেল ওরা। কোমরে আঁচল পেঁচিয়ে নিয়ে কাজে লেগে গেছে ভলান্টিয়াররা। ওদের কাজ তদারকের জন্যে রান্নাঘরে ছিল কায়েস আলী, হাসতে হাসতে বেরিয়ে এল। ভাগিয়ে দিয়েছে ওকে মেয়েরা।

গত কয়েকমাস যাবৎ এখানে আছে, এরকম দু'তিনজন মেয়ের কাছ থেকে এখানকার কিছু রীতিনীতি জেনে নিল রানা। তারপর সবাই যে যার পজিশনে চলে গেল।

আধ মাইল দূরে হেড লাইট দেখা গেল। সামনেরটা নিশ্চয়ই জেনারেলের মার্সিডিস, পিছু পিছু আসছে সাতটা ট্রাক। মধুরাতের স্বপ্ন ওদের চোখে!

প্রথমেই ফুলের মালা দিয়ে অভ্যর্থনা করা হলো জেনারেল টিক্কা খানকে। আনুষ্ঠানিকতার ত্রুটি থাকলে চলবে না। অফিসারদের গলায়ও পরিয়ে দিল বিশজন মেয়ে অপেক্ষাকৃত সরু মালা। জওয়ানরা ফক্কা। মধুর হাসি জেনারেলের মুখে। ভক করে তীব্র সেন্টের দুর্গন্ধ এল রানার নাকে। নাকটা কুঁচকে উঠতে যাচ্ছিল, সামলে



নিল রানা। সবাইকে নিয়ে হলরুমের দিকে এগোল সে। র‍্যাঙ্ক অনুযায়ী সামনের তিন সারিতে বসল অফিসারেরা, পিছনে বসল জওয়ানরা। টিক্কা খান বসবে না এখানে, তার জন্যে তেতলায় স্পেশাল ব্যবস্থা।

আনুষ্ঠানিকতার ভড়ং দেখে কেমন একটু ভড়কে গেছে সবাই। আড়ষ্ট ভঙ্গিতে বসে আছে, কিছুই করতে ভরসা পাচ্ছে না বেখাপ্পা কিছু করে বসে হাস্যাস্পদ হওয়ার ভয়ে।

শরবত আসতে শুরু করল। মেয়েরা সার্ভ করছে হাসিমুখে। অনেকেই মনে মনে বাছাই করতে শুরু করেছে কে কোন্‌টা নেবে।

জেনারেল টিক্কা খানকে যথেষ্ট সম্মানের সঙ্গে নিয়ে চলল রানা তেতলায়। লাঠিটা বগলে চেপে হাসিমুখে এগোল জেনারেল। বলল, 'তুমি নতুন এসেছ এই ক্যাম্পে?'

'ইয়েস, স্যার। কিছু কিছু ইমপ্রুভমেন্ট লক্ষ করেছেন নিশ্চয়ই, স্যার?'

'কিছু মানে? অনেক ইমপ্রুভমেন্ট। তোমার এফিশিয়েন্সির ব্যাপারে ভাবছি একটা নোট লিখব। পাবলিক রিলেশনসে খুব উন্নতি করবে তুমি ছোকরা।'

'থ্যাঙ্ক ইউ, স্যার!' বিনীত হাসল রানা। মনে মনে বলল, 'শুয়োরের বাচ্চা, দাঁড়াও, একটু পরেই নোট ঢুকিয়ে দেব তোমার (খারাপ একটা জায়গা) দিয়ে।'

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে জিজ্ঞেস করল জেনারেল, 'গার্ডদের দেখছি না? ওরা কোথায়?'

'ক্যাম্পের চারপাশ ঘিরে পোস্ট করেছি ওদের, স্যার। এখানে পাহারা দেবার কিছুই নেই। বাইরে থেকে কেউ যাতে ঢুকতে না পারে সেই ব্যবস্থাই বেশি দরকার। শুধু শুধু বারান্দায় পায়চারি করে করে ঘরের মধ্যে কি না জানি হচ্ছে ভেবে ভেবে শরীর খারাপ হয়ে যাচ্ছিল ওদের।'

'ঠিক বলেছ।' হেসে উঠল টিক্কা খান। 'তা আমার জন্যে আজকে কি স্পেশাল ব্যবস্থা করেছ শুনি? খুব তো গল্প করল গুলজার ..., তাজ্জব হয়ে যাব আজ। পরিচিত মেয়ে বলছে···কে মেয়েটা?'

'চলুন না, স্যার, এই তো এসে গেছি। নিজের চোখেই দেখবেন।'

দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকল টিক্কা খান। জানালা দিয়ে বাইরের অন্ধকারের দিকে চেয়ে চুরুট ফুঁকছিলেন মেজর জেনারেল রাহাত খান—ঘুরে দাঁড়ালেন তিনি। নিমেষে চিনতে পারল সে বৃদ্ধকে। আঁতকে উঠে পিছিয়ে আসার চেষ্টা করল সে, ঘাড় ধরে ঠেলে ঘরের ভিতর ঢুকাল ওকে রানা। বন্ধ করে দিল দরজা।

'ইয়ে ক্যয়া বাত···'

আর কিছু বেরোল না টিক্কা খানের মুখ থেকে। ধাই করে এক থাবড়া পড়ল নাক-মুখের উপর। 'কেঁউ' করে কুকুরের মত একটা আওয়াজ বেরোল ওর গলা দিয়ে। দুই হাতে মুখ ঢাকল। ওর কোমরের হোলস্টার থেকে পিস্তলটা বের করে
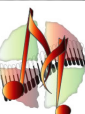
নিল রানা আলগোছে। এবার তলপেটে এক লাথি খেয়ে ছিটকে পড়ল টিক্কা খান খাটের উপর। ধড়মড় করে উঠে ওপাশের খোলা দরজা দিয়ে দৌড়ে পালাবার চেষ্টা করতে গিয়ে আছড়ে পড়ল কায়েস আলীর প্রশস্ত বুকের উপর।

'বাঁচাও! ইয়ে দুশমন হ্যায়…'

চুল ধরে টেনে মাথাটা একটু উঁচু করল কায়েস, তারপর দড়াম করে মারল এক থাবড়া। ছিটকে এসে হুড়মুড় করে রানার পায়ের কাছে পড়ল টিক্কা খান। চোখ দিয়ে জল আর নাক দিয়ে রক্ত ঝরছে সমানে। 'থুক' করে তিনটে দাঁত ফেলল সে মেঝের উপর, সেই সাথে রক্ত। কথা বলে উঠলেন মেজর জেনারেল।

'আহা, কি মুশকিল! ইউনিফরমটা নষ্ট করে ফেলবে দেখছি। ওটা খুলে নাও আগে, নইলে ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে যাবে।'

কান ধরে টেনে দাঁড় করাল ওকে রানা।

'জেনারেল! মেজর জেনারেল রাহাত খান!' নালিশের ভঙ্গিতে শুরু করল টিক্কা খান, 'আপনার সামনে আর একজন জেনারেলকে এইভাবে অপমান…'

'তুমি সাধারণ ব্যাটম্যান হওয়ারও যোগ্য নও, টিক্কা। পৃথিবীর জঘন্যতম কোরাপ্টেড আর্মির বজ্জাত জেনারেল তুমি। এই বন্দী শিবিরে নারী ধর্ষণ করতে এসে তুমি আবার জেনারেলের মর্যাদার কথা তুলছ? লজ্জা করে না? নাও, এখন খুলে ফেলো ইউনিফরমটা।'

'ইউনিফরম দিয়ে কি করবেন?'

'আবার কথা বলে!' হাঁটুর উপর খটাশ করে লাথি লাগাল রানা। 'কাপড় খোল! হারামজাদা, বেল্লিক!'

'ওরে বাবারে! বাবা!' হাঁটুর উপর হাত চেপে বসে পড়তে যাচ্ছিল টিক্কা খান, রানাকে আরেকটা লাথি তুলতে দেখে তড়াক করে উঠে দাঁড়াল। 'খুলছি!'

দরজায় টোকা পড়ল। সেই সাথে আবলুর কণ্ঠস্বর ভেসে এল। 'মাসুদ ভাই দরজা খোলো, ব্রিফকেসটা এনেছি।'

'ওদিকের অবস্থা কি?' দরজা খুলেই জিজ্ঞেস করল রানা।

'জানালা দিয়ে দেখলাম, মাতলামি করছে সব ক'টা, এখুনি ঢলে পড়বে।'

'গুড, এইটা স্যারের কাছে দিয়ে বেতটা হাতে করে দাঁড়াও এখানে।'

ব্রিফকেসটা খুলে বিভিন্ন জিনিসের সাথে প্যাড এবং সীলটাও পাওয়া গেল। এদিকে কাপড় ছাড়া হয়ে গেছে টিক্কা খানের, জাঙ্গিয়া পর্যন্ত খুলে ফেলেছে সে। দাঁড়িয়ে আছে, ন্যাংটো ভাঁড়।

'আমাদের নিরাপদ পলায়নের জন্যে তোমার কয়েকটা কথা লিখতে এবং বলতে হবে একটু কষ্ট করে, টিক্কা খান,' বললেন মেজর জেনারেল।

'আপনারা পালাতে পারবেন না পাকিস্তান থেকে।'

'পারি কিনা আমরা বুঝব। যা বলছি লিখে নাও এই প্যাডে।'



'আমি কিছুই লিখব না। তার চেয়ে মেরে ফেলুন আমাকে,' বলল টিক্কা।

'কাপুরুষের মুখে এত বড় কথা মানায় না, টিক্কা। লিখতে হবে তোমাকে নিজের প্রাণের ভয়ে, যন্ত্রণার ভয়ে লিখবে। কাজেই গোলমাল না করে লিখে দাও।'

'না।'

হাসল রানা। খুশি হয়েছে সে। একটু বাধা না পেলে মেরে সুখ পাওয়া যায় না। আবলুকে বলল, 'কায়েস ঠেসে ধরবে ব্যাটাকে দেয়ালের সাথে, তুমি এর পিছন দিকটা আচ্ছা করে ঝেড়ে দাও ওই বেতটা দিয়ে। যতক্ষণ লিখতে স্বীকার না করবে, ততক্ষণ থামবে না।'

যেমন কথা, তেমন কাজ। মিনিট পাঁচেক যেতে না যেতেই রাজি হয়ে গেল টিক্কা খান। কিন্তু ততক্ষণে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেছে ওর পাছাটা, পা বেয়ে রক্ত নামছে নিচে। দরদর পানি নামছে চোখ দিয়ে অঝোর ধারায়। আগামী তিন মাসের জন্যে চেয়ারে বসা বন্ধ। যা বলা হলো লিখে দিল সে খশখশ করে, সই করে দিল। সীলটা নিজেই দিয়ে নিলেন মেজর জেনারেল। এবার টেলিফোনে ওয়াযিরাবাদ, শিয়ালকোট এবং জাসারে জানিয়ে দিল টিক্কা খান, সারপ্রাইজ ভিজিটে বেরোচ্ছে সে জাসারের পথে।

'আপনারা কি চান আসলে? সাতটা ট্রাক দিয়ে কি করবেন?' জিজ্ঞেস করল টিক্কা খান।

'এখানকার সব মেয়েকে নিয়ে যাচ্ছি আমরা।'

'সাড়ে তিনশো অফিসার আর জওয়ান বসে বসে তামাশা দেখবে? বাধা দেবে না?'

'এতক্ষণে সব ক'টা অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে হলঘরে। শরবতের সাথে প্রচুর পরিমাণে কড়া মাদক ও ঘুমের ওষুধ মেশানো হয়েছে। এদের আগামী তিনটে ঘণ্টা ঘুম পাড়িয়ে রাখার জন্যে যথেষ্ট। তামাশা দেখারও উপায় নেই ওদের এখন।'

'আর আমাকে? আমাকে নিশ্চয়ই মেরে ফেলা হবে এখন?'

'না। তোমাকে মারলে পাকিস্তানের মস্ত বড় উপকার করা হবে। তোমাকে বাঁচিয়ে রাখব আমরা। তোমার পাল্লায় পড়ে ছারখার হয়ে যাক পাকিস্তান।' নিভে যাওয়া চুরুটটা ধরিয়ে নিলেন মেজর জেনারেল। বললেন, 'তোমাকে ধরে নিয়ে গিয়ে ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে প্রকাশ্য-বিচার করতে পারলে আমি সবচেয়ে বেশি খুশি হতাম। কিন্তু সেটা সম্ভব নয়—ওয়ার্লড ইস্যু হয়ে দাঁড়াবে ব্যাপারটা, এবং পাকিস্তানও ছুতো পাবে আটক বাঙালীদের নির্বিচারে হত্যা করার। কাজেই থাকো তুমি—আপন নিয়তির টানে একটার পর একটা ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে যাবে তুমি, নিজে ধ্বংস না হওয়া পর্যন্ত।'

আবছা একটা ইঙ্গিত করলেন মেজর জেনারেল চুরুট ধরা হাতটা ডান দিকে ঝাঁকিয়ে। এর মানে, কথাবার্তা সব শেষ। এগিয়ে এল রানা ও কায়েস।
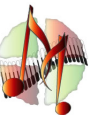
নিচ থেকে লাউড স্পীকারে ব্রিগেডিয়ারের কণ্ঠ ভেসে এল।

'আমরা সবাই রেডি, স্যার, কাজ হয়ে থাকলে চলে আসুন।'

দড়াম করে মারল কায়েস আলী টিক্কা খানের ডান বাহুতে। মড়াৎ করে ভেঙে গেল হাতটা। পরমুহূর্তে পেটের উপর পড়ল একটা রদ্দা। দেয়ালে গিয়ে আছড়ে পড়ল জেনারেল, তারপর ঝুপ করে মেঝেতে পড়ল জ্ঞান হারিয়ে।

নাকটা আর বাকি থাকে কেন, মনে করে বুটের ছোট্ট একটা লাথিতে ভেঙে দিল রানা টিক্কা খানের খাড়া নাকটা।

সবাই রেডি হয়ে গেছে ইউনিফরম পরে। ঢোলা ইউনিফরম পরে ভূত মনে হচ্ছে একেকটা মেয়েকে। কিন্তু ক্ষতি নেই, অন্ধকারে চেক করবে না কেউ। টিক্কা খানের ইউনিফরম পরে জেনারেলের স্টার দেয়া মার্সিডিসের পিছনের সীটে উঠে বসলেন মেজর জেনারেল রাহাত খান। ড্রাইভিং সীটে বসল আবলু। সাতটা ট্রাকের ড্রাইভিং সীটে উঠে বসল কায়েস আলী, দিলারা, ব্রিগেডিয়ার, রানা এবং তিনজন গাড়ি ড্রাইভ করতে জানা মেয়ে।

রানার পাশের সীটে উঠে এল লায়লা ওগ্রকে নিয়ে।

চলল কাফেলা।

দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল লায়লা। 'আমরা সবাই ফিরে যাচ্ছি··· কিন্তু···'

'ওকেও নিয়ে যাচ্ছি আমরা। শ্রদ্ধার সাথে। আমাদের অন্তরে করে।'

একটা সিগারেট ধরাল রানা। চুপচাপ টানল কিছুক্ষণ। কাঁধের উপর হাত রাখল লায়লা। আলতো করে আঙুল বুলাল রানার চুলে।

'এবার হারিয়ে যাবে তুমি, রানা।'

কিছু বলল না রানা।

'কিন্তু জানো, আমি ভেবে দেখলাম, দুঃখ পাব না আমি।'

কিছু বলল না রানা।

'তোমার বন্ধুত্বের স্মৃতি উজ্জ্বল হয়ে থাকবে আমার মনে।'

কিছু বলল না রানা।

শেষ

A lonely man in the crowded planet